বা

মধুমতী।

শ্রীব্রজকালী সুর কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

শ্রীসীতারাম দে কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১১২নং অপার চিৎপুররোড।

PRINTED BY N. C. DUTT, AT THE

GREAT TOWN PRESS,

163, Musjeedbari Street, Calcutta.

1895.

শ্রীব্রজকালী সুর কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

শ্রীসীতারাম দে কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১১২নং অপার চিৎপুররোড।

PRINTED BY N. C. DUTT, AT THE

GREAT TOWN PRESS,

163, Musjeedbari Street, Calcutta.

1895.

উৎসর্গ পত্র।
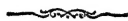
সুহৃদবর

শ্রীযুৎ বিহারীলাল সুরের

করকমলে

আমার প্রভাত-প্রসূনটী

অর্পণ করিলাম।

শ্রীব্রজকালী সুর

সিতি উত্তর পাড়া

কলিকাতা

সন ১৩০২ সাল।

প্রভাত-প্রসূন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কর্ম্মের বাটী।
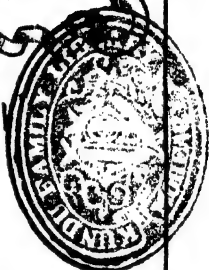
চন্দ্রবাবু আজ মহা চিন্তায় নিপতিত। আজ তাঁর পুত্রের অন্নপ্রাশন, জ্ঞাতি কুটুম্বাদি সমস্তই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। দুই এক দিবসের মধ্যেই প্রায় অধিকাংশই আত্মীয় কুটুম্বগণের পরিবারবর্গকে আনান হইয়াছে, এবং অন্যান্য দূরদেশ হইতে আমন্ত্রিতগণ একে একে আসিতেছে। আজ বাবুর বাটীতে সমারোহ ব্যাপার! দাস দাসী আত্মীয় কুটুম্ব ও প্রতিবেশী-গণের জনতায় বাড়ীতে রৈ রৈ পড়িয়া গিয়াছে। এই শুভদিনে শুভকর্ম্মে সকলেই আনন্দে মাতিয়াছে, আজ পরিশ্রমে কেহই কাতর নয়। দাস দাসীরা বাবুর প্রদত্ত নববস্ত্র পরিধান করিয়া মহা আনন্দে আজ্ঞামাত্র কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। অন্দরের কোথাও যেখানে পুরুষের সমাগম নাই, এরূপ একটু নির্জ্জন

স্থান দেখিয়া দু চারিটী নবযুবতী নিঃশঙ্কায় গাত্র আবরণ খুলিয়া পরস্পর বাক্যালাপে মাতিয়াছে। নবযুবতীদের রসতরঙ্গের কখন কখন প্রবল ঢেউ উঠিতেছে। কোন রসিকার বাক্-চাতুর্য্যে যুবতীদের মুখে আর হাঁসি থামিতেছে না।

কোথাও মধ্যমবর্ষীয়েরা তরকারি কুটিতে ব্যতিব্যস্ত। শ্যামের মা হাত নাড়িয়া বলিতেছে, "হ্যাগা সেই পর্য্যন্ত বল্‌ছি, কাদেরো বাড়ী থেকে এক খানা বড় বোঁটী নিয়ে আস্‌তে, তা আর হলো না? এত বড় কুম্‌ড়োটা এই ছোট বঁটীতে কি ক'রে কাটী বল দেখি?" শ্যামের মার এত ক'রে হাত নাড়িবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, আজ সে দুহাতে দু গাছি ডায়মনকাটা অনন্ত পোরেছে। দত্তদের মেজগিন্নী কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। সে অমনি জগন্নেথে নথ নাড়িয়া বলিল. "তা বাছা আমায় ব'ল্লে কি হবে? আমাদের যদি এখানে বাড়ী হ'ত. তা হ'লে না হয় কাদেরো বাড়ী থেকে একখানা বঁটী চেয়ে নিয়ে আস্‌তুম।" অমনি জনৈক প্রাচীনা প্রতিবেশিনী গলার সোনার দানা ছড়াটী বাহির করিয়া, হাঁসিতে হাঁসিতে কহিল,—"তা মেয়ে, তুমি না হয়, ততক্ষণ আলু কোটো; আমি একখানা বঁটী আনিয়ে দিচ্চি।" কোথাও বাবুর স্ত্রী অল্পবয়স্কা যুবতীদের ডাকিয়া বলিতেছেন,—"ওগো একটীও পান যে সাজা নেই, তোমরা হাতাহাতি করে পানগুলো সেজে ফ্যালনা গা।" বাবুর মা ব্যতিব্যস্ত, পাছে কুটুম্বিনীগণের আদরের ত্রুটি হয়, হাঁসি হাঁসি মুখে সকলকেই মিষ্ট কথায় সন্তোষ করিতেছেন। কাকেও জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ও দিদি! তোমার ছেলেকে কি দুধ খাওয়ান হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে চল, এখন এক কড়া দুধ জ্বাল

দেওয়া হ'য়েছে।" কোথাও ছ সাতটী প্রাচীনা নান্দিমুখের আয়োজনে বিষম বিভ্রাট বাধাইয়াছে। সকলেই নিজ নিজ মত প্রকাশ করিয়া আপনাকে বড় করিতেছে। কেহ বলিতেছে,—হ্যাঁগা! তোমাদের এক কথা, এই কটী আতপচালে কি হবে?" তখনি অপরা একজন বলিয়া উঠিল,—"দেখে দেখে আমার মাথার চুল পেকে গেল, আমায় আর সেখাচ্চ কি? এতেই ঢের হবে।" এইরূপে সকলেই মতান্তরে নানা কথা কহিতেছে। কোথাও বালক বালিকারা নববস্ত্র পরিধান করিয়া আনন্দে খেলা করিতেছে, কখন বা সামান্ত কারণে পরস্পর বিবাদ করিতেছে, আবার পরক্ষণেই একসঙ্গে বালক সুলভ নানারূপ খেলায় মাতিতেছে।

বাহিরে কোথাও আগন্তুকগণকে সাদর সম্ভাষণে বসান হইতেছে, কেহ "রামা তামাক দেরে" বলিয়া প্রাসাদ বিকম্পিত করিতেছে। কোথাও বহুদর্শী প্রতিবেশী লুচিভাজা ব্রাহ্মণের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া বলিতেছে, "তোমায় বলা হ'য়েছিল কি, আর তুমি কল্লে কি? সবে মাত্র দুটি লোক এনে কি রূপ দেখাতে এলে?" ব্রাহ্মণ বলিতেছে,—"তা মহাশয়, আপনি এত কথা বল্‌ছেন কেন? আপনার কাজ হ'লেই ত হ'ল?" কেহ কর্ম্মকর্ত্তাকে আসিয়া বলিতেছে, "খুড়ো! ভাঁড়ার ঘর কোন্‌টা হবে? এদিকে দই সন্দেশ এসেছে সব তুলে রাখতে হবে ত?" কর্ম্মকর্ত্তা অমনি মিষ্ট বাক্যে কহিলেন,—"তা বাবা আমায় আর জিজ্ঞাসা ক'চ্চো কি? তোমরা যেটা হয়, একটা ঘর ঠিক কোরে নাওনা। আমি আর কি বোলবো। তোমাদের যাতে সুবিধা হয়, তাই কর।" বাবু দই ও সন্দেশ ওয়ালাকে

ডাকিয়া বলিলেন,—"দ্যাখ, তোমরা এখন যেওনা, এই খানে খাওয়া দাওয়া কোরে যাবার সময় টাকা নিয়ে যেয়ো। সন্দেশ-ওয়ালা অমনি একটু হাঁসিয়া কহিল,—"টাকার জন্যে কি আসে যায় বাবু! টাকা না হয়, আপনি দশদিন পরেই দেবেন। আপনার ত এই নূতন কাজ নয়, আর আমরাও এই নূতন দিতে আসিনি।" বাবুর বাজার পশার খুব, না হবেই বা কেন? চালানি কাজে মাসিক প্রায় সাতশত টাকা আয়, প্রজাবিলি জমিও যথেষ্ট, এতদ্ভিন্ন বাবু তেজারতি কাজও করিয়া থাকেন। ফলকথা ভদ্রেশ্বর মধ্যে চন্দ্রবাবু একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। দয়া ধর্ম্ম ও ন্যায়শীলতায় গ্রামের সকলেই তাঁর বশীভূত।

চন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় সংসার। প্রথম স্ত্রী একটী মাত্র কন্যা রাখিয়া গত হওয়ার পর চন্দ্রবাবু অনিচ্ছাস্বত্বেও আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। কিন্তু নব ভার্য্যাকে মৃতবৎস্যা রোগে আক্রান্ত দেখিয়া এতদিন দারুণ মনঃপীড়ায় নিপীড়িত ছিলেন। এক্ষণে মহা আনন্দিত; এতাবৎ পুত্রের কোন অসুখের চিহ্নও দেখিতেছেন না। নব-কলার পরিপুষ্ট নবশশধরের ন্যায় দিন দিন নবকুমারকে পরিবর্দ্ধিত দেখিয়া, বাবু এবং বাবুর আত্মীয়েরা মহা আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্ন। তাই আজ চন্দ্রবাবু মহা আনন্দে এই মহা সমারোহ ব্যাপারে মাতিয়াছেন। এ আনন্দের দিনেও তিনি মহা চিন্তায় নিপতিত। গত রজনী হইতে আকাশ যে প্রকার মেঘাচ্ছন্ন, তাহাতে বোধ হয় যেন, অচিরাৎ কি প্রলয় ঘটিবে। যদিও দ্বিতল পাকা বাড়ী, তত্রাচ তাঁর ভাবিবার কারণ এই যে, বাড়ীটী অতি ক্ষুদ্র ও স্বল্প পরিসর। বৈশাখ মাসে বড়

জলের আশঙ্কা না থাকা প্রযুক্ত, তিনি তাঁর বাটীর পার্শ্বস্থিত পতিত জমিতে সামিয়ানা খাটাইয়া আহারের স্থান নিরূপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি দেখিতেছেন যে, ইহাতে কোন ফল দর্শিবে না, নিমন্ত্রিতগণের যথেষ্ট কষ্ট হইবে এবং ঝড় জলে কার্য্যেরও বিশেষ বিশৃঙ্খল ঘটিবে। এতন্নিবন্ধন জনৈক প্রতিবেশীকে ডাকিয়া কহিলেন—"ওহে মুখুয্যে! এখন তোমার বারবাড়ীর দালান বই আর উপায় নেই। আকাশের পানে চেয়ে দেখেছ, ঝড় জল এলে কি হবে?"

মুখুয্যে মশাই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া বলিলেন—"তাতে আর আপত্য কি? আর এর জন্যেই বা চিন্তা কেন? দালান করাই আমার সার হয়েছে, কখনত আর লোকজনকে নিয়ে আমোদ ক'ত্তে পাল্লুম না। তা আজ তোমার দৌলতে যদি পাঁচ জনের পায়ের ধুলো পড়ে, তার চেয়ে সুখের বিষয় আর কি আছে?" তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন,—"নরেন! তুমি একটী লোক নিয়ে শীঘ্র ক'রে আমাদের বারবাড়ীর দালানের খড় আর ঘুঁটেগুলো সরিয়ে ঝাঁট দিয়ে রাখগে; যদি জল হয়, তা হ'লে আমাদের বাড়ীতে পাত করে দিতে হবে।" মুখুয্যে মহাশয়ের পুত্রটী আজ্ঞামাত্র একটা লোক লইয়া দালান পরিষ্কার করিতে গমন করিল। মুখুয্যে মহাশয় চন্দ্রবাবুকে বলিলেন,—"এত ভাবিবার কোন দরকার নাই, যাতে তোমার কাজের সুশৃঙ্খল হয়, তার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টায় আছি। তুমি তোমার নিমন্ত্রিতগণের নিকটে থাকগে।" যাহাহউক, চন্দ্রবাবু এক্ষণে একটু স্থির হইয়া অন্দরের কোথায় কি হইতেছে, দেখিতে গেলেন। মুখুয্যে মহাশয়

ভাঁড়ার ঘরের কর্ত্তা কাকে ক'র্ব্বেন, এইটী ভাবিতে ভাবিতে ভাঁড়ার ঘরের দিকে গমন করিলেন।

চন্দ্রবাবুর বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী। চতুঃ-পার্শ্বে নারিকেল ও শুপারি এবং মধ্যে মধ্যে বেল জুঁই গোলাপ গাছ ও বসান আছে। এতত্তিন্ন তিনদিকে সম্ভব মত দুই চারিটী আম ও কাঁঠাল বৃক্ষে পরিশোভিত বিস্তৃত জমিও আছে; অর্থাৎ প্রকৃত একটী বাগান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদিও পুষ্করিণীর সুবিমল স্বচ্ছ সলিলে নয়ন স্নিগ্ধকর জলজ পুষ্প সকল মৃদুল তরঙ্গকোলে হেলে দুলে পুষ্করিণীর শোভা সম্পাদন করিতেছে, যদিও সুনীল চল চল পদ্মপত্রে মীনপুচ্ছ প্রক্ষেপিত জলবিন্দু দীপ্তিশালী গজমুক্তা-সদৃশ টল টঁল করি-তেছে, যদিও মধুপায়ী মকরন্দ লোভে গুন্ গুন্ স্বরে উড়িয়া বেড়াইতেছে, যদিও পদ্মপুষ্পে খঞ্জন নৃত্য অতি মনোরম, তত্রাচ নিবিড় ঘনাচ্ছাদিত বিশাল গগণ ছায়া পুষ্করিণী বক্ষে নিপতিত হওয়ায় অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে। খিড়্‌কির পুষ্করিণী, ঘাটে সর্ব্বদাই স্ত্রীলোকের সমাগম। বিশেষ আজ কর্ম্মের দিন! কেহ বা জল লইতে আসিতেছে, কেহ কেহ ভোজন ও পানীয় পাত্র পরিষ্কার করিতেছে। দুই চারিটী সম-বয়স্কা ইন্দুনিভাননী জলে গলমগ্ন করিয়া গাত্র মার্জ্জন করিতে করিতে কত কথাই বলিতেছে। কেহ বা কৌতুক ছলে অপরের মুখে জল ছিটাইয়া দিতেছে, সে অমনি চম্পক-কলি-বিনিন্দিত অঙ্গুলি সমন্বিত হেমহস্তে হৈমমুখ আচ্ছাদিত করিয়া বলিতেছে, "ওকি ভাই আমিত স্নান কর্ব্বোনা,মাথার চুল ভিজে যাবে যে?" পরক্ষণেই সে কিন্তু অবসর বুঝিয়া প্রতিশোধ লইতে বাকি

রাখিতেছে না।" এইরূপে রসবতীদের রসতরঙ্গ জলতরঙ্গে মিশিয়া ধীরে ধীরে হেলিতে দুলিতে পুষ্করিণীর পরপার্শ্ব চুম্বন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। পাঠক! এদিকে দেখুন, ঘাটের এক পার্শ্বে আমাদের মধুমতী রাশীকৃত পান আনিয়া ধুইতে ধুইতে যুবতীদের জলক্রীড়া সন্দর্শন করিয়া মৃদুমন্দ হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল, "বৌদিদি! তুমি সাঁতার জান না? তা হ'লে একটা ফুল তুলে নিয়ে এস না।" বৌদিদি খুব রসিকা, অমনি হাঁসিতে হাঁসিতে কহিল,—"না ভাই সাঁতার জানিনা, তোমার দাদা সব শিখিয়েছেন, কেবল এইটে শেখান নি। সাঁতার জান্‌লে কি আর চিরকালটা হাবু ডুবু খেয়ে মরি?"

যুবতীদের হাঁসির তরঙ্গ ছুটিল, হাঁসিতে হাঁসিতে পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িল; দেখা দেখি মধুমতীও হাঁসিয়া ফেলিল। মধুমতী হাঁসিল কেন? তার হাঁসিবার কারণ কি? সে একজন দ্বাদশ বর্ষীয়া অবিবাহিতা বালিকা, বালিকা কি এ রসপয়োধির অন্তস্পর্শ করিতে পারিয়াছে? না হাঁসি দেখিয়া হাঁসিয়া ফেলিল? মধুমতী নিজেও ইহার মীমাংসা করিতে পারিল না, কিন্তু কথাগুলা বড় মিষ্টি লাগিয়াছে, তাই তাদের মুখপানে চাহিয়া রহিল। পরন্তু যুবতীরা এই সরস বাক্যের নানা শাখা প্রশাখা বাহির করিয়া কত রঙ্গই করিতে লাগিল। কিন্তু অকস্মাৎ তাদের এই রসতরঙ্গ মিশিয়া গেল। প্রাণের হাঁসি প্রাণে চাপিয়া রাখিতে হইল, জলক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হইয়া আর্দ্র বস্ত্রাঞ্চলে মস্তক আচ্ছাদিত করিতে হইল। একটী ঊনবিংশবর্ষীয় যুবককে স্নান করিতে আসিতে দেখাই ইহার কারণ। যুবতীরা সলজ্জভাবে ঘাটের একপার্শ্ব দিয়া উঠিবার

উপক্রম করিতে লাগিল। মধুমতীও চাহিয়া দেখিল। যদিও সে বালিকা, তত্রাচ তার একটু লজ্জা আসাতে গাত্রের বসন টানিয়া একটু কুণ্ঠিতভাবে বসিয়া রহিল। যুবক একটীর পর একটি এইরূপে সোপান অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে জলে অবতরণ করিয়া বলিল,—"মধুমতি! তুমি কি ক'রে পান ধুচ্ছ? এদিকে পান যে জলে ভেসে গেল?"

মধুমতী একটু হাঁসিয়া বলিল,—"পান ভেসে যাবে কেন? ও পান যে আমি জলকুমারীকে দিইছি।" উভয়ের নয়নে নয়নে সম্মীলন হইল। যুবক একটু হাঁসিয়া গাত্র মার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল। যুবতীদের মধ্যে যে গ্রামের মেয়ে, যার লজ্জার বিশেষ প্রয়োজন নাই; সে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে ইঙ্গিত করিয়া মধুমতীকে কহিল,—"মধুমতি! ওঁকে একটা ফুল তুলে আনতে বলনা।" মধুমতী কহিল,—"কেন তুমি বলনা?"

মধুমতীর এই মধুমিশ্রিত কথাগুলি যুবকের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র যুবক কহিল,—"কি মধুমতি?"

মধুমতী হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল,—"একটা ফুল।"

যুবক তখন বুঝিতে পারিল, যুবতীদের মধ্যে কাহারও ফুলের সাধ হইয়াছে; মধুমতীর ফুলের প্রয়োজন নাই। যুবক তখন জিজ্ঞাসা করিল,—"কে চায়?" এরূপ প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। যুবক যুবতীদের নিকট পরিচিত এবং আজ প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে সকলেই তাহার সহিত পরিহাস ছলে কথাবার্ত্তা কহিত। কিন্তু কালের কি অপূর্ব্ব মহিমা, এই অল্প সময়ের মধ্যে যুবতীদের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আজ তাহারা কালের বশীভূত হইয়াছে, আজ তাহাদের লজ্জা

আসিয়াছে, আজ তাহারা আত্মসংযম করিতে শিখিয়াছে, তাই আজ তাহাদের মুখে কথা ফুটিল না। তাই আজ তাহারা যুবককে আসিতে দেখিয়া জল হইতে উঠিয়া পড়িল; তাই আজ তাহারা যুবকের এই প্রশ্নে পরস্পর গা টিপিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে মৃদুমন্দ পাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিল। যুবক পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, একা মধুমতী ভিন্ন ঘাটে আর কেহই নাই। যাহারা ফুল তুলিতে বলিয়াছিল, যাহাদের সহিত যুবকের কথা কহিবার বাসনা হইয়াছিল, তাহারা কেহই নাই, কেবল বিশাল গগণ প্রান্তে জ্বলন্ত সন্ধ্যা তারাসদৃশ মধুমতী ঘাটের একপার্শ্বে বসিয়া আছে। যুবক যুবতীদের পলাইবার কারণ স্থির করিয়া আপনা আপনি একটু অপ্রতিভ হইল। মধুমতীর পান ধোওয়া শেষ হইয়াছে, কিন্তু আর উঠিল না; সে একদৃষ্টে যুবকের প্রতি চাহিয়া আছে ও মধ্যে মধ্যে দ্বিতীয়া-চন্দ্রিমা-সদৃশ নখাগ্রে দুএকটী পানের অগ্রভাগ কাটিয়া ফেলিয়া দিতেছে। বালিকার খঞ্জন-গঞ্জিত কৃষ্ণরেখা-পরিশোভিত নীলোৎপল-দল-সন্নিভ চল চল নয়ন দুটী আজ স্থির। বালিকা যদিও যুবককে পূর্ব্বে অনেক বার দেখিয়াছে, যদিও সে যুবকের হাত ধরিয়া কত খেলা করিয়াছে, তত্রাচ আজ সে যুবকের রূপ দেখিতেছে, যুবকের মুখ খানিকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে, এবং মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিয়া সুবিশাল বক্ষ ও কৃষ্ণকেশগুলির কত প্রশংসা করিতেছে। যুবক সন্তরণ ক্রীড়ায় সুনিপুন। গাত্রমার্জ্জন করিতে করিতে দেখিল যে বিস্তর ফুল ফুটিয়াছে। ধীরে ধীরে সলিলবক্ষে বক্ষ পাতিয়া হস্ত পদ সঞ্চালন করিতে করিতে ভাসিয়া গেল; বালিকাও হর্ষোৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া রহিল।

যুবক একটী দুইটী ক'রে বিস্তর ফুল তুলিয়া ভাসমান পদ্মপত্রে সংরক্ষণ করিল। কিন্তু এত ফুল একেবারে লইয়া যাওয়াই দুঃসাধ্য। যাহা হউক ক্ষণকাল চিন্তার পর অনন্যোপায় ভাবিয়া গুটীকতক দন্তের সাহায্যে ও গুটীকতক বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে জলাকর্ষণ করিতে করিতে ঘাটে আসিয়া পঁহুছিল। এবং একে একে ফুল গুলিকে সাজাইয়া মধুমতীকে কহিল, "মধুমতি! কেমন ফুল বল দেখি? এর মধ্যে তোমার যেটা ইচ্ছা হয়, তুমি সেইটে নাও।"

বালিকার নব-কিশলয়-দল-সদৃশ অধর প্রান্তে হাঁসি দেখা দিল। আরক্তিম গণ্ডদ্বয় কুঞ্চিত হইল ও অধরোষ্ঠ হইতে দুচারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্ত উঁকি মারিয়া যুবকের মন হরণ করিল। যুবক বালিকার অনেক দিন অনেক হাঁসি দেখিয়াছে, কিন্তু এরূপ হাঁসি কখন দেখে নাই। এ হাঁসি অমূল্য, এ হাঁসি সকলের ভাগ্যে ঘটে না। পাঠক! এই হাঁসিতে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের পরিণয় হয়, এই হাঁসিতেই যযাতি জরাগ্রস্ত হন। এ হাঁসি অনির্ব্বচনীয়, এ হাঁসিতে মধুমতীর মুখলাবণ্য দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইল, এই হাঁসিতেই যুবক আজ আত্মহারা হইল।

বালিকা ধীরে ধীরে একটি ফুল লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কখন এলে?"

যুবক উত্তর করিল,—"আমি এই কতক্ষণ এসেছি, তুমি ভাল আছত?" বালিকার এইবার মহাবিপদ, সে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাকে কেহ কখন এ প্রকার জিজ্ঞাসা ও করে নাই, সেও কখন এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেয়নাই। বিশেষ আজ বালিকার হৃদয়ে এই নবভাবের সঞ্চার হওয়ায় চিত্তের চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে,

যুবকের সহিত কথা কহিতে জিহ্বার জড়তা ঘটিতেছে, আজ তার লজ্জা আসিয়াছে, তাতে আবার বিষম প্রশ্ন। পূর্ব্বের ন্যায় যা হয়, একটা বলিতে সরমের ভয় আসিল।

যাহা হউক, এতক্ষণের পর বুঝা গেল যে, বিধাতা বালিকার এই বিপত্তিকালে সাহায্য করিবার নিমিত্ত গত রজনী হইতে আকাশে ঘন ঘনাচ্ছাদন করিয়া সজ্জিত হইয়াছিল। এক্ষণে অবসর বুঝিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না, বিলম্ব হইলে পাছে বালিকা অপ্রতিভ হয়, এই ভাবিয়া স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইল। পবনের দ্বার মুক্ত হইল, ঊনপঞ্চাশ পবন একসঙ্গে বহির্গত হইয়া দূরব্যাপী শাখা প্রশাখা প্রযুক্ত সুদৃঢ় মহীরুহের সহিত সন্ সন্ শব্দে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ঘাট মাঠ ঘর দরজা ধূলায় ধূলাকীর্ণ, প্রবল বাত্যায় রেণু সকল গগন আচ্ছাদন করিয়া উড্ডীয়মান হইল; ঘন ঘন দল দ্বন্দ্ব যুদ্ধে হুহুঙ্কার শব্দে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গজমুক্তা সদৃশ মুষলধারায় আত্মবিনাশে নিযুক্ত হইল। বালিকার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল, যুবক আর থাকিতে পারিল না, "মধুমতি! শীঘ্র বাড়ী পালাও" বলিয়া আপনিও ত্রস্ত হইল। বালিকা আজ আত্মহারা, যুবকের নিকট হইতে যাইতে আর মন সরিতেছে না। পরন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও অগত্যা প্রাণ লইয়া দুএকটী পদ স্খলিত হইয়াও পলাইল। যুবকও বালিকার রূপ ধ্যান করিতে করিতে প্রাসাদ অভিমুখে গমন করিল।

ঝড় বৃষ্টি দ্বিগুণ দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাস্তা ঘাট প্রাঙ্গন কর্দ্দম ও জলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রবাবুর সমূহ বিপদ। নিমন্ত্রিত-গণ সকলেই আসিয়াছে, বসিবার দাঁড়াইবার বিশেষ কষ্ট হই-

তেছে, এদিকে এখনও লুচিভাজা হয় নাই। প্রতিবেশীর মন্ত্রণানুযায়ী গোয়ালঘরে স্বতন্ত্র লুচি ভাজিবার স্থান নিরূপিত হইল। অধিক বেলা হইলে বালক বালিকাদের পাছে কষ্ট হয় ভাবিয়া, অন্দরে অন্নের আয়োজন হইয়াছে তাই রক্ষা। বালক বালিকাদের সঙ্গে দু একটি বয়স্কেরাও তরিয়া গেলেন। পাঠক! আমাদের পরিচিত যুবকটিও দালানের একপার্শ্বে একখানি পাতা পাতিয়া দক্ষিণহস্তের মহাব্যাপারে নিযুক্ত।

তারাসুন্দরী আসিয়া বলিলেন,—"তুমিও যে দেখছি ভাত খেতে বসেছ? সকলেই যদি ভাত খাবে, তবে লুচি খাবে কে?"

যুবক উত্তর করিল,—কেন, আমরাই খাব।"

তারাসুন্দরী যুবকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"হাঁ বাছা, তোমার মা এলোনা কেন? এটী কিন্তু তোমার মায়ের অন্যায় হ'য়েছে।"

যুবক উত্তর করিল, তাঁর অসুখ শরীর, তাই তিনি আস্‌তে পাল্লেন্ না, নৈলে তিনিত কতবার এসেছেন।"

তারাসুন্দরী দেবী একটু অভিমান করিয়া বলিলেন,—"তা বেশ, এক মাঘেতো শীত পালায় না তোমারও বিবাহের সময় আমাদেরও অসুখ কর্ব্বে।"

তাঁরাসুন্দরী দেবী আমাদের চন্দ্রবাবুর বর্ত্তমান গৃহলক্ষ্মী। বালিকাকালে পিত্রালয়ে একটী গ্রাম্যকন্যার সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দতা নিবন্ধন বাল্যক্রীড়াছলে পুত্তল পুত্তলীর বিবাহ দেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অন্যূন বিশ বৎসর অতীত হইল, এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রণয়ের বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হয় নাই। আমরা জানি, সমানে সমানে মিল হইলে, সেই প্রণয় বহুদিন স্থায়ী হয়। কিন্তু ইহাত

তা নয়, এ যে সম্পূর্ণ বিপরীত, চন্দ্রবাবু অপেক্ষা উপেন বাঁড়ুযো অনেকাংশে নির্ধন। যাহা হউক, এক্ষণে চন্দ্রবাবুর স্ত্রী "লজ্জা কোরোনা, যা নেবে, চেয়ে চেয়ে নিও" এই বলিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। এদিকে মধুমতী স্তম্ভগাত্রে গাত্রসম্মিলন করিয়া যুবকের আহার সন্দর্শন করিতেছে, যুবকও মধ্যে মধ্যে মস্তক উত্তোলন করিয়া বালিকার আকর্ণ বিস্তৃত নয়নদ্বয়কে আপন নয়ন কুক্ষি মধ্যে স্থানদান করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেছে।

মধুমতী ধীরে ধীরে কহিল, "দই এনে দেব ?"

যুবক উত্তর করিল,—"না, দই খাবনা।"

মধুমতী। তবে নেবু এনে দেব ?

যুবক। তা বরঞ্চ দাও।

মধুমতী। তবে একটু বস, তুলে নিয়ে আসি।

যুবক। কোথা থেকে ?

মধুমতী। কেন, আমাদের খিড়কির গাছে হয়েছে।

যুবক। এই জল পোড়্ছে, এখন তুমি নেবু তুলে নিয়ে আস্‌তে যাবে ? তার চেয়ে তুমি আমায় দই দাও।

বালিকা অবিলম্বে এক হাঁড়ি দই আনিয়া ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের সাহায্যে যেমন ঢালিয়া দিবে, অমনি তাহার হাত কাঁপিল, মৃৎপাত্রটি হস্তচ্যুত হইয়া ভাতের উপর পড়িল, যুবকও দধি বিন্দুতে সজ্জিত হইল। মধুমতী আর দাঁড়াইতে পারিল না, মধুমতী সরিয়া পড়িল। বালিকার লজ্জা আসিয়াছে, সে থামের আড়ালে গিয়াও নিস্তার পাইল না। সেতারের সমস্ত তার গুলিতে অঙ্গুলিস্পর্শ করিবামাত্র যেমন সুধাবিমিশ্রিত স্বর-লহরী

বিনির্গত হয়, পার্শ্বস্থিত কক্ষ হইতে কামিনীদের ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে ক্ষীণ হাস্যের রোল উঠিল। বালিকা আর নাই, সে এবার এস্থান হইতেও পলাইয়াছে। পরমান্ন হস্তে একটি প্রাচীনা আসিয়া বলিল,—"ওমা, একি হ'য়েছে! মেয়েটার সকল দিকেই গিন্নিপনা আছে, বল্লুম্ তুই পার্ব্বিনি, আমি দিয়ে আস্‌ছি, তা আর হ'লোনা। ছি ছি, কি করেছে দ্যাখ দেখি। তা বাছা খাওয়া হ'লে গাটা ধুয়ে ফেলো, কাপড় ছেড়ে ফেলো এখন।" এই বলিয়া প্রাচীনা পরমান্ন প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। কক্ষ-মধ্যে এখনও হাঁসি চলিতেছে, এখনও এ রহস্যের অভিনয় হইতেছে। কেহ বলিতেছে,—"আমি মনে করি ঠাকুরঝিও বুঝি মাথায় একটু পায়েস ঢেলে দেয়।" অমনি আর একজন বলিল,—"তা হ'লে কিন্তু বেশ দেখ্‌তে হ'ত।" এইরূপে তাদের অনেক কথা অনেক হাঁসি হইল, কিন্তু সে হাঁসি সে কথার শব্দ ঘরের আর বাহির হইল না। যাহা হউক, যুবক আহার সমাপনান্তে পুষ্করিণীর অভিমুখে চলিল, সকলে দেখিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে অনেক কথাও কহিল, মধুমতী হ'তে আজ যুবকের একটু লজ্জাও জাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মধুমতী অপরের।

বেলা দ্বিপ্রহর অতিত। নিমন্ত্রিতগণ ক্ষুধায় উৎকণ্ঠিত, বৃষ্টি আর থামিল না। চন্দ্রবাবু অগত্যা মুখুয্যেদের বারবাড়িতে পাত পাতিতে আরম্ভ করিলেন। জনৈক প্রতিবাসী দু চারিটী লোককে ডাকিয়া কহিল,—"তোমরাও সঙ্গে সঙ্গে লুচি দিতে আরম্ভ কর, নৈলে পাতা উড়ে যাবে।" লুচি শাকভাজা পড়িতে না পড়িতে চন্দ্রবাবু নম্রতা সহকারে "মহাশয়েরা গাত্রোত্থান করুন, সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে" বলিয়া সকলকে মুখুযোদের বাড়িতে লইয়া গেলেন। নিমন্ত্রিতগণ একে একে উপবেশন করিয়া আচমনান্তে "বসিতে আজ্ঞা হয়" এই শব্দের অপেক্ষা করিতে না করিতে পংক্তির এক প্রান্ত হইতে "সকলেই বসেছেন ত তবে আর অপেক্ষা কেন?" শব্দ উত্থিত হইয়া অপর প্রান্তে মিশিয়া গেল। কার্য্য আরম্ভ হইল, সকলেই নিরব, কাহার মুখে আর কথা নাই। একে একে ছক্কা হইতে আরম্ভ হইয়া মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত দেওয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে দধির তরঙ্গ ছুটিল। পাঠক! এই

অবসরে একবার দধিপ্রিয় মহাত্মাদিগের মুখসৌন্দর্য্য সন্দর্শন করুন। কেমন মুখশ্রী দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে সুপ্ সাপ শব্দ হইতেছে। এতক্ষণের পর দন্তগুলি অবসর পাইল, গণ্ডা গণ্ডা মণ্ডা দধি মিশ্রিত হইয়া একেবারেই উদরসাৎ। চন্দ্রবাবু গললগ্নে বিনয় সহকারে সকলকেই সন্তোষ করিলেন।

ভোজন কার্য্যও শেষ হইল, বৃষ্টিও থামিল। চন্দ্রবাবুর অদৃষ্টে এই ভোগ ছিল, তাই এই আনন্দের দিনে এই বিধি বিড়ম্বনা। আকাশ পরিষ্কার, ধরিত্রী সূর্য্যের মুখ সন্দর্শন করিলেন, বিহঙ্গমচয় পল্লব আগার হইতে বাহির হইয়া পক্ষ ঝাড়িতে ঝাড়িতে আহার অন্বেষণে পুনরায় নিযুক্ত হইল। বেলা তৃতীয় প্রহর অতিত, সূর্য্য উত্তাপের হ্রাস হইয়া আসিতেছে। নিমন্ত্রিত-গণ বেলা থাকিতে যাত্রা করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া চন্দ্রবাবুর নবকুমারটীকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত। তাঁহারা তামাকু সেবন করিতে করিতে জনৈক প্রতিবাসীকে কহিলেন, "মহাশয়! বাবুর পুত্রটিকে আনান হউক না।" প্রতিবাসীটী এই কথা শুনিয়া অন্দরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পরে প্রচুর পরিমাণে তাম্বুল আনিয়া প্রত্যেককেই দুই চারিটি তাম্বুল দানে বাধিত করিলেন। এদিকে মধুমতী রক্তপট্টবস্ত্র পরিধৃত, স্বর্ণ অলঙ্কারে বিভুষিত, বালসূর্য্য-সন্নিভ চন্দ্রবাবুর আশাতরুর অমিয় ফলটীকে ক্রোড়ে লইয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিল।—সকলেই এক বাক্যে শিশুর পদ্ম প্রস্ফুটিত হাস্যানন, খগ গঞ্জিত অতুল নাসিকা, কজ্জল-পরিবেষ্টিত শ্রুতি-পরশিত নয়নের সহস্র মুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন,—"না হবেই বা কেন? চন্দ্রবাবুর ছেলেত?" কেহ কেহ শিশুর নবনি

সংগঠিত অর্দ্ধবর্ত্তুল চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিলেন,—"কিগো! বাপের হাত রাখতে পার্ব্বে কি?" আহা শিশু কিছুই জানেনা, ভাল মন্দ কিছুই বুঝে না, আপন পর সবাই সমান, সে সদাই আনন্দিত। শিশু এ কথার ভাব বুঝিতে পারিল না সত্য, কিন্তু একটু হাসিয়া ফেলিল। হায়রে! এ হাসি দেখিয়াও লোক বন্যকুসুমের প্রতি ফিরিয়া চায়, এ মুখলাবণ্য সন্দর্শন করিয়াও লোকে পূর্ণ শরৎশশীর আদর করে।

যাহা হউক অনেকে এই নবকুমারকে উপেক্ষা করিয়া মধুমতীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মধুমতী একে সুশ্রী, বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনবৎ, তাতে আজ আবার সে একখানি সূক্ষ্ম নীল বসন পরিধান করিয়াছে, স্বর্ণ অঙ্গ স্বর্ণ অলঙ্কারে পরিপূর্ণ, বালিকার সৌন্দর্য্যের আর সীমা নাই। কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী চন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এটি কার মেয়ে?"

চন্দ্রবাবু বলিলেন—"এটী আমারই মেয়ে।"

কমলাকান্ত বাবু তখন বুঝিতে পারিলেন যে, এটী [illegible] চন্দ্রবাবুর প্রথম পক্ষীয় কন্যা। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে আর অপেক্ষা করেন কেন? একটা দেখে শুনে বিবাহ দিয়ে ফেলুন না?"

চন্দ্রবাবু একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, —"তা আপনা-রাই একটা দেখে শুনে দিন না, তা হলে ত আমি বেঁচে যাই, জান্‌লেম যে একটা দায় হতে পরিত্রাণ পেলুম।"

মধুমতীর লজ্জা আসিল, আজি তার বিবাহের কথা হইতেছে, বালিকা পলাইবার সুযোগ দেখিতে লাগিল। কমলাকান্ত বাবুর পুত্রটীও এসভায় উপস্থিত, সে একদৃষ্টে মধুমতীর প্রতি চাহিয়া

রহিল, এবং বালিকার অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া মনে মনে স্থির করিল যে, যদি কোথাও সুন্দরী থাকে, তাহা হইলে এই, যদি কোন রমণী-রত্নকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে ইহাকেই! ফল কথা, কমলাকান্তের পুত্রের মধুমতীকে বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইয়াছে। কমলাকান্ত বাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন,—"তা বেশত চন্দ্রবাবু! আপনার সঙ্গে আমার অনেক দিনের হৃদ্যতা, এইবার কেন পাকাপাকি হ'য়ে যাক্‌না? আমার পুত্রের সঙ্গে আপনার কন্যার কেন বিবাহ দিন না?"

চন্দ্রবাবু একটু আপ্যায়িত হইয়া বলিলেন,—"সেটা আমার সৌভাগ্য।"

কমলাকান্ত রায় হুগলির একজন প্রধান জমিদার, চন্দ্রবাবু অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। কমলাকান্তের সঙ্গে চন্দ্রবাবুর কুটুম্বিতা স্বপ্নের অগোচর। তাই চন্দ্রবাবু আজ সৌভাগ্যের প্রসংশা করিলেন। কমলাকান্তের পুত্রের আনন্দের আর পরিশেষ নাই, মেঘ না উঠিতেই জল। সে মনে মনে ভাবিতেছিল যে, যে কোন প্রকারে হোক ইহাকে বিবাহ করিতেই হইবে। এখন তার ভাবনা দূর হইল, আর তাহাকে লজ্জার মাথা খাইয়া চেষ্টা করিতে হইবে না, এখন সে স্থির, তার পিতা স্বয়ংই এ বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। বিশেষতঃ কমলকান্ত বাবু যা মনে করেন তাই করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত সে ভাবিল, এ কার্য্য নিশ্চয় সম্পন্ন হইবে, অতি শীঘ্রই তার আশা পূর্ণ হইবে। কেউ হাঁসে কেউ কাঁদে!

পাঠক আমাদের সেই যুবকটীও এই স্থানে উপস্থিত। সে সমস্তই শুনিতেছে। চন্দ্রবাবুর এই কথাটী যুবকের হৃদয়ে শেল

মর্ম বিদ্ধ হইল, তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, সে মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া স্থির করিল যে, "মধুমতী আমার নয়, মধুমতী অপরের।"

চন্দ্রবাবু জনৈক আত্মীয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কহিলেন,—"কমলাকান্ত বাবু! যখন আমাদের উভয়ের ইচ্ছা এক হইয়াছে, তখন আর শুভ কার্য্যের বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।"

কমলাকান্ত বাবু একটু হাঁসিয়া কহিলেন,—"তাতে আর ক্ষতি কি? এখন আপনি ব্যস্ত আছেন, সে তখন একদিন একটা স্থির করা যাবে। আপনার সঙ্গে আমার কুটুম্বিতা করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা।"

অমনি পার্শ্বস্থিত একটি লোক বলিয়া উঠিল —"তা মহাশয়! চন্দ্রবাবু আমাদের মাটির মানুষ, ওঁর সঙ্গে কুটুম্বিতা করে সুখ পাবেন।"

আর না, যুবক এইবার হতাশ, এতক্ষণের পর সন্দেহ ঘুচিল, এতক্ষণের পর তার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল যে, মধুমতী অপরের। যুবক চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতেছে, আর সে স্থির থাকিতে পারিলনা, আর কিছু ভাল লাগিল না, সে এখান হইতে চলিয়া গেল। যাহা হউক, ক্ষণকালের পর সকলেই ক্ষমতানুযায়ী যৌতুক প্রদানান্তে একে একে চন্দ্রবাবুর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। চন্দ্রবাবুও বিনয়তা গুণে সকলের নিকট প্রশংসা ভাজন হইয়া বলিলেন,—"আপনারা মনে কিছু করিবেন না, কারণ আপনাদের সম্মান রক্ষার আমি কিছুই জানি না।"

নিমন্ত্রিতগণ একে একে প্রস্থান করিল, কিন্তু বাটির জনতা ঘুচিল না, কারণ আত্মীয়বর্গের মধ্যে অনেকেই যাহারা দূরদেশ

হইতে আসিয়াছে, তাহারাও আজই যাইবে না, তাহারা দুচারি দিন থাকিবে। মধুমতী ধীরে ধীরে বাটীর ভিতর গমন করিল। সে এক্ষণে মহা আনন্দে নিমগ্না, সে ভাবিতেছে, আমার বিবাহ হইবে—হুগলির জমীদারদের বাড়িতে আমার বিবাহ হইবে। একটি অর্দ্ধবয়স্কা রমণী আসিয়া কহিল,—"কিগো বাছা! হুগলির জমীদারদের বৌ হবে তুমি?"

মধুমতী ঈষৎ হাসিয়া মস্তক অবনত করিল।

রমণীটী পুনরায় বলিল,—"তা বাছা জমীদারদের বৌ হ'য়ে যেন আমাদের ভুলে থে'কনা। এক একবার মনে ক'র। আহা! এমন সময় যদি তোমার মা থাকৃত, তা হ'লে তোমার এই সুখটুকু দেখতে পে'ত।"

মধুমতী বিমাতার যত্নে একদিনও মার কথা মনে আনে নাই, একদিনও তাহার মাতার জন্য দুঃখ হয় নাই, একদিন সে মাতাকে ভুলিয়া ছিল। আজ রমণীর এই কথা শুনিয়া তাহার মাতার চিন্তা আসিল, আজ সে ভাবিল আমি মাতৃহীনা। রমণী মধুমতীর ভাব বুঝিতে পারিয়া নানা কথায় ভুলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু, সে চেষ্টা বৃথা। বালিকা যে বুঝিতে পারিয়াছে "আমার মা নাই, আমি পরের মাকে মা বলি।" বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু সে কতক্ষণ? শীঘ্রই তার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। সে তার চিত্ত-হারী মধুর-ভাষী প্রাণের যুবককে দেখিতে পাইল। যুবকের প্রাণ অস্থির হইয়াছে এখানে থাকিতে আর তাহার তিল মাত্র ইচ্ছা নাই, অদ্যই সে বাড়ি যাইবে। সে মনে মনে স্থির করিয়াছে যে মধুমতীর প্রতি আর ফিরিয়া চাহিবে না, মধুমতীর সহিত আর কথা কহিবে না, মধুমতী যে স্থানে, যুবক ক্ষণকালও

সে স্থানে থাকিবে না। তাই যুবক এত ত্রস্তভাবে কাপড় ছাড়িয়েছে। রমণীটী সেস্থান হইতে চলিয়া গেলে পর মধুমতী চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে যুবকের নিকটস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি বাড়ি যাবে?"

যুবক নিরুত্তরে রহিল। বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কাপড় ছাড়চ কেন?"

যুবক মুখ ফিরাইয়া মৌনভাবে কাপড় ছাড়িতে লাগিল। বালিকা ভাবিয়া আকুল। তারাসুন্দরী দেবী সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে যুবককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কাপড় ছাড়চ যে?"

যুবক উত্তর করিল,—"বাড়ি যাইব"।

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"সেকি? এসেছ তুদিন থাক, একি তুমি পরেরবাড়ি এসেছ? মধুমতি! জামাটা ঘরের ভিতর রাখগেত মা"

মধুমতী জামা লইয়া প্রস্থান করিল এবং কোন প্রকাশ্য স্থানে না রাখিয়া আপনার ইচ্ছামত স্থানে রাখিল। যুবককে অগত্যা তারাসুন্দরীর বাক্যে থাকিতে হইল। যুবক ভাবিল যদিও এখানে তুদিন থাকিব বটে, কিন্তু মধুমতীর সহিত আর কথা কহিব না, তাহার বিষয় অনর্থক আর চিন্তা করিব না। যুবকের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে, সে সর্ব্বদাই ভাবিতেছে যে, "মধুমতী আমার নয়, মধুমতী অপরের। তুদিন পরেই সে অন্যের হৃদয়ে শোভা পাইবে, তুদিন পরে আর আমি তাহার সঙ্গে বিরলে কথা কহিতে পাইবনা, তুদিন পরেই তাতে আমাতে বিভিন্ন। তবে আর তার বিষয় চিন্তা করিবার প্রয়োজন কি?" যুবক এই ভাবিতে ভাবিতে বহির্ব্বাটীতে গমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি তোমার।

সন্ধ্যা হইল, এখনও মধুমতী ছাদে বসিয়া আছে। মৃদুল হিল্লোলে বালিকার অলকগুচ্ছ দোলাইয়া সন্ধ্যা সমীরণ বহিতেছে, দূরস্থ বৃক্ষ সকল তমসাচ্ছন্ন হইয়া ভীতিরুৎপাদন করিতেছে। ক্রমে ক্রমে ঘোর অন্ধকার ধরিত্রী দেবীকে আলিঙ্গন করিল। আর কিছুই লক্ষ্য হয় না, কেবল সুবিমল নৈশগগণে দুই চারিটী নক্ষত্র উদিত হইয়াছে। মধুমতী তাহাই দেখিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই ভাল লাগিতেছে না। করেতে কপোল রাখিয়া চিন্তার প্রবল তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। আজ সে মহা চিন্তায় নিমগ্না, যুবক তাহার সহিত কথা কহে নাই। "সে কেন কথা কহিল না? আমাকে দেখিলেই সে কেন মুখ ফিরাইয়া থাকে? কেন আমায় তাচ্ছল্য করিতেছে?" এই ভাবিতে ভাবিতেই বালিকা আকুল, এই ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, তবু কিছুই স্থির করিতে পারিল না। মধুমতী বিষাদে একবার আকাশের প্রতি চাহিয়া দেখিল, যেন আকাশে অসংখ্য জুঁই ফুল ফুটিয়াছে। ইহাতেও তাহার মন

স্থির হইল না, সে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় চিন্তার গাঢ় আলিঙ্গনে গা ঢালিয়া দিল।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি নয়টা বাজিল। প্রকৃতিদেবী গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, জনমানবের শাড়া শব্দ নাই। সহরবাসী-দিগের পক্ষে একথাটী অসম্ভব হইতে পারে। যাহাহউক, কেবল চন্দ্রবাবুর কর্ম্মের বাটী বলিয়া এখনও মনুষ্যের কোলাহল শুনা যাইতেছে। স্তম্ভিতভাবে বিটপীচয় বিহঙ্গমগণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া গাঢ়োতালঙ্কারে সজ্জিত হইতেছে। দুএকটী বাদুড় ও পেচক করুণ স্বরে এদিক ওদিক করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। মধুমতী আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, এই অন্ধকারে একলা থাকিতে তাহার ভয় হইল, সে ভাবিল যাই নিচে যাই, দেখি যদি কোন স্থযোগে তার সঙ্গে দেখা করিতে পারি! এই ভাবিয়া মধুমতী নিচে আসিল, সে তন্ন তন্ন করিয়া যুবকের অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইল না। শেষ জানিতে পারিল যে, যুবক বহির্ব্বাটীর নিভৃত কক্ষে শয়ন করিয়াছে। বালিকা স্থির করিল, তবে এখন থাকুক, এখনও লোকজন যাওয়া আসা করিতেছে, সকলে ঘুমাইলে পর একবার যাইব। বালিকা আহারান্তে অবসর খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু দশটা বাজিল, এগারটা বাজিল, তবু এখনও সকলে জাগিয়া আছে। সে কৃত্রিম নিদ্রায় চক্ষু মুদিয়া একটু শুইয়া থাকিল। বালিকার হৃদয়ে আর কত সহ্য হয়, সে কখন এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে নাই, সে কপট-নিদ্রা যাইতে যাইতে যথার্থই নিদ্রাভিভূতা হইল। বালিকা নিস্পন্দ। এখন তার সচঞ্চল আয়ত লোচনদ্বয় স্থির, এখন তার পার্থিব

লজ্জা ভয় চিন্তা সমস্তই দূরে গিয়াছে, এখন সে নিদ্রার কোমল অঙ্কে গা ঢালিয়া দিয়াছে।

অয়ি নিদ্রে! তোমার একি বিবেচনা? তুমি নারী হ'য়ে নারীর বেদনা বুঝিতে পারিলে না? তোমার হৃদয় এত কোমল যে, যে যত বড়ই দুর্দ্দান্ত হউক না কেন, যে যতই সন্তপ্ত হউক না কেন, যে যতই চিন্তান্বিত হউক না কেন, তোমার আলিঙ্গনে সকলেই নিস্তব্ধ, তোমার আলিঙ্গনে সকলেই বিমোহিত। তুমি শান্তির অধিত্রী, তোমার আলিঙ্গনে সকলেই শান্তি পায়। কিন্তু, একি! তোমার কোমল হৃদয় আজ পাষাণভাব ধারণ করিয়াছে কেন? তুমি বালিকার প্রতি আজ নিষ্ঠুর ভাব ধারণ করিয়াছ কেন? তোমায় মিনতি করি তুমি আজ বালিকার হৃদয় হইতে অন্তরিত হও, বালিকা আজ তোমায় চায় না। যদিও তোমার উদ্দেশ্য আছে, যদিও তুমি বালিকা-কোমল-হৃদয়-সম্ভূত কোমলত্বটুকু সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত আজ তার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছ, তত্রাচ তোমায় বলি, এ স্বার্থ টুকু পরিত্যাগ কর—আজিকার জন্য এ স্বার্থ টুকু পরিত্যাগ কর! আহা! আজ সে ব্যাকুলা, আজ সে অপরাহ্ন হইতে যুবকের সহিত কথা কহিবার অবসর খুঁজিতেছে, কেবল জনতা নিবন্ধন লোক লজ্জায় সুযোগ পায় নাই, সে মনে মনে স্থির করিয়াছে যে, গভীর নিশীথ রাত্রে যুবকের সহিত কথা কহিয়া তার আশাপূর্ণ করিবে, তার সন্দেহ দূর করিবে, তার চঞ্চলচিত্ত স্থির হইবে! কিন্তু, একি! তুমি তার সমস্ত চেষ্টা বিফল করিলে, তার আশা ভঙ্গ করিলে। কেন? বালিকা তোমার কি করিয়াছে? মধুমতী তোমা অপেক্ষা অনেক হীন। তুমি ইচ্ছা করিলে সকল হৃদয়ে

পরিভ্রমণ করিতে পার। বালিকা স্বল্প একটী হৃদভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাকি তোমার সহ্য হইল না? তাতে তোমার এত হিংসা যে, তোমার প্রিয় সহচর মধুর মলয়ানীলকে ডাকিয়া আনিয়াছ?

মধুমতী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা। সে সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছে. সে কিছুই জানিতে পারিতেছে না। যে নিদ্রা তার কাল হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে রাত্রি অবসান, ভোর হইয়াছে, এখন একটু একটু অন্ধকার। শাখাসীন বিহঙ্গমকুল কাকলি লহরী তুলিয়া মধুরস্বরে প্রকৃতিদেবীর গুণানুকীর্ত্তন করিতেছে। প্রাচীদিক্ পরিষ্কার, সূর্য্যদেব আরক্তিমবর্ণে উদয়াচলে উপবেশন করিলেন। সরসীসলিলে শিশিরসিক্তা কমলিনী প্রস্ফুটিত হইল। মানিনী অশ্রুবিন্দু মুছিল না, সে যেন প্রাণকান্তকে রজনীর দারুণ বিরহ যন্ত্রণা জানাইবার নিমিত্ত সজল নয়নে সলিল বক্ষে ভাসিয়া রহিল। শীতল মলয়ানীল জলজ ও স্থলজ ফুটন্ত অফুটন্ত কুসুমচয়কে দোলাইয়া হেলিতে দুলিতে উষাভরে খেলা করিতে লাগিল। কাল জল হইয়া গিয়াছে, চাষিরা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, তাহারা একে একে লাঙ্গল স্কন্ধে বাহির হইল। দেখিতে দেখিতে রাস্তায় লোক চলিল, গৃহস্থ রমণীরা গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইল। চন্দ্রবাবুর বাটীরও সকলে উঠিয়াছে, কেবল মধুমতী এখনও সুখস্বপ্ন সমাচ্ছন্না, অর্দ্ধনিদ্রায় নিদ্রিতা। গবাক্ষ দিয়া আলো আসাতে বালিকার মুখচন্দ্রিমার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার গণ্ডদ্বয়ের রূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন হইতেছে, কখন বা রক্তিমা ভাব ধারণ করিতেছে, কখন বা পাণ্ডুবর্ণ হইতেছে। তাহার পক্ক বিম্ব-

সদৃশ কচিকচি ঠোঁট দুখানি কখন হাঁসি হাঁসি ভাবে মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে, কখন বা ভয়বিহ্বলার ন্যায় কুঞ্চিত হইয়া ঈষৎ ফুলিয়া উঠিতেছে। বালিকার সুকোমল বক্ষের হৃদয়খানি অনাবৃত থাকিয়া কখন নয়ন মুগ্ধকর ভাঁতি প্রকাশ করিতেছে, কখন বা দুরু দুরু কম্পনে মলিন ভাব ধারণ করিতেছে। ফল কথা, সে কখন হাঁসিতেছে, কখনবা বিষাদসাগরে নিমগ্না হই- তেছে। ক্রমে সূর্য্যের দীপ্তি প্রকাশ পাইল। গবাক্ষ দিয়া সূর্য্যরশ্মী বালিকার কপোল স্পর্শ করিল, বালিকার রক্তিম মুখখানি অধিকতর রক্তিম ভাব ধারণ করিল।

মধুমতীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে একেবারে শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহের বাহিরে আসিল। কিন্তু হায় সে হতাশ, তার সকল চেষ্টা বিফল, সে দেখিল সূর্য্যকিরণ বৃক্ষচূড়া হইতে ধরাস্পর্শ করিয়াছে, চতুর্দ্দিকে রৌদ্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তত্রাচ বালিকা স্থির থাকিতে পারিল না, চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে এক- বার বহির্ব্বাটি গমন করিল। যুবক যে কক্ষে শয়ন করিয়াছিল, সে কক্ষের দ্বার মুক্ত। মধুমতী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, শয্যা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে, গৃহে লোক- নাই, এবং এ শয্যায় যে কেহ শয়ন করিয়াছিল এরূপ বিবেচনা হয় না। সে মনে মনে ভাবিল একি হ'ল! আমারই কি ভুল হইয়াছে? না—কাল রাত্রিতে যে আমি এই ঘরের দরজা বন্ধ দেখিয়া গিয়াছি। বালিকার বিস্ময় জন্মিল, সে ধীরে ধীরে পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া মুখ হাত ধুইল, ঘাটে আসিয়া পূর্ব্বদিনের সমস্ত কথা তার মনে পড়িল, হৃদয় দ্বিগুণতর চঞ্চল হইল। সে একবার প্রস্ফুটিত কমল নিচয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই

যুবকের অনুসন্ধানে গমন করিল, কিন্তু কোথাও দেখা পাইল না। বাড়িতে এত লোক জন, কাহারও কাছে তার বসিতে ইচ্ছা হইল না, কাহারও সহিত তার কথা কহিতে ইচ্ছা হইল না, সে একাকী থাকিতে ইচ্ছা করে, তাই ধীরে ধীরে ছাদের উপরে উঠিল। ছাদে উঠিয়া দেখিল, বহির্ব্বাটির ছাদের একপার্শ্বে নারিকেল বৃক্ষের একটু ছায়া পড়িয়াছে, সেই খানে তার হৃদয় আনন্দকর প্রাণের যুবকটী বসিয়া আছে।

যুবক মহা চিন্তায় নিমগ্ন। চক্ষু দুটী তার লাল হইয়াছে, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই। যুবক আর কোন্ সুখে ঘুমাইবে? যুবকের হৃদয়ে বিষের জ্বালা ধরিয়াছে। গৃহের অর্গল বন্ধ করিছিল সত্য, কিন্তু সে শয়ন করে নাই, সে শয্যার একপার্শ্বে স্থির ভাবে বসিয়াই রাত্রি যাপন করিয়াছে। চঞ্চল প্রাণে এক স্থানে বসিয়া থাকিতে না পারায় ভোরের বেলায় আস্তে আস্তে ছাদে আসিয়াছে। দ্বিতল বাটির উচ্চছাদে উঠিয়া সে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিল। সে দেখিল, নিকটস্থ তরু গুল্ম লতা, বিস্তৃত শ্যামল ক্ষেত্র, পুষ্করিণীর কহ্লার কোকনদ আদি যেন নবজীবন ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতির এই শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া, প্রকৃতি দেবীকে উষার-হাঁসিতে হাঁসিতে দেখায় যুবকের জাগন্ত হৃদয়দর্পণে মধুমতীর বিজলী বিনিন্দিত অমিয় জড়িত হাঁসির রেখাটুকু প্রতিফলিত হইল। যুবকের চঞ্চল প্রাণ দ্বিগুণতর চঞ্চল হইল। যুবক আর দাঁড়াইতে পারিল না, যুবক বসিয়া পড়িল। সেই অবধি সে ছাদের একপ্রান্তে এক ভাবে এক দৃষ্টে অবনত মস্তকে বসিয়া আছে, এবং মধ্যে মধ্যে একএকটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে।

পাঠক! বালিকা অবসর পাইয়াছে, বালিকা আর অন্দরের ছাদে নাই, সে বহির্ব্বাটির ছাদের সোপান অতিক্রম করিয়া যুবক একাকী বসিয়া কি করিতেছে, জানিবার নিমিত্ত পায়ের শব্দ পায়ে চাপিয়া ধীরে ধীরে যুবকের পশ্চাতে দাঁড়াইল। যুবক গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন, সে অনেক বিষয় ভাবিতেছে, সে মনে মনে করিতেছে, যে, যদি আমার পিতা হুগলির জমীদারের ন্যায় ধনাঢ্য হইতেন, যদি আমি একজন ধনীর পুত্র হ'তেম, তাহ'লে আজ আমার কোন ভাবনা থাকিত না, তা'হলে আজ আমি নিরাশ হ'তেম না। এই ভাবিতে ভাবিতে যুবকের চক্ষুদুটী রক্তবর্ণ হইয়া জলে ভাসিতে লাগিল। যুবক বাহ্যজ্ঞান রহিত, স্থির চিত্তে মধুমতীর কথা ভাবিতে ভাবিতে তার অন্তরের কথা মুখে প্রকাশ পাইল, সে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"মধুমতী আমার নয়, মধুমতী অপরের।" বালিকা অবাক! সে একথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, সে ভাবিল যুবক কি ভাবিতেছে? যুবক একথা বলিল কেন? কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সে ধীরে ধীরে কহিল,—"তুমি এখানে ব'সে কেন?" মধুমতীর এই ক্ষীণ কথাটী যুবকের কর্ণে প্রতিঘাত হইল, যুবক চকিতভাবে পশ্চাত ফিরিয়া দেখিল, মধুমতী! যুবক মস্তক অবনত করিল। মধুমতী এতক্ষণ যুবকের মুখের প্রতি লক্ষ্য করে নাই, সে এখন দেখিল মুখখানি মলিন হইয়াছে, বিশাল নয়ন দুটী জলে ভাসিতেছে। পরক্ষণে বালিকা, চঞ্চল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি ভাবচ? তোমার কি হয়েছে? তোমার চোখে জল কেন?"

যুবক একথার উত্তর না দিয়া উঠিয়া পড়িল।

মধুমতী বুঝিতে পারিয়াছে, যে, যুবক এখনি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। সে আর বিলম্ব করিল না, সে ধীরে ধীরে যুবকের হস্ত ধারণ করিল। বালিকা অনেক দিন অনেকবার যুবকের হাত ধরিয়াছে, কিন্তু আজ তার হাত কাঁপিল, আজ তার হৃদয় সঙ্কুচিত হইল, আজ সে অন্তরের মধ্যে একটী নবসুখ লাভ করিল।

যুবক আর পলাইতে পারিল না, মধুমতীর কোমল কর আর ছাড়াইতে পারিল না, মধুমতীর নিকট হইতে আর অন্তরিত হইতে পারিল না। সে ইচ্ছা করিলেই সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু সে যে মধুমতীর বিষণ্ণবদনখানি সন্দর্শন করিয়াছে, সে যে তার প্রাণ প্রতিমার নয়নে জলপ্রপাত দেখিতে পাইয়াছে, সে আপনা হইতেই স্থির। বালিকাকে বিষাদমগ্না সন্দর্শন করাতে অন্তর কাঁদিয়াছে, তার প্রাণ অস্থির হইয়াছে, তার হৃদয় চকোর মর্ম্ম বুঝিবার নিমিত্ত সমুৎসুক। সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, সে তার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিল না, সে বালিকার মুখ পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মধুমতি! তুমি কাঁদ্‌চ কেন?"

বালিকা এতক্ষণের পর একটু স্থির হইল, যুবক তাহার সহিত কথা কহিয়াছে, সে ধীরে ধীর উত্তর করিল,—"তুমি কাঁদ্‌চ কেন?"

যুবক ব্যস্ততা সহকারে কহিল,—"সে পরে বোল্‌ব, আগে তুমি বল, তোমার চোখে জল কেন?"

মধুমতী যুবকের এই কথার উত্তর দিবার নিমিত্ত ত্রস্ত হইল, তাহার হৃদয় মধ্যে ইহার সদুত্তরটী সত্বর কল্পিত হইল, কিন্তু মুখ

দিয়া আর বাহির হইল না,এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরটী জিহ্বায় খেলা করিতে লাগিল, তত্রাচ অর্দ্ধস্ফুট হইল না। সে বলিবার বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই বলিতে পারিল না। শেষ বালিকা নিরবে রহিল!

যদিও যুবকের বুঝিতে আর বাকি থাকিল না, যদিও যুবক দেখিল আপন হস্তস্থিত বালিকার হস্তটী কাঁপিতেছে, তার প্রতি বালিকা এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে, কোমল গণ্ডদ্বয়ের শিরাগুলি রক্তিমা ভাব ধারণ করিয়াছে, কচি কচি ঠোঁট দুখানি ঈষৎ বিস্ফারিত হইয়াছে, বালিকার বক্ষ হইতে তাড়িতাভা প্রকাশ পাইতেছে, তত্রাচ সে ইহা দেখিয়াও দেখিল না, বুঝিয়াও বুঝিল না, যুবক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি বল্লে না, কেন তুমি কাঁদ্চ?"

মধুমতী ভাবিয়া আর কিছুই পাইল না, শেষ উত্তর করিল,—"জানিনা।"

যুবকও কহিল,—"তেমনি ভেবো, আমিও জানিনা, আমি কেন কাঁদ্চি।"

বালিকা নিরবে থাকিয়া কিয়ৎক্ষণের পর জিজ্ঞাসা করিল,—"কাল তুমি আমার সঙ্গে কথা কইলে না কেন?"

যুবক। সে অনেক কথা।

মধুমতী। কি কথা?

যুবক। সে তুমি বুঝতে পার্ব্বে না।

মধুমতী। বুঝতে পারি আর নাই পারি, তুমি কেন বলই না?

যুবক। তোমার সঙ্গে কথা কয়ে আর কি হবে? তোমার

সঙ্গে চির কালত আর কথা কইতে পাবনা।

মধুমতী। কেন?

যুবক। এই জন্যেই বলেছিলুম, তুমি বুঝতে পার্ব্বে না।

বালিকা নিরব, বালিকা ভাবিয়া আকুল, সে যুবকের কথা বুঝিতে পারিল না, আর কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিতে সাহস হইল না।

যুবক বালিকার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাদের উভয়েরই যে এক দশা তাহা এক্ষণে জানিতে পারিয়াছে। তাই আজ সে বালিকাকে একথা বুঝাইয়া দিতে ইচ্ছা করিল না, তাই আজ সে যতদিন এবিষয়ে অজ্ঞ থাকে, ততদিনই তার মঙ্গল, ততদিনই তার পক্ষে সুখ। এই রূপ চিন্তা করিয়া যুবক ধীরে ধীরে কহিল, "মধুমতি! হাত ছেড়ে দাও, আমি নিচে যাই।"

এতক্ষণ মধুমতী যদিও এক হাতে যুবকের হাত ধরিয়াছিল, এবার দুই হাতে হাত ধরিল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিকটস্থ হইয়া আধোবদনে রহিল।

যুবক পুনরায় বলিল,—"মধুমতি আমায় ছেড়ে দাও।"

মধুমতী এবার আরও দৃঢ়রূপে যুবকের দক্ষিণ হস্তটী আপন বক্ষে চাপিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিল,—"তুমি আমার সঙ্গে কেন কথা কবেনা বল?"

যুবক যদিও ভাবিয়াছিল, এ বিষয়ে আর কোন কথা কহিবে না, বালিকাকে একথা বুঝাইয়া দিবে না, কিন্তু সে আর থাকিতে পারিলনা, বালিকার যত্নে, বালিকার আগ্রহে আর স্থির থাকিতে পারিল না।

যুবক মধুমতীকে কহিল,—"আজ বাদে কাল তোমার বিবাহ

হবে, বিবাহের পর আর তুমি আমার কাছে আস্‌তে পাবেনা, আর তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতে পাবে না। আমিও আর তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পাব না, আর তোমায় দেখ্‌তেও পাব না। তাই বল্‌ছি, দুদিনের জন্যে তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে কি হবে?

মধুমতী যদিও বালিকা, মধুমতী যদিও পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু এখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না। সে ভাবিতে ভাবিতে চিন্তার পরপ্রান্ত স্পর্শ করিয়া স্থির করিল, সত্যই ত যদি আর কাহার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়, তাহ'লে আমার দশা কি হবে? বালিকার চক্ষে জল আসিল, মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, আর স্থির থাকিতে পারিল না, যুবকের বিশালবক্ষে মস্তক সংরক্ষণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

যুবক দেখিল মধুমতী আমারি জন্যে কাঁদিতেছে আমারি তরে ব্যাকুলা। সেও আর থাকিতে পারিল না, মধুমতীর সঙ্গে সেও কাঁদিয়া ফেলিল। এইরূপে উভয়ে নিরবে রোদন করিতে লাগিল, উভয়েই ভাবিয়া আকুল; কি হবে, কি কর্ব্বে, কিসে উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়, কিসে উভয়ের বাসনা পূর্ণ হয়, উভয়েই এই চিন্তাতে মগ্ন। ক্ষণকাল পরে যুবক একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া চক্ষের জল মুছিয়া মধুমতীকে কহিল,—"মধুমতি! কেঁদনা যা কপালে আছে, তাই হবে।"

মধুমতী মস্তক উত্তোলন করিল। আহা! তার মুখখানি হিমানীর শিশিরসিক্তা কমলিনির ন্যায় মলিন ভাব ধারণ করিয়াছে, নয়নদ্বয় আরক্তিম বর্ণে জলে ভাসিতেছে, অক্ষিপল্লব হইতে অশ্রুবিন্দু বিন্দু বিন্দু করিয়া গণ্ড বহিয়া পড়িতেছে। যুবক

আর থাকিতে পারিল না, এদৃশ্য আর দেখিতে পারিল না, নিজ বস্ত্রাঞ্চলে মধুমতীর মুখ মুছাইতে মুছাইতে কহিল,—"মধুমতি! তুমি কেঁদনা, তুমি আমার জন্যে ভেবনা।"

বালিকা ক্ষণকাল অধোবদনে থাকিয়া উত্তর করিল,—"তবে কার জন্যে ভাবব?"

যুবক উত্তর করিল,—দুদিন পরেই জান্তে পার্ব্বে, হুগলির জমীদারদের বাড়ি তোমার বিবাহ হবে।"

বালিকার হৃদয় খুলিয়াছে, তাহার আর কোন কথাই আট-কাইতেছে না, সে কহিল,—"আমি তোমার জন্যে ভাবি, আর নাই ভাবি, কিন্তু তুমি কি আমায় ভুলে থাক্‌বে?"

যুবক উত্তর করিল,—"যদিও তুমি আমার হবেনা, তুমি অপরের হবে, তত্রাচ আমি তোমায় ভুলিতে পারিব না।"

মধুমতী। আমি আর কারও নই, আমি তোমারি।

যুবক। তুমি অপরের।

মধুমতী। আমি তোমার।

যুবক। তুমি পরাধীনা, তোমার ইচ্ছামত কিছুই হ'তে পারে না।

মধুমতী। তোমার ইচ্ছামত কাজ হ'তে পারেত?

যুবক। আমার ইচ্ছায় কি হ'তে পারে?

মধুমতী। কেন তুমি কি আমায় এখান থেকে নিয়ে যেতে পার্ব্বে না?

যুবক। কোথায়?

মধুমতী। কেন তোমাদের বাড়িতে?

ক্ষুদ্রপ্রাণা বালিকার এই অকিঞ্চিৎকর কথাটী শুনিয়া

যুবকের বিষাদমুখে হাঁসির উদয় হইল। যুবক হাস্যমুখে মধুমতীর চিবুক ধারণ করিয়া কহিল.—"মধুমতি! তুমি বালিকা, তোমার হৃদয়ে সমাজ-কলঙ্কের ভয় নাই, তুমি সমাজের রীতি নীতি জান না, তাই আজ এই কথা বলিতে তোমার হৃদয়ে সাহস হইয়াছে।

বালিকা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া অধোবদনে যুবকের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির মধ্যে আপন. কোমলাঙ্গুলি সংশ্লিষ্ট করিয়া নখে নখে ঘর্ষণ করিতে লাগিল। যুবকও একদৃষ্টে খচিত মুকুতার ন্যায় বালিকার নাসাগ্রস্থ স্বেদবিন্দুর প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। উভয়ে নিরব, উভয়েরই মুখে আর কথা নাই। বালিকার অপেক্ষা যুবকের লোকনিন্দা লজ্জা ভয় অধিকতর। যদিও যুবক মধুমতীর পরিচিত, যদিও সে মধুমতীর সঙ্গে পূর্ব্বে আরও কতদিন বিরলে কত কথা কহিয়াছে, যদিও সে একটী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার সহিত কথা কহিতেছে, তত্রাচ যুবকের সঙ্কোচ হইবার কারণ অনেক। মধুমতীর বয়সের প্রতি লক্ষ্য করিলে মধুমতীকে বালিকা বলিয়া বোধ হয়. কিন্তু তার আকার প্রকার গঠন প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করিলে তাকে একটী ষোড়শী ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। মধুমতী কৃষাঙ্গী নয়, তার নয়ন দুখানি ঈষৎ বঙ্কিমভাবে আকর্ণ বিস্তৃত থাকিয়া ভাসমান পদ্মপত্রের ন্যায় ঢল ঢল করিতেছে, মিলিত ভ্রূযুগল অর্দ্ধবর্ত্তুলভাবে নয়ন সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি করিতেছে, ললাটখানি নাতি ক্ষুদ্র, ঘন-কাদম্বিনী-সদৃশ মাথায় সুচিকণ কৃষ্ণ কেশগুলি পৃষ্ঠ ব্যাপিয়া ক্রমে শূক্ষ্মভাবে নিতম্বোপরি খেলা করিতেছে, নাসিকার অগ্রভাগটী সুচাল. রন্ধ্রদ্বয় ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুকুতা-

সদৃশ দন্তগুলি সমশ্রেণী এবং ভাতিবিশিষ্ট, ঠোঁট দুখানি পক্ক বিম্বসদৃশ লাল অথচ পাতলা; গণ্ডদ্বয়ের মধ্যভাগটী দুধ আল্‌তা সদৃশ ঈষৎ লাল, কিন্তু চাপা নয়, গণ্ডের উভয় পার্শ্বে অলকগুচ্ছ দুলিতেছে; মধমাকৃতি পাতলা কর্ণ দুখানির মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ ভেদ হইতেছে; গোলাল চিবুকের মধ্যভাগটী একটু বসিয়া গিয়াছে। মধুমতীর গলায় কণ্ঠ পরিদৃশ্য হয় না, বাহুদ্বয় সুগোল ও নধর, কর পৃষ্ঠে শিরার চিহ্ন নাই, অঙ্গুলি গুলি চম্পককলিসদৃশ, হেমবক্ষের পঞ্জর দৃশ্য দূরে থাক, নবোত্থিত কুচদ্বয় চতুস্পার্শ্ব হইতে মাংস টানিয়া ঈষৎ উন্নত হইয়াছে, এবং উদরবল্লীর আভাসে উদরের শোভা সম্পাদন করিতেছে, মধুমতীর কটী ক্ষীণ, নিতম্ব গুরুভার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু এখন নিম্নমুখী হয় নাই; সুগোল সুকোমল করি-শুণ্ডবৎ উরুদ্বয় সূক্ষ্ম বসন ভেদ করিয়া রামরম্ভা-সদৃশ ভাতি বিকাশ করিতেছে; পায়ের ও হাতের প্রত্যেক সন্ধিস্থল মাংসল, পদতল সমভাবে ধরাস্পর্শ করে; অঙ্গুলীগুলি পরস্পর সংলগ্ন। মধুমতীর চলন ধীর, দৃষ্টি অধঃ, কণ্ঠস্বর অমিয়জড়িত ও ঈষৎ ভঙ্গ। তাহার চলন, দৃষ্টি ও স্বরেতে বালিকার কোন লক্ষণ নাই।

যুবক মধুমতীর সঙ্গে কথা কহিতে পাছে কেহ আমাদের দেখিতে পায়, পাছে কেহ আমাদের এই কথা গুলি শুনিতে পায়, এই ভাবিয়া মধ্যে মধ্যে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, তাই রক্ষা। সে দেখিল অন্দরের ছাদের উপর তারাসুন্দরী দেবী কাপড় শুখাইতে দিতেছেন। যুবক আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, সে ত্রস্ত হইয়া মধুমতীকে কহিল,—"মধুমতী আর না, ওই দেখ ছাদে কে রয়েছেন, যাবার সময় দ্যাখা কর্ব্বো।"

এই বলিয়া যুবক আস্তে আস্তে সেস্থানে হইতে সরিয়া পড়িল। বালিকাও তারাসুন্দরীকে দেখিবা মাত্র চকিতভাবে ধীরে ধীরে পা টিপিয়া ছাদ হইতে অবতরণ করিল। কি আশ্চর্য্য, এই দু একদিনের মধ্যে ইহাদের ভাবের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এই দু একদিনের মধ্যে ইহাদের কত লজ্জা ও ভয় আসিয়াছে।

যুবক ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া বহির্ব্বাটীর একটী কক্ষে বসিয়া মনে মনে কত কথাই কথাই কহিতেছে, কত হাঁসিই হাঁসিতেছে, কত তর্ক বিতর্কই করিতেছে। মধুমতী আমায় ভাল বাসে, মধুমতী আমায় দেখিতে ইচ্ছা করে, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিতেছে না। কিন্তু পরক্ষণেই সে বিষাদনীরে মগ্ন হইতেছে, পরক্ষণেই সে ভাবিতেছে, মধু-মতী আমায় ভালবাসে, আমিও মধুমতীকে ভালবাসি। কিন্তু মধুমতীর সঙ্গেত আমার বিবাহের কোন সম্ভাবনা নাই। যুবক এই ভাবিতে ভাবিতে আপনার অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে মধুমতীও বহির্ব্বাটীর দালানে আসিয়া যুবকের প্রতি লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু নিকটে আসিতে তার লজ্জা হইতেছে। কারণ স্থানটী নির্জ্জন নয়, যদি কেহ দেখিতে পায়। এই ভাবিয়া মধুমতী দুএকটী কৃত্রিম শব্দ করিয়া যুবককে জানাই-তেছে যে আমি তোমার নিকটেই আছি। যুবকও মধ্যে মধ্যে পশ্চাৎ ফিরিয়া মধুমতীর তীর্যাকনয়নের কটাক্ষবাণটী সাদরে গ্রহণ করিতেছে ও মৃদু মৃদু হাঁসিতেছে। বিধাতা সুখের বৈরী, এমন সুখের সময়েও বিধাতা বাদ সাধিলেন। চন্দ্রবাবুর একটী ভৃত্য আসিয়া কহিল,—"বাবু কে একজন আপনাকে ডাক্‌চে।"

"আমায় ডাক্‌চে?" যুবক এই কথাটী বলিয়া উঠিয়া পড়িল,

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে নিচে আসিতে হইল।

যুবক নিচে আসিয়া দেখিল, তাহাদের গ্রামের একটী লোক আসিয়াছে। যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"জগা! কি মনে ক'রে রে?"

জগা উত্তর করিল,—"আজ্ঞা মাঠাকৃরুণের বড্ড ব্যারাম বেড়েছে, তাই এসেছি, আপনাকে শিগ্গির ক'রে যেতে হবে।"

যুবকের প্রাণ অস্থির হইল, যুবক আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। মধুমতীর সহিত দেখা করিবার অবসর পাইল না, বাড়ির ভিতর গিয়া শীঘ্র কাপড় ছাড়িয়া ফেলিল।

তারাসুন্দরী দেবী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন গা, কাপড় ছাড়লে কেন?"

যুবক উত্তর করিল,—"এক্ষণি আমি বাড়ি যাব, মার বড় অসুখ।"

তারাসুন্দরী চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে ব'ল্লে?"

যুবক। সেখান থেকে লোক এসেছে।

তারাসুন্দরী। কি ব্যারাম?

যুবক। আমিত দেখে এসেছিলুম তাঁর জ্বর।

তারাসুন্দরী। তাইত—তবে শীঘ্র যাও। জামাটা বুঝি মধুমতী কোথা রেখে দিয়েছে।

"জামা এখন থাক্" এই বলিয়া যুবক বহির্ব্বাটীতে আসিল, এবং ঊর্দ্ধদৃষ্টে একবার মধুমতীকে নিরীক্ষণ করিয়া,—"জগা তবে আয়রে তামাক খাওয়া এখন থাক্।" এই বলিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল।

মধুমতী উপর হইতে দেখিল, যুবক ব্যাকুলভাবে কোথায় চলিয়া গেল। মধুমতী অস্থির হইল, তার দারুণ সন্দেহ আসিল, সে নিচে আসিয়া রামাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"রামা কে ডাকছিল রে?"

রামা বলিল,—"ঐ মণিরামপুর থেকে একটা লোক এসেছিল।"

মধুমতীর আরও সন্দেহ হইল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেনরে?"

রামা উত্তর করিল, "কি জানি, বাবুর মার বুঝি অসুখ করেছে।"

মধুমতীর সন্দেহ ঘুচিল, সে এতক্ষণের পর বুঝিতে পারিল যে, এই জন্যেই যুবক এত ব্যাকুলভাবে চলিয়া গেল, এই জন্যই সে যাবার সময় আমার সহিত কথা কহিবার অবসর পায় নাই। বোধ হয় ব্যায়রাম শক্ত, আমার কাছ থেকে জামাটাও নিলেনা, শুদ্ধ গায়ে চলে গেল। মধুমতী এই ভাবিতে ভাবিতে বাটীর ভিতর গমন করিল।

তারাসুন্দরী দেবী মধুমতীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মধুমতি রামা কোথা?"

মধুমতী বলিল,—"কেন মা?"

তারাসুন্দরী দেবী বলিলেন,—"তাকে মণিরামপুরের খবর আন্‌তে পাঠাব।"

"খবর আন্‌তে পাঠাব" এই কথাটী প্রাণের কথার সঙ্গে মিশিয়া গেল, সে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে রামাকে ডেকে নিয়ে আস্‌ব মা?"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "হাঁ ডেকে নিয়ে এস।"

এ কাজে মধুমতীর আলস্য নাই, এ কার্য্য যত শীঘ্র সম্পন্ন হয়

ততই ভাল। সে অবিলম্বে রামাকে ডাকিয়া আনিল। রামা আসিয়া বলিল,—"ডাক্‌চো কেন গো?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"ওরে এখনি তোকে মণিরামপুরে যেতে হবে।"

রামা এ বাড়ির পুরাতন চাকর। রামার বয়স প্রায় পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন, ধর্ত্তে গেলে এক প্রকার সে সমস্ত বয়সটা এই বাড়িতে কাটাইয়াছে। চন্দ্রবাবুর কে কোথায় আত্মীয় কুটুম্ব আছে, কার কি নাম রামার অগোচর কিছুই নাই। রামা বলিল,—"সেই বাঁড়ুয্যেদের বাড়িতে বটে?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"হ্যাঁ—তুই শিগ্গির ছুটী খেয়ে নিগে।"

রামা বলিল,—"এবেলা আমি আর কিছু খাবনা।"

তারাসুন্দরী দেবী কহিলেন,—"তবে যা দিখিন খবরটা নিয়ে আয় দেখিন। মধুমতি! বিছানার নিচে একটা টাকা আছে ওকে দাওগেত। দ্যাখ্ নৌকায় যাস্।" এই বলিয়া এক হাঁড়ি পূর্ব্বদিনের লুচি সন্দেশ ও রসগোল্লা রামাকে দিয়া বলিলেন,— "এগুলো তাদের বাড়িতে দিস্।"

এদিকে মধুমতী টাকা ও যুবকের জামাটী আনিয়া বলিল,— "এই টাকা নে আর এই জামাটাও দিস্।"

রামা কোমরে গামছা বাধিয়া টাকা জামা ও খাবারের হাঁড়ি লইয়া প্রস্থান করিল। মধুমতী রামাকে আরও দুএকটী কথা বলিবার নিমিত্ত সঙ্গে সঙ্গে বহির্ব্বাটীর দরজা পর্য্যন্ত আসিল, কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিতে পারিল না। রামা চলিয়া গেল, মধু-মতী একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, ক্রমে ক্রমে রামা দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, মধুমতীও অধোবদনে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জমিদার বাটী।

বৈশাখ মাস, বেলা দ্বিপ্রহর, সূর্য্যদেব উগ্রমূর্ত্তিতে গগণ মধ্যস্থলে বসিয়া সহস্র করে ধরাশাসনে নিযুক্ত। বিহঙ্গমচয় প্রখর আতপতাপে আহার অন্বেষণে বিরত হইয়া বৃক্ষের পল্লব আগারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। চাতক দম্পতী গগণমার্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বৃক্ষের উচ্চশাখায় অবস্থান করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে ঊর্দ্ধমুখে "ফটিকজল ফটিকজল" করিয়া চিৎকার করিতেছে। নবাকিশলয়দল সূর্য্যকিরণে ঝলসিয়া গিয়াছে। তৃণজীবি গো মেষাদি দল বাঁধিয়া বৃক্ষছায়ায় অঙ্গ ঢালিয়াছে। পথিকেরা মধ্যাহ্নের প্রখর কিরণ ও উত্তপ্ত বালুকাকণা সহ্য করিতে না পারিয়া বিস্তৃত পাদপমূলে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে। আকাশের দিকে আর চাহিতে পারা যায় না। একেকালিন প্রায় সমস্তই নিরব। মধ্যে মধ্যে দক্ষিণানীল বহিতেছে সত্য, কিন্তু ইহাত সুখপ্রদ নয়, আজ ইহাকে বিষমিশ্রিত বলিয়া বোধ হইতেছে, আজ যেন সে তার প্রিয়সখা অনল সমভিব্যাহারে দিক্‌দিগন্তের দাহন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। তাই আজ কমলাকান্ত বাবুর তোষাখানার খড়খড়ি বন্ধ।

কমলাকান্ত বাবু বহুদিন হইতে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত, এক্ষণে এই ব্যায়রাম বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি একে গাত্রদাহে অস্থির, তাতে আজ আবার দারুণ উত্তাপ। উপরে টানাপাকা চলিতেছে, দুই পার্শে দুইজন বেহারা হাত পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে, তবু তাঁর শান্তি নাই, তবু তাঁর গায়ের জ্বালা থামিতেছে না। চন্দ্রবাবুও তাঁহার জনৈক আত্মীয় পার্শ্বে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন। চন্দ্রবাবু মধুমতীর বিবাহের একটা মীমাংসা করিবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন, কিন্তু কমলাকান্ত বাবুকে যন্ত্রণায় অস্থির দেখিয়া কোন কথাই বলিতে সাহস করিলেন না, বরঞ্চ কমলাকান্ত বাবুর দুএকটী পারিষদের সঙ্গে রোগ শান্তির উপায় নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। কমলাকান্ত বাবু একটু স্থির হইয়া বলিলেন—"চন্দ্রবাবু! আপনি ব্যস্ত হবেন না, আর আপনার কন্যার বিবাহের নিমিত্ত অন্য কোথাও চেষ্টা করিবেন না, আমি একটু আরোগ্য হলেই আমাদের উভয়ের আশা পূর্ণ হবে।"

কমলাকান্ত বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই চন্দ্রবাবু একটু বিনয় সহকারে বলিলেন,—"আপনিও তজ্জন্য উদ্বিগ্ন হবেন না, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনি শীঘ্র আরোগ্য লাভ করুন, আমি এতদিন চেষ্টা করিওনি, আর কোথাও কর্ব্বোও না।"

পারিষদের মধ্যে একজন বলিলেন,—"কমলাকান্ত বাবু! কন্যাটীকে কি দেখে এসেছেন?"

কমলাকান্ত বাবু বলিলেন,—"হ্যাঁ-আমি সেদিন একপ্রকার দেখেই এসেছি, মেয়েটী অতি সুশ্রী, অতি সুরূপা, ভবনাথের জন্যে অনেক জায়গা চেষ্টা করেছি, অনেক মেয়ে দেখে এসেছি,

কিন্তু এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোথাও দেখিনি, আর মেয়েটীও দেখলুম বড়, ভবনাথের সঙ্গে ঠিক মিলবে।"

পারিষদটী কহিল,—"তা আপনার কোন মেয়েই পসন্দ হচ্ছিল না বলেই ত ভবনাথের এতদিন বিবাহ হয়নি, নৈলে আপনার ছেলের বয়স তেইশ চব্বিশ বৎসর হ'ল এখন বিবাহ হয় না?"

কমলাকান্ত একটু হাঁসিয়া বলিলেন,—"তা ভাই আমার একটী ছেলে, বাড়ির মধ্যে একটী বউ নিয়ে আস্‌ব, তাও যদি মনের মতন না হ'ল তবে আর কি হবে?"

পারিষদমণ্ডলী অমনি ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে "তাত বটেই, তাত ঠিক, এ কথা আর একবার করে বোল্‌তে" ইত্যাদি নানাপ্রকার তোষামোদের পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে একটী যুবক ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কমলাকান্ত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয় এখন আপনি কেমন আছেন?"

কমলাকান্ত বাবু যুবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"অটল এসেছ? এস বাবা! এই এদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় একটু আছি ভাল।"

অটলবিহারী আস্তে আস্তে একপার্শ্বে উপবেশন করিল।

অটলবিহারি ভবনাথের প্রিয়সঙ্গি এবং কুপথের পথ-প্রদর্শক। চন্দ্র বাবু যে এসেছেন, ভবনাথ ও তাহার সমবয়স্কেরা অনেকক্ষণ জানিতে পারিয়াছে। তাহারা বিবাহ সম্বন্ধে নানা-প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। ভবনাথের বিবাহ হ'লে পর একদিন খুব আমোদ হবে, মৎস্য মাংসের শ্রাদ্ধ হবে, কলিকাতার

নামজাদা নাচওয়ালিদের নিয়ে আসা হবে। ভবনাথ অল্প বয়স হ'তেই এ সব রসে রসজ্ঞ হইয়াছে। ভবনাথের পক্ষে হুগলীর কলেজ কিছুই নয়, তাই সে কলিকাতায় বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র হইয়াছে। বহুবাজারে বাড়িভাড়া করা হইয়াছে, দুই বেলা গাড়ি ক'রে বিদ্যালয়েও যাওয়া আসা আছে, কিন্তু সরস্বতীর সঙ্গে চির বিবাদ। অটলবিহারীর অটল বুদ্ধিবলে ভবনাথ কোন রজনীই রমণীরত্নবিহীনা শয্যায় শয়ন করে না। প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিলে ভবনাথের এই সমস্ত চরিত্র দোষ নিবন্ধন কমলাকান্ত বাবু একজন ধনশালী জমীদার হইয়াও কোন সমকক্ষের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে পারেন নাই, এ নিমিত্ত তাঁর মনকষ্টও যথেষ্ট। যাহা হউক, ভবনাথের বয়স্কেরা নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের কথা কহিতেছিল বটে, কিন্তু ভবনাথের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। ভবনাথ পিতৃ ঐশ্বর্য্য বলে অনেক সুন্দরী নারীর মুখ দর্শন করিয়াছে, যদিও সে কলিকাতার হাবভাবময়ী বারবিলাসিনীদিগের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে, কিন্তু তত্রাচ সে যেদিন মধুমতীর রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়াছে, সেই দিন হ'তেই তার প্রাণ চঞ্চল, সেই দিন হ'তেই সে আত্মহারা, সেই দিন হ'তেই সে মধুমতী লাভের কল্পনা করিতেছে। ভবনাথ বয়স্কদের কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া অটলবিহারীকে কহিল,—"অটল দ্যাখনাহে! ওরা কি রকম স্থির ক'চ্চে একবার দেখেই এস না। বে না হ'লেত আর কোন আমোদ হচ্চে না? যাতে শিগ্গির শিগ্গির মেটে তারচেষ্টা কর।"

অটল বিহারী ভবনাথের কথামত তাই ধীরে ধীরে কমলাকান্তের নিকটে আসিয়া বসিল।

কমলাকান্ত বাবু চন্দ্রবাবুকে বলিলেন,—"দেখুন বৈশাখ মাসের এ কটা দিন আর কিছুই হচ্চে না।"

অমনি জনৈক পারিষদ কহিল,—"তা হলে সেই আষাঢ় মাসে, কেননা জ্যৈষ্ঠ মাসে ত আর ভবনাথের বিবাহ দিতে পাচ্চেন না?"

কমলাকান্ত বাবু কহিলেন,—"জ্যৈষ্ঠ মাসে আর কি করে হ'তে পারে, তখন সেই আষাঢ় মাসে যাহয় একটা করা যাবে। আপনি মাঝে এই একটা মাস অপেক্ষা করুন, কি বলেন?"

চন্দ্রবাবুর আত্মীয়টী বলিলেন,—"তাতে আর আপত্য কি? এ সমস্ত হ'ল আমোদের কাজ, মনের অসুখ থাকলে কিছুই ভাল লাগে না, আপনি আগে একটু সুস্থ হ'ন।"

কথায় কথায় এদিকে বেলা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, সূর্য্যদেব পশ্চিম সীমা নিরীক্ষণ করিতেছেন, রৌদ্রের আর তেজ নাই, সুশীতল দক্ষিণ বাতাস ঝুর ঝুর শব্দে বৃক্ষপত্র কাঁপাইয়া মৃদু মৃদু বহিতেছে। কমলাকান্ত বাবুর তোষাখানার খড়খড়িগুলি খুলিয়া দেওয়া হইল। চন্দ্রবাবু দিবা অবসান দেখিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। কমলাকান্ত বাবু নানাবিধ ফল মূল ও মিষ্টান্ন আনাইয়া চন্দ্রবাবু ও তাঁর আত্মীয়টীকে বিশেষ যত্নে ও অনুরোধে কিঞ্চিত জলযোগ করাইয়া সম্মান রক্ষা করিলেন। ক্ষণেক কথাবার্ত্তার পর চন্দ্রবাবু ও তাঁর আত্মীয়টী বিদায় লইয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

অটলবিহারীও বাবুদের আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া ভবনাথের গৃহাভিমুখে গমন করিল। ভবনাথ মধুমতীর প্রেমাকাঙ্খায় উন্মত্ত। সে ভাবিতেছে মধুমতীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে,

কিসে মধুমতীকে সুখী করিবে। সে বারবিলাসিনীদের নানা-প্রকার সাজ সজ্জা দেখিয়াছে; সে তার মধ্যে একটা স্থির করিতেছে, যে, কোন্ সাজে মধুমতীর সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হবে, কিরূপ ভাবে মধুমতীকে কাপড় প’রাবে। সে হিন্দুস্থানি রমণীদের বস্ত্র পরিধান প্রণালীর শতমুখে প্রশংসা করে, তাই এক একবার ভাবিতেছে যে, হিন্দুস্থানী-রমণীদের মতন কাপড় পরালে হয়। যাহা হউক এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে একখানি শ্রীরামপুরের পাঁজি লইয়া দিন দেখিতে লাগিল। অটলবিহারী গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ভবনাথ ভিন্ন ঘরে আর কেহই নাই। ভবনাথ পাঁজি খুলিয়া বসিয়া আছে, অটল আর হাঁসি চাপিতে পারিল না। ভবনাথ অটলকে হাঁসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁসচ কেন হে? খবর কি?"

অটল। ভাল মন্দ দু’য়ে মিশান।

ভবনাথ। সে কি রকম?

অটল। আষাঢ় মাসে।

ভবনাথ। কেন?

অটল। তোমার বাপের যে অসুখ।

ভবনাথ বিরক্তির সহিত কহিল,—"বাবার এমন কি অসুখ ক’রেছে যে এমাসে বিবাহ হ’তে পারে না?"

অটল কহিল,—"জান না? সেই রোগ।"

ভবনাথ বেহারাকে এক ছিলিম তামাকু আনিতে বলিয়া কহিল,—"আচ্ছা তাই ভাল, বাবার যেন এই দুদিন একটু অসুখ বেড়েছে, তা জ্যৈষ্ঠ মাসে হ’ল না কেন? জ্যৈষ্ঠ মাসটা কি ঘুন ধরা?"

অটল হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল,—"তা প্রায় সেই রকমই বটে, তুমি যে তোমার বাপের বড় ছেলে।"

বেহারা তামাকু দিয়া প্রস্থান করিল। ভবনাথ তামাক টানিতে টানিতে অটলবিহারীকে কহিল,—"দ্যাখ অটল! বাবার কিন্তু একতিল বুদ্ধি নেই; মেয়েটা যে রকম বড় হ'য়েচে, তাতে কি তারা এতদিন অপেক্ষা ক'র্বে? এই দ্যাখনা, সব ফোস্কে যায়। আর ধর,—বাবার ও ব্যায়রাম হ'ল সঙ্গের সাথি, কখন বাড়্বে, কখন কোম্বে, তবে বল আমার আর বিবাহ হবে না! কেমন?"

অটলবিহারি একটু গম্ভীরস্বরে কহিল,—"আমায় আর বোঝাচ্চ কি? বুঝতে না পাল্লে আমি আর বাড়ি ঘর দোর সব ছেড়ে তোমার এখানে এসে প'ড়ে আছি! কোথা থেকে এম্নি একটার সঙ্গে বে দিলে যে,—নাজানে সেটা বোস্‌তে, নাজানে দাঁড়াতে, নাজানে কথা কইতে। রাত্রি এগারটার কম ঘরে আস্‌বে না, সমস্তদিন রান্না ঘরে। যদিও দিনের বেলায় মুড়ি শুড়ি দিয়ে এক আধ বার পান কি জল দিতে আসে, তা একটী কথা শুন্‌তে পাবার যো নেই। বড্ড যদি পেড়াপিড়ী ক'ল্লুম, তা ঐ ভাঙ্গা কাঁসির মতন দুএকটা বোদা আওয়াজ শুনিয়েই সটান দেয়। আমার ভাই ধিক্কার জন্মে গেছে, তার চেয়ে নগদা প্রেম ভাল, খোলা প্রাণে দুটো কথা ক'ইতে পাই। তা ভাই কি ক'র্ব্বে এই একটা নাস চোখ কাণ বুঝিয়ে চুপ ক'রে থাক।"

পিতার এবম্বিধ ব্যবহারে ভবনাথের রাগ হইয়াছে, আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না, সে অটল বিহারীকে কহিল,—"অটল! চল বাগানে যাওয়া যাগ, বাবার জালায় এখানেত আর কিছুই হবার যো নেই।"

অটলবিহারী অমনি হাসিতে হাসিতে কহিল,—"আমিও ত তাই ব'ল্‌ছি, এই মাসটা একটু আমোদ আহ্লাদে কাটিয়ে দাও।

অটল এসব কাজে খুব তৎপর, সে আর অপেক্ষা করিল না, অন্যান্য ইয়ার মণ্ডলীদের এই শুভ সংবাদ প্রদান করিতে গমন করিল। ভবনাথও ভাবিতে ভাবিতে বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য কক্ষান্তরে গমন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রণয় পত্র।

চন্দ্রবাবুর বাটীতে আসিতে অনেক রাত্রি হইয়াছে, তাই আজ তিনি স্ত্রী কিম্বা মাতার সহিত বিবাহ সম্বন্ধীয় কোন কথা বার্ত্তা না কহিয়া আহারান্তে নিদ্রা গেলেন। পরদিন চন্দ্রবাবু আহার করিতে বসিয়াছেন, তারাসুন্দরী দেবী পুত্রটীকে কোলে লইয়া অর্দ্ধাবৃত বক্ষে স্তনপান করাইতেছেন। চন্দ্রবাবুর মাতা সম্মুখে দাঁড়াইয়া পুত্রের আহার পর্য্যালোচন করিতেছেন। মধুমতী দালানের একপার্শ্বে বসিয়া তাম্বুল প্রস্তুত করিতেছে। চন্দ্রবাবু আহার করিতে করিতে বলিলেন,—"কাল আমি হুগলী গেছলুম, কমলাকান্ত বাবু বিবাহের এক প্রকার স্থির ক'রেছেন, আষাঢ় মাসে হ'বে। হুগলীতে বিবাহের কথা বলাতে চন্দ্রবাবুর মাতা ক্ষুণ্ণভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। তারাসুন্দরীর মুখ বিষণ্ণ হইল, মধুমতীর চক্ষুদুটি জলপূর্ণ হইল।

তারাসুন্দরী বলিলেন,—"হুগলীতে বিবাহ দেওয়া হবে না, তা তুমি যাই বল আর যাই কর।"

চন্দ্রবাবু বলিলেন,—"তোমরা যে কি ভেবেছ, তা কিছুই বুঝতে পারি না, সে বাড়িতে কুটুম্বিতা কর্ব্বার জন্যে লোকে প্রার্থনা করে।"

চন্দ্রবাবুর মাতা বলিলেন,—"আমারত বাপু এক তিল ইচ্ছে নেই, টাকা থাক্‌লে কি হবে ? সে ছেলের সঙ্গে বে দেওয়াও যা, আর হাত পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেওয়া তা, তার চেয়ে আমাদের ধীরেনের সঙ্গে দেওয়া ভাল।"

চন্দ্রবাবু বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য ! তোমাদের সেই এক কথা ! শুধু ছেলে ভাল দেখলে কি হবে ? টাকা থাকা চাই, বিষয় থাকা চাই। উপেন বাড়ুয্যের কি আছে ? কি দেখে তার ছেলের সঙ্গে বে দিই ?"

মধুমতীর চক্ষে আর জল ধরিল না, সে দেখিল হুগলীতে পিতার সম্পূর্ণ ইচ্ছা। তার চক্ষু হইতে বারিবিন্দু নিপতিত হইয়া তাম্বুল গাত্রে প্রলেপিত চূণ ধুইয়া গেল। মধুমতী সর্ব্ব সমক্ষে হস্ত দ্বারা চক্ষুমার্জ্জন করিতে পারিল না সত্য, কিন্তু সে অধিকতর মস্তক অবনত করিয়া কোমল জানু সাহায্যে চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। ক্ষণকাল পরে চন্দ্রবাবু কহিলেন,—"তোমরা যাই ভাব, আর যাই বল, আমি কিন্তু হুগলীতেই বিবাহ দেব।"

"যা ভাল বোঝ, তাই কর, আমি আর কি বোলব" এই বলিয়া চন্দ্রবাবুর মাতা রন্ধনশালায় গমন করিলেন।

পিতার স্থির প্রতিজ্ঞা শুনিয়া মধুমতীর হৃদয় কাঁদিল, চঞ্চল প্রাণে একটীও পান সুচারুরূপে সজ্জিত করিতে পারিল না, সমস্তই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। মধুমতীর চিত্তচাঞ্চল্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তার উচিত এ স্থান হইতে প্রস্থান করা, কি জানি যদি কেহ তার মনের ভাব বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে দারুণ লজ্জায় পড়িবে। কিন্তু সে এ স্থান হইতে উঠিল না।

বালিকা কোনরূপে আত্মসংযম করিয়া শুপারি কাটিতে কাটিতে একচিত্তে এই বিবাহ সম্বন্ধীয় মতামতের কথা শুনিতে লাগিল: মধুমতি! তুমি তোমার মনের ভাব গোপন কর্ব্বার জন্য যতই কেন চেষ্টা কর না, নয়নবারি বিমোচনের জন্য যতই কেন ছলনা কর না, কিন্তু তোমার বিমাতা তারাসুন্দরী যে সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি যে অনেক দিন এ বিষয় অবগত আছেন। যে দিন তোমরা বহির্ব্বাটীর ছাদের উপর বিষাদের অভিনয় কর, সেই দিন থেকেই যে তিনি তোমাদের উভয়ের পরিণয় বন্ধনের নিমিত্ত অস্থির হ'য়েছেন। যুবক তোমায় ভাল বাসে, তুমিও তাকে ভিন্ন আর জান না, তাও যে তিনি কাল বৈকালে তোমাকে এক খানি ক্ষুদ্র পত্রিকা হস্তে কাঁদিতে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন। তুমি তোমার প্রণয় পত্রিকা খানি এক খানি ছবির অন্তরালে রাখিয়া মনে করিয়াছিলে যে কেহ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তারাসুন্দরীর লক্ষ্য যে সর্ব্বস্থানেই, তিনি যে সে পত্রখানির আদ্যোপান্ত পড়িয়াছেন। আজ তোমার চোখের জল সকলেরই অগোচর হইল বটে, কিন্তু তারাসুন্দরীর বঙ্কিম দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে পারে নাই। তিনি তোমার বিমাতা সত্য, কিন্তু তিনি ত তোমার স্বপত্নী তনয়া বলে একবার ভাবেন না। তোমার সহিত তাঁর যদি প্রণয় প্রসঙ্গের ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে তিনি তোমায় কখনই কাঁদিতে দিতেন না, তা হ'লে তিনি তোমার চোখের জল মুছাইয়া দিতেন। তিনি যে তোমার দুঃখে কাতরা, তিনি যে তোমার তরে ব্যাকুলা, তাই তিনি পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়াও ধীরেনের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে অনুরোধ করেন। তাই তিনি আজও বলিলেন,—"আচ্ছা

আমি আমার মেয়েকে নিয়ে এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি, দেখি তুমি কি করে হুগলীতে বিবাহ দাও।"

চন্দ্রবাবুর আহার করা শেষ হইল, তিনি আজ একটু ব্যস্ত আছেন, তাই তিনি আচমনান্তে বেশ ভূষা করিয়া তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে গঙ্গাভিমুখে গমন করিলেন।

ক্রমে ক্রমে বেলা এগারটা বাজিল। মধুমতী, মধুমতীর বিমাতা ও পিতামহী সকলেই, আহার করিতে বসিয়াছেন। তারাসুন্দরী চন্দ্রবাবুর মাতাকে বলিলেন,—"দেখ মা, উনি রাগ ই করুন আর যাই করুন, আমি কিন্তু ধীরেনের সঙ্গে বে দেব।"

মধুমতীর প্রাণে একটু হাঁসি আসিল, মধুমতী মধ্যে মধ্যে বিমাতার বাক্য শুনিয়া কথঞ্চিৎ স্থির হয়, কিন্তু পিতার ইচ্ছা বিরুদ্ধ কাজ কিরূপে হইবে এই চিন্তাতেই আকুল হইয়া পড়ে। মধুমতীর খাওয়া হইয়াছে, সে দেখিল ঠাকুরমার কি মাতার খাইয়া উঠিতে অনেক বিলম্ব, সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘাট হইতে হাত মুখ ধুইয়া আসিল। পান আর সাজিতে হইবে না, আজ সে একেবারে সকলের জন্যই পান সাজিয়াছিল। মধুমতী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুরাঙ্গুলির সাহায্যে একটী পান লইয়া বদন কমলে অর্পণ করিল, তাম্বুল কুমারী বালিকার দন্তপীড়নে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও কণ্ঠের নিম্নে বা মুখের বাহির হইতে ইচ্ছা করিতেছে না। সে ক্ষুদ্র রসনাটীর উপর খেলা করিতে লাগিল। আমোদপ্রিয়া আমোদিনীর রস-তরঙ্গ ছুটিয়া কচি কচি ঠোঁট দু খানির উপর নাচিতে লাগিল, ঠোঁট দু খানি অধিকতর রক্তবর্ণ হইল। মধুমতী একখানি দর্পণ সাহায্যে দেখিল যে, তার ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে তাম্বুল রস গড়াইবার

উপক্রম হইয়াছে। অমনি বালিকা করপৃষ্ঠ দ্বারায় মুছিয়া পুনরায় দর্পণ প্রতি নিরীক্ষণ করিল। কিন্তু, একি! মধুমতী এবার দর্পণ প্রতি চাহিয়া হাঁসিল কেন? পাঠক! একবার মধুমতীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখুন, ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে গণ্ডস্থল পর্য্যন্ত একটী লোহিত রেখা পড়িয়া মুখ ছবির কেমন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। মধুমতী এই নিমিত্তই হাঁসিতে ছিল। সে তার বস্ত্রাঞ্চল দিয়া রেখাটীকে মুছিয়া ফেলিল। মধুমতী দর্পণ রাখিয়া ভাবিল, এখন আর কেহই এ ঘরে আসিবে না, এই অবসরে একবার পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করি। এই ভাবিয়া ধীরে ধীরে ছবির পার্শ্ব হইতে পত্রখানি বাহির করিল। বালিকা যদিও অনেক বার পত্রখানি পড়িয়াছে, কিন্তু সে পরিতৃপ্ত হইতেছে না, তার ইচ্ছা যে সে অহোরাত্র এই পত্রিকা খানির উপর নয়ন সংশ্লিষ্ট করিয়া থাকে। মধুমতী পত্রোন্মোচন করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

পত্র।

কল্যানীয়া শ্রীমতি মধুমতী দেবী।

মধুমতি! তোমাকে মধুমতী ব্যতীত এক্ষণে অন্য কোন প্রণয়সূচক শব্দে সম্বোধন করিবার অধিকার নাই, তজ্জন্য আমি যেন তোমার অন্তর হ'তে অন্তরিত না হ'ই। আমি তোমাদের বাটী হইতে আসিবার সময় অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম, একারণ তোমার সহিত দেখা করিবার অবসর পাই নাই। আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল, যে, আসিবার সময় তোমায় গুটীকতক কথা বলিয়া আসিব, কিন্তু আমার মনের আশা মনেই রহিল, মার পীড়ার সংবাদ হ'তেই আমি সে আশা পূর্ণ করিতে পারি

নাই। এক্ষণে তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন; তোমায় অধিক কিছু বলিবার কথা নাই, এই বলি যে আমার পিতা বর্ত্তমান থাকিতেও আমি বিবাহ কার্য্যে স্বাধীন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে, যদি তোমাকে বিবাহ ক'র্ত্তে পারি ত বিবাহ ক'র্ব্বো, নচেৎ এ হৃদয়ে আর কেহ স্থান পাইবে না, আর কাহাকেও ভাল বাসিব না, আর কোন রমণীর প্রতি ফিরিয়াও চাহিব না। কিন্তু, তুমি তা পার্ব্বে না, তুমি সমাজ অধীনা নারীজাতি, তোমাকে বিবাহ ক'র্ত্তেই হবে। তাই বলি যার সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে, তাকে তুমি ভালবেস, তাকে তুমি ভক্তি ক'র তাকে তুমি যত্ন ক'র। সে তোমার পরম গুরু, ভুলেও কখন তাকে অশ্রদ্ধা ক'রোনা। তবে আমায় যদি মনে রাখ, সেটা আমার অদৃষ্ট। কিন্তু আমি তোমায় ভুলব না, বোধ হয় এজীবনে ও ভুলিতে পারিব না। তত্রাচ তোমায় বলি, তুমি আমায় ভুলে যেও, আমার জন্যে ভেবনা, আমার জন্যে অস্থির হ'ওনা। কি করিবে বল? সকলই অদৃষ্টের লিপী। আজ যদি আমার পিতা ধনশালী হইতেন, তা হ'লে আজ আমরা উভয়ে সুখী হ'তুম, তা হ'লে আজ আমি তোমাকে হৃদয়ে ধারণ ক'রে অমিয় উচ্ছ্বাসে ভেসে যেতুম। কিন্তু ঈশ্বর আমার অদৃষ্টে সে সুখ লেখেননি। আমার হৃদয় অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে, নয়ন চকোর তোমায় বদন চন্দ্রিমা সন্দর্শনে লোলুপ, এ নিমিত্ত ভাবিয়াছি, বিবাহের পূর্ব্বে একবার তোমার সহিত দ্যাখা করিয়া আসিব। তাই তোমায় লিখিতেছি যে, তুমি আমার সঙ্গে কথা কও আর নাই কও, আপনার ভেবে একবার আমায় দ্যাখ্যা দিও। অধিক আর লিখিতে পারিলাম না। পার যদি কোন

সুযোগে তোমাদের কুশল সংবাদ লিখিও, তবু তোমার স্বকর নিসৃত অমিয় পত্রখানি হৃদয়ে ধারণ করিয়াও সুখী হব। আমি প্রাণে বেঁচে আছি, তোমরা কে কেমন আছ?

মণিরামপুর } মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
১৫ বৈশাখ। } শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মধুমতী পত্র পাঠ করিতে করিতে কাঁদিয়া অস্থির। নয়ন জলে তার বক্ষ প্লাবিত হইতে লাগিল। পত্রখানি সে পুনরায় পড়িতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু আর সে পড়িতে পারিল না, জল পূর্ণ নয়নে আর সে পত্রের কিছুই দেখিতে পাইল না। বালিকার নয়ন জল বিন্দু বিন্দু করিয়া পত্রের উপর পড়াতে, অক্ষর গুলি যেন বালিকার রোদনে হৃদয় দ্রবীভূত করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল পরাণে অকুল পাথারে ভাসিতে লাগিল। মধুমতী নিরবে রোদন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল,—"আহা! সে আমার জন্যে কত অস্থির হয়েছে, সে আমার জন্যে কতই কাঁদ্‌চে, নিজে কেঁদেও আমায় কাঁদ্‌তে বারণ ক'চ্চে, নিজে অস্থির হ'য়েও আমাকে অস্থির হ'তে নিবারণ ক'চ্চে। তবে আমি কেন আর অপেক্ষা করি, আমিও তাকে পত্র লিখি। আজই রামাকে দিয়ে পত্র পাঠিয়ে দিই।" এই ভাবিয়া মধুমতী পিতৃকক্ষ হইতে কাগজ কলম আনিয়া পত্র লিখিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় চন্দ্রবাবুর পুত্রটীয় নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে কাঁদিয়া উঠিল।

নিম্নতল হইতে তারাসুন্দরী বলিলেন,—"মধুমতী! নিচে এসে খোকাকে কোলে তুলে নাও। অগত্যা মধুমতী পত্রখানি যথা-

স্থানে পুনঃ স্থাপিত করিয়া নিম্নে অবতরণ করিল এবং শিশুটিকে কোলে লইয়া আদর করিতে লাগিল। তারাসুন্দরী ভোজন পাত্র হস্তে মধুমতীর নিকট দাঁড়াইয়া দেখিলেন,—মধুমতীর চক্ষু লাল রহিয়াছে, মধুমতী নিশ্চয় এতক্ষণ কাঁদিতেছিল, তার চক্ষু ফুলিয়া রহিয়াছে। তারাসুন্দরী কন্যার ভাবান্তর দেখিয়া কন্যাকে আহোরাত্র কাঁদিতে দেখিয়া অস্থির হইলেন, তিনি ভাবিলেন যে, যে কোন প্রকারেই হউক ধীরেনের সঙ্গে মধুমতীর বিবাহ দিতে হইবে। এই ভাবিতে ভাবিতে তিনি পুষ্করিণীতে গমন করিলেন।

ক্ষণকাল পরে তারাসুন্দরী পুষ্করিণী হইতে আসিয়া মধুমতীর নিকট একটী পান চাহিলেন, মধুমতী তাড়াতাড়ি একটি পান আনিয়া দিল। তারাসুন্দরীও গালে ফেলিয়া দিলেন, কিন্তু তিনি তাম্বুল আস্বাদনের বিভিন্ন দেখিয়া বলিলেন,—"হ্যামা! পানে কি খয়ের দাওনি?"

"দিইনি? তবে বোধ হয় ভুলে গেছি" এই বলিয়া মধুমতী এক টুক্‌রা খয়ের আনিয়া তারাসুন্দরীর হস্তে প্রদান করিল।

তারাসুন্দরী পান খাইতে খাইতে রামাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"দ্যাখ রামা! আজ আর নয়, কাল সকাল বেলা একবার মণিরামপুরের খবর নিয়ে আসিস্ ত। আর ধীরেনকে বলিস্ যে তুমি তাড়াতাড়ি চলে এলে দু দিন থাক্‌তেও পেলেনা, তাই মা তোমাকে যেতে ব'লেছে। ব'লবি যে এখন তোমার স্কুলের ছুটি আছে এই সময় বেড়িয়ে এস।"

"আজ আর নয়ত গো; কাল যাব তার আর কি" এই বলিয়া রামা নিজ কার্য্যে গমন করিল। মধুমতী ধীরেন্দ্রকে পত্র লিখিবার

অবসর দেখিতে লাগিল, তাঁহার সুবিধা হইয়াছে, রামার হাত দিয়ে চুপি চুপি পত্র পাঠাইয়া দিবে। তারাসুন্দরী মধুমতীর কোল হইতে পুত্রটীকে লইয়া স্তনপান করাইতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আশার অর্দ্ধেক ফল।

আজ চারিদিবস অতিত হইল, রামা মনিরামপুরে আসিয়াছিল। ধীরেন্দ্রনাথ রামার নিকট হইতে প্রণয়িণীর প্রণয় পত্র খানি পাইয়া মহা আনন্দিত। আজ সে মধুমতীর করলিপীখানি হৃদয়ে ধারণ করিয়া মধুমতী লাভের গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। ধীরেন্দ্র নাথের বয়স ঊনবিংশ বৎসর, বর্ণ উজ্জ্বল ও হরিদ্রার ন্যায়, সবলকায়, গঠন প্রণালী অতি পরিস্কার। ধীরেন্দ্রের পিতার নাম উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। উপেন বাবু হুগলীর বিচারালয়ের একজন সামান্য মোক্তার। তিনি মোক্তারী কার্য্যে যা দশটাকা উপার্জ্জন করেন, তাতে এক প্রকার স্বচ্ছলে দিনপাত হয়। উপেন বাবু যত্নের সহিত পুত্রটীকে লেখা পড়া শিখাইতেছেন। ধীরেন্দ্রনাথও পিতার অজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া অহোরাত্র পুস্তকের উপর মন নিবিষ্ট করিয়া থাকে। কিন্তু কয়েক দিবস হইল, তাহার চিত্তের চাঞ্চল্য ঘটিয়াছে। যেদিন হইতে সে মধুমতীর উপর আসক্ত হইয়াছে, যেদিন হইতে সে মধুমতীকে হৃদয়ে ধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, যেদিন মধুমতী তাকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে তাহার আর কিছুই ভাল লাগিতেছে না, সেইদিন হইতে সে পুস্তক খুলিয়া বসিয়া থাকে

সত্য, কিন্তু মনস্থির করিতে পারে না, সময়ে সময়ে তার নয়ন-জলে পুস্তক ভাসিয়া যায়। আজও সে পড়িবার নিমিত্ত মহা আড়ম্বরে বসিয়াছে, কিন্তু পুস্তকের দিকে লক্ষ্য নাই, কেবল ক্ষুদ্র প্রণয় পত্রিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্পষ্ট অক্ষর গুলির উপর নয়ন নিবিষ্ট করিয়া আছে আর মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। ধীরেন্দ্রনাথ আপনার হৃদয়কে অনেক প্রকারে প্রবোধ দিয়া ভাবিল,—মধুমতীর বিষয় আমার চিন্তা করা অন্যায়, মধুমতী অমূল্যরত্ন, ভাগ্যবানের হৃদয়ে শোভা পাইবে, তজ্জন্য আমি কেন এত অস্থির হইতেছি? আমি যেরূপ অবস্থার লোক সেইরূপই থাকিব, মধুমতীর বিষয় আর ভাবিব না। মনে করিয়াছিলাম আজি ভদ্রেশ্বরে যাইব, একবার আমার প্রনয়িণীর সঁহিত ছ্যাখা করিয়া আসিব। না—তাত হবেনা, ভদ্রেশ্বরে যাওয়া হবেনা, আর তাকে ছ্যাখবার ইচ্ছা করিব না, আমার উচিত মধুমতীর এই পত্রখানিকে এখনি রূপান্তর করা। এই ভাবিয়া ধীরেন্দ্র-নাথ মধুমতীর পত্র খানিকে ছিন্ন ভিন্ন করিবার উদ্যোগ করিল সত্য, কিন্তু সে পারিল না, তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, পত্র খানি পুনরাবৃত্তি করিতে তার ইচ্ছা হইল। সে ভাবিল যদি ছিঁড়িয়া ফেলি, তাহ'লেত আর পড়িতে পাবনা, তবে একবার শেষ পড়া পড়িয়া লই। ধীরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে পত্র খানি পড়িতে আরম্ভ করিল।—

পত্র।

প্রাণের ধীরেন! আমার হৃদয় স্বামী! তুমি আমায় যতই কেন তাচ্ছল্য করনা, তুমি আমায় যতই কেন প্রবোধ দাওনা,

আমা হ'তে যতই কেন অন্তরে থাকনা; কিন্তু আমি তোমায় ভুলিতে পারিব না, আমি তোমায় হৃদয় স্বামী ব্যতীত আর কিছুই জানিনা, আমি তোমায় প্রাণেশ্বর বলিতে কুণ্ঠিত হ'ব না। পিতার ইচ্ছা অন্য কাহার সঙ্গে আমার বিবাহ দেবেন, তা দেবেন দিন। জীবন মরণ আমার সবই সমান, তার জন্য আমি ভাবিনা। ভাবি স্বধু তোমার জন্যে। আমায় ছেড়ে তুমি কি ক'রে থাক্‌বে? তুমি আমার জন্যে যে কিরূপ অস্থির হইয়াছ তা তোমার পত্র দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি আমায় কাঁদিতে বারণ করিয়াছ, কিন্তু কেউ আমার কান্না থামাতে পার্কেনা, কেউ আমার চোখের জল মুছাতে পার্কেনা। আমি আপনার কান্না আপনিই থামাব, আপনার চোখের জল আপনিই মুছিব। পিতার ইচ্ছামত কাজ পিতা ক'র্কেন আমার ইচ্ছামত কাজ আমি ক'র্কো। আমি প্রাণের আশা ছেড়ে দিইছি, প্রাণের মমতা আর ক'র্কোনা। তোমায় মিনতি করি যে যদি তুমি আমায় ভালবাস, তা হ'লে একবার আমায় দ্যাখা দিও, তোমায় গুটিকতক কথা বল্‌বো। আমার ভিক্ষা তুমি আমায় ভুলে যেও, সংসারী হ'ও, বিবাহ ক'রো, তাকে ভাল বেসো; সে যেন একদিনের তরে তোমার জন্যে কাঁদেনা। আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, তার জন্যে তুমি ভেবনা। তোমার কাছে শেষ ভিক্ষা, একবার আমায় দ্যাখা দিও। তুমি কেমন আছ, আমি জীবন্মৃতা——

ভদ্রেশ্বর। ১৬ই বৈশাখ।	প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী শ্রীমতি মধুমতী দেবী।

ধীরেন্দ্রনাথ পত্রখানির আদ্যোপান্ত পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তার মনের ভাব মুখ দিয়া প্রকাশ পাইল যে মধুমতী আমার স্ব বন্মৃতা!—আমা বিহনে নিদাঘ প্রপীড়িতা ক্লিষ্টাঙ্গী কনক লতিকা সদৃশা আমার প্রাণের মধুমতী আজ জীবন্মৃতা! ধীরেন্দ্রনাথ মধুমতীর বিষয় যতই ভাবিতে লাগিল ততই তার হৃদয় উচ্ছ্বাস দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্ষণমধ্যে তার মনের বিপর্যায় ঘটিল। এই মাত্র সে মধুমতীর মূর্ত্তিখানি হৃদয় হইতে অন্তরিত করিবে ভাবিয়াছিল, এই মাত্র সে মধুমতীর আশা একে বারেই পরিত্যাগ করিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু, হায় এখন তার মনোরথ বিপরীত পথাবলম্বন করিয়াছে, এখন সে মধুমতীলাভাকাঙ্ক্ষায় বিষম কণ্টকাকীর্ণ দেখিয়াও দেখিতেছে না। ধীরেন্দ্রনাথ এখন চিন্তার ঘোর কুজ্ঝটিকাবৃত মহা সমুদ্রের উপর দীশাহারা হইয়াছে। মধুমতীর সজল নয়ন, মধুমতীর বিষাদ বদন, মধুমতীর কাতর বচন, একে একে সকলই স্মৃতিপথে দণ্ডায়মান হইল, একে একে সকলেই ধীরেন্দ্রের হৃদয়াসন অধিকার করিল। আর সে স্থির থাকিতে পারিল না. ধীরেন্দ্রনাথ ত্রস্ত হইল, অদ্যই সে ভদ্রেশ্বরে গমন করিবে, অদ্যই সে মধুমতীর সহিত দেখা করিয়া মধুমতীকে বুঝাইবে, তাকে প্রবোধ দিবে, যাতে সে না জীবন পরিত্যাগ করে, সে যাতে এই কু অভিপ্রায় হইতে ক্ষান্ত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবে। ধীরেন্দ্রনাথ ভাবিল, মধুমতী যদি নিতান্তই আমার মতানুযায়ী কার্য্য না করে, নিতান্তই প্রবোধ না মানে, তা হ'লে কাজে কাজেই মুখে না বলিতে পারি, পত্রের দ্বারাও এ বিষয় চন্দ্রবাবুকে জানাইব, তাতে যদি তিনি এ বিবাহে অমত করেন, তা হ'লে দেখছি অগত্যা আমার

মধুমতীকে নিয়ে দেশান্তরী হ'তে হবে, জনসমাজে আমায় ঘৃণিত হ'তে হবে। মধুমতী যথার্থই আমার, মধুমতী যথার্থই আমার জন্যে জীবন্মৃতা।

এই ভাবিয়া ধীরেন্দ্রনাথ পুস্তকাদি গুছাইয়া বাড়ির ভিতর যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় চন্দ্রবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধীরেন্দ্রনাথ চন্দ্রবাবুকে দেখিবামাত্র একটী নমস্কার করিয়া "আসুন মহাশয়" বলিয়া ঘরের ভিতর বসাইবার জন্য যত্ন করিল। উপেন্দ্রনাথের বহির্বাটীর ঘর একটী। এইটীই ধীরেন্দ্রের পাঠাগার, এইটীই উপেনবাবুর আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের বসিবার দাঁড়াইবার ঘর। কিন্তু ঘরটী আয়তনে বৃহৎ এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। পাটাতনের উপর সতরঞ্চি পাতা, দেয়ালে দুচারি খানি ছবি থাকিয়া গৃহ-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে, অল্পমূল্যের একটী ঘড়িও আছে, অর্থাৎ গৃহটী মধ্যমরূপে সাজান।

চন্দ্রবাবু উপবিষ্ট হইয়া ধীরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার পিতা কি বাড়ি আছেন ?"

"আজ্ঞা হাঁ—আপনি বসুন, তিনি বাড়ির ভিতর আছেন, আমি তাঁকে ডেকে নিয়ে আস্‌ছি" এই বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথ বাড়ির ভিতর হইতে পিতাকে ডাকিয়া আনিল।

উপেন্দ্রনাথ চন্দ্রবাবুকে দেখিয়া একটী নমস্কার করিলেন, চন্দ্রবাবুও সেটী প্রত্যর্পণ করিতে বাঁকি রাখিলেন না। উভয়ে উভয়ের কুশলাকুশল অবগত্যন্তে নানাপ্রকার কথা কহিতে লাগিলেন ও উপেন বাবুর ভৃত্যটী মধ্যে মধ্যে তামাকু প্রদান করিতে লাগিল।

চন্দ্রবাবু কথা কহিতে কহিতে আজ তাঁর মণিরামপুরে

আসিবার উদ্দেশ্যটী প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"উপেন বাবু! আমার সম্পূর্ণ অভিলাষ, যাতে আমরা উভয়ে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হই, সেই নিমিত্তই আজ আমি এসেছি, কি বলেন?"

ধীরেন্দ্রনাথ গৃহমধ্যে থাকিয়া চন্দ্র বাবুর অভিপ্রায় শ্রবণ করিল, তার হৃদয় নাচিয়া উঠিল, এত দিনের পর সে একটু স্থির হইল, এত দিনের পর তার হৃদয়াচলের ঘোর তিমিরাবৃত কন্দরটী আশালোকে আলোকিত হইল। ধীরেন্দ্রনাথের লজ্জা আসিয়াছে, সে গৃহের বাহিরে আসিয়া অন্তরাল হইতে সমস্ত কথা শুনিতে লাগিল।

উপেন্দ্রনাথ চন্দ্র বাবুর অভিলাষ শ্রবণ করিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে কহিলেন,—"কেন? আমরাও বহুদিন হ'তে ও সম্বন্ধে আবদ্ধ আছি?"

চন্দ্রবাবু ধীরেন্দ্রের সঙ্গে মধুমতীর বিবাহ দিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা স্বত্তেও আজ তারাসুন্দরীর অভিমত পথে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তারাসুন্দরী চন্দ্রবাবুর দ্বিতীয়া ভার্য্যা। স্বভাবতঃ লোকে সহজেই দ্বিতীয়া ভার্য্যার বশীভূত হয়, দ্বিতীয়া ভার্য্যার মনস্তুষ্টির জন্য নানা প্রকার জঘন্য কার্য্যও করিয়া থাকে; আজ চন্দ্রবাবুও তারাসুন্দরীর মতের বিভিন্ন কার্য্য করিতে পারিলেন না, আর তিনি তারাসুন্দরীর মুখ-শশির ম্লানভাব দেখিতে পারিলেন না। প্রিয়তমার অভিমান মোচনার্থে আজ তিনি উপেনবাবুর বাটীতে আসিয়াছেন, তাই আজ তিনি ধীরেনের সঙ্গে মধুমতীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাই আজ হাঁসিতে হাঁসিতে উপেনবাবুর এই রস বাক্যের উত্তর দিলেন যে, সে সময়েত আমরা বর্ত্তমান ছিলাম না, আর সে আমোদের

আমরা অংশীও হইনি, এখন আসুন আমরা সেই পুত্তল পুত্তলীর আদর্শ স্বরূপ ধীরেন্দ্রের সঙ্গে মধুমতীর বিবাহ দিয়ে সম্বন্ধ ভিত্তি-টীকে দৃঢ় করি।

উপেনবাবু চন্দ্রবাবু অপেক্ষা আপনাকে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আমার এমন কি ক্ষমতা আছে যে আপনার কন্যাকে আমি গৃহে নিয়ে আসি? তবে যদি আপনি সমস্ত বিষয়েই আমাকে অভয় দেন, তাহ'লে আমার আর কি আপত্তি বলুন?"

তারাসুন্দরী পূর্ব্বেই চন্দ্রবাবুকে বলিয়া দিয়াছেন, যে, বিবেচনা করি, উপেনবাবু সমারোহের সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে পারিবেন না, তজ্জন্য যেন তুমি কোনরূপ অভিলাষ প্রকাশ করিও না। গহনায় কোন প্রয়োজন নাই, কেননা, মধুমতীর সমস্তই গহনা আছে; আর উপেনবাবু যাতে স্বল্পব্যয়ে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তার জন্যে তুমি বিশেষ চেষ্টা করিবে।

পাঠক! চন্দ্রবাবু আজ তারাসুন্দরীর অঞ্চলাবদ্ধ, আজ তাঁর অটল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হৃদয়াচল তারাসুন্দরীর নিকট পরাভূত, আজ তিনি নিতম্বিনীর খেলনক সদৃশ হইয়া উপেনবাবুর বাটীতে আসিয়াছেন, তাই আজ চন্দ্রবাবু বলিলেন,—"আপনাকে আর অধিক বলিতে হবেনা, আপনার যাতে সুবিধা হয়, আপনি তাই কর্ব্বেন। অলঙ্কার আদির প্রয়োজন নাই, তবে সামাজিক আদান প্রদান সেটা আপনার বিবেচনার উপর নির্ভর। আর ধীরেনকে আমি যথেষ্ট স্নেহ করি, ধীরেনের হিত চেষ্টা আমার অনেক দিন হ'তেই আছে। যাহা হউক এই বিবাহে আমার যে সমস্ত প্রজাবিলী জমী আছে, সমস্তই ধীরেনকে প্রদান ক'র্ব্বো।"

উপেন্দ্রনাথ আশাতীত অর্থলাভ দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না. চন্দ্রবাবুকে বলিলেন,—"আপনার জামাতাকে আপনি যা ইচ্ছা তাই দেবেন, তার জন্য আর আমার মতামত জিজ্ঞাসা ক'রচেন কেন? তবে এই বলি যে, ধীরেনকে আপনি যেমন স্নেহ করেন, এইরূপ স্নেহ যেন চিরকাল থাকে?"

উভয়েতে এইরূপ বিবাহ সম্বন্ধীয় নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এদিকে উপেনবাবুর ভৃত্যটী এই সুখ সমাচার অন্দর মহলে অনেকক্ষণ প্রকাশ করিয়াছে। অন্তঃ-পুরে চন্দ্রবাবুর নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে জলযোগের বন্দোবস্ত হইতেছে। কেহ বলিতেছে,—মেয়েটী কিন্তু বাপু বেশ পরিষ্কার। কেহ বলিতেছে,—কুটুম্বিতা ক'রে সুখ হবে ইত্যাদি

চন্দ্রবাবু উপেন্দ্রনাথকে বলিলেন,—"দেখুন শুভ কর্ম্মের বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই, এই মাসেই একটা দিন স্থির করে ফেলুন?"

উপেনবাবু পঞ্জিকা খুলিয়া দিন দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণ-কাল পরে বলিলেন,—"দেখুন জ্যৈষ্ঠ মাসেতে কিছুতেই বিবাহ হ'তে পারেনা, তবে এই মাসে যদ্যপি আপনার ইচ্ছা হয়, তাহ'লে আগামি পরশ্ব দিনেই গাত্র হরিদ্রা ও বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়? দেখুন এখন আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন?"

চন্দ্রবাবু অনেক ক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথ বহিঃপ্রাঙ্গনস্থ জুঁয়ের ঝাড় বাঁধিতে বাঁধিতে এই সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়া, অর্থাৎ আর একদিনের পরেই তার

ভাগ্যপ্রসূন প্রস্ফুটিত হবে ভাবিয়া আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। সে তখন ভাবিতেছে যে মধুমতী অদ্য এ শুভ সংবাদে না জানি কতই আনন্দিতা হবে। যাহা হউক, ক্ষণকাল পরে উপেনবাবু জলযোগের আয়োজন কিরূপ হইতেছে জানিবার নিমিত্ত একবার বাটীর ভিতর আসিয়া দেখিলেন সমস্তই প্রস্তুত। উপেন্দ্রনাথ পরশ্ব দিবসে ধীরেন্দ্রের বিবাহ হবে, আমার কিছুই খরচ হইবে না, অথচ চন্দ্রবাবু আশাতিত অর্থ সমবেত আপন কন্যাকে প্রদান করিবেন। এই শুভ সংবাদে পুরনারীদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। উপেনবাবুর গৃহিণীটী মহাআনন্দিতা হইয়া রহিলেন,—"তবে চন্দ্রবাবুকে বাড়ির ভিতর নিয়ে এসনা।"

উপেন্দ্রনাথ অপেক্ষা না করিয়া চন্দ্রবাবুকে সাদর সম্ভাষণে বাড়ির ভিতর লইয়া আসিলেন।

চন্দ্রবাবু জলযোগে নিবিষ্ট, কুলকামিনীরা গবাক্ষের অন্তরাল হইতে চন্দ্রবাবুকে নিরীক্ষণ করিতেছে। চন্দ্রবাবুর যদিও মধ্যে মধ্যে এ বাটীতে আসা যাওয়া আছে, তত্রাচ আজ তাঁর ভাবান্তর, কামিনীরাও আজ তাঁকে নবভাবে দেখিতেছে। চন্দ্রবাবু জল-যোগ সমাপনান্তে বিদায় প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—"তবে আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না, এক্ষণে আমাকে বিদায় দিন।"

উপেন্দ্রনাথ বিবাহপ্রসঙ্গের নানা কথোপকথন করিয়া চন্দ্রবাবুকে বিদায় দিলেন। চন্দ্রবাবুও ধীরে ধীরে বাটীর বাহির হইলেন।

পাঠক! আপনারা একথা অবশ্য বলিতে পারেন, যে বিবাহের দিনস্থির হইল, কিন্তু পাত্র পাত্রী সন্দর্শন ক্রিয়া কিছুই হইল না। আর কেন, চন্দ্রবাবু পাত্র দর্শনটী বাহুল্য মনে করিয়া

এ বিষয়ে ক্ষান্ত হইলেন। অর্থাৎ মনের মিল থাকিলে এবং পূর্ব্বাপর জানা শোনা থাকিলে এইরূপই হইয়া থাকে।

আর দিন নাই অদ্য হইতেই বিবাহের উদ্যোগ করিতে হইবে, আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, এই ভাবিয়া উপেন্দ্রনাথ জনৈক প্রতিবাসীকে ডাকাইয়া আপনার সমস্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। প্রতিবাসিটী উপেন্দ্রবাবুকে উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিলেন, যে,—"দ্যাখ বিবাহের দিন নাই সত্য, কিন্তু তার জন্য তোমার চিন্তা কি? বরঞ্চ চন্দ্রবাবুর ভাবিবার কথা।" এই বলিয়া উভয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে ধীরেনের বন্ধুবান্ধবগণ আসিয়া শুনিল যে, ধীরেনের পরশ্ব দিনে বিবাহ হইবে। তারা মহা আনন্দিত! তারা ধীরেনকে উপহাস করিয়া অনেক কথা কহিতেছে। কেহ বলিতেছে,—"ধীরেন! আর কেন, বাসর-সঙ্গীত খানা মুখস্থ করে রাখ।" কেহ এই কথার প্রতিবন্ধক হইয়া কহিল,—"সেও যা খুসি তাই করুগগে, আমাদের যাবার আস্‌বার সুবিধা হ'লেই হ'ল।" অপর একজন বলিল,—"তা না হ'লে হবে কেন ভাই। ধ'ত্তে গেলে একটা জমীদারী পাবে।

ধীরেন্দ্রনাথ হাঁসিতে হাঁসিতে কহিল,—"এসমস্ত কথা আমায় বলিলে কি হ'বে ভাই? তোমরা একবার বাবাকে বল।"

বন্ধুবর্গের মধ্যে একজন কহিল,—"দ্যাখ ধীরেন! তোমার পিতাকে বলিবার যদিও আমাদের প্রয়োজন নাই, তবু বল্‌চি দাঁড়াও। এই বলিয়া সে একেবারে উপেন্দ্রনাথের নিকটে গিয়া কহিল,—"দেখুন আপনি আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রুন আর নাই ক'রুন; আমরা কিন্তু ধীরেনের বিবাহ দিতে যাব।"

উপেনবাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন "সেকি বাপু! তোমরা যাবে বৈকি?"

অন্তরাল হইতে একজন মৃদুস্বরে যাবার আস্‌বার বন্দোবস্তটা কি প্রকার হবে প্রতিবাসিটীকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিল। "চন্দ্র-বাবু একজন ধনাঢ্য লোক, তিনি যখন এক প্রকার সমস্ত খরচের ভার নিয়েছেন, তখন ভাল না হ'য়ে কি আর মন্দ হবে?" প্রতি-বাসীটি এই কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। অমনি সকলে "তাই হ'লেই হ'ল" এই বলিয়া ধীরেনের সঙ্গে পুনরায় বিবাহ প্রসঙ্গে হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। ধীরেনও এক্ষণে দেখিল, বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকেরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাই সে বাক্‌-চাতুর্য্যে তাহাদিগের নিকট পরাস্ত হইয়াও বাসর ব্যাপারের অন্তস্পর্শ করিতে লাগিল। তাহারাও উপযাচক হইয়া আপন আপন বাসর বর্ণনে সহস্র মুখ বাহির করিল।

এদিকে উপেন্দ্রবাবু ও তাঁর প্রতিবাসীটী নিমন্ত্রিতের সংখ্যা কত হইবে, গাত্র হরিদ্রার আয়োজন কিরূপ হইবে, ইত্যাদির নানা বিষয় স্থির করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, প্রতি-বাসীটী আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন,—"দ্যাখ উপেন্দ্র! এখন আর থাক, রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পর যা হয় হবে।"

উপেনবাবুও "আচ্ছা তাই ভাল" বলিয়া বাড়ির ভিতর গমন করিলেন, প্রতিবাসীটীও স্বভবনে প্রস্থান করিলেন।

ধীরেন্দ্রনাথের বন্ধুবর্গ সকলেই চলিয়া গিয়াছে, সে এক্ষণে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে আলো জ্বালিল, একবার মিছামিছি পড়িতে বসিল, সত্য, কিন্তু সে সর্ব্বদাই অন্যমনা, তার হৃদয়ে মধুমতীর মূর্ত্তি প্রতিফলিত হওয়াতে আর কিছুই

স্থান পাইতেছে না। সে সর্ব্বদাই মধুমতীর বিষয় ভাবিতে লাগিল। যাহা হউক এক্ষণে সে কথঞ্চিৎ সুস্থির।

চন্দ্রবাবু একজন বহুদর্শী। তিনি সমারোহ কর্ম্ম অনেক করিয়াছেন—অনেক দেখিয়াছেন। তাই আজ তিনি মণিরাম-পুর হইতে আসিবার সময় সুবিধানুযায়ী কতকগুলি আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ ও তাহাদিগের উপর অন্যান্য নিকটস্থ কুটুম্ব-গণের নিমন্ত্রণের ভার দিয়া আসিলেন। বাটীতে আসিতে প্রায় আটটা বাজিল। চন্দ্রবাবুর অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা ও অন্যান্য প্রতি-বাসীগণ আগ্রহের সহিত বিবাহের কথাগুলি শুনিতে লাগিলেন। চন্দ্রবাবুও সময় নাই ভাবিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক এক এক জনকে এক একটী কর্ম্মের ভার দিতেছেন, এদিকে বাড়ির ভিতরও এ সংবাদ পঁহুছিল। চন্দ্রবাবুর মা, তারাসুন্দরী ও মধুমতী ইহাদের ত আনন্দের সীমা নাই; তৎসঙ্গে দাস দাসীদিগের ও সুযোগ উপস্থিত। গিন্নি মাঠাকুরুণের কাছে মহা আব্দার করিতেছে। মধুমতীর বিবাহ, তারা এবার অল্পে সন্তোষ হ'চ্চে না। পুরনারীর মধ্যে কেহ বলিতেছে,—"তাই ত গা একদিনেই গায়ে হলুদ আর বে? দুদিন হ'লে বেশ আমোদ হ'ত বাপু?"

তারাসুন্দরী বলিলেন,—আমারও তাই ইচ্ছা ছিল; বোধ হয় দিন নাই, তা আর কি করা যাবে।"

মধুমতী অবাক, পরশ্ব দিবসে ধীরেন্দ্রের সহিত তার বিবাহ হবে, এ কথা সে স্বপ্নের ন্যায় বিবেচনা করিতেছে। মধুমতী জানিত ধীরেন্দ্র আজ আসিবে, তাই আজ সে আত্মদানে প্রস্তুত হইয়াছিল, আজ তার হৃদয়েশ্বরকে নয়নজলে অভিষেক করিবার নিমিত্ত সযতনে বিষাদ মেঘ খানিকে অন্তরাকাশে এতদিন

ধরিয়া রাখিয়াছিল। এখন তার উদ্বিগ্নচিত্ত স্থির হইয়াছে, এখন তাঁর হৃদয়াকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। এতক্ষণের পর তার চিন্তা দূর হইল, এতক্ষণের পর সে ভাবিল যে, অচিরাৎ আমার আশাপূর্ণ হবে। তারাসুন্দরী দেবী চুপি চুপি রামাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দ্যাখ রামা! কাল সকাল বেলাই তোকে একবার মণিরামপুরে যেতে হবে।"

রামা উত্তর করিল,—"কেন গা?"

তারাসুন্দরী একবার চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া ভগ্নস্বরে কহিলেন,—"ছাখ, এই কাগজ গুলো ধীরেনের মাকে দিয়ে ব'লবি যে, এই গুলো বিবাহের খরচ করবার জন্যে মা পাঠিয়ে দিয়েছে। দেখিস্ আর কাকেও যেন বলিস্‌নি। আর আমাদের বাড়িতেও যেন কেউ শোনে না।"

রামা বহু দিনের ও বিশ্বাসী ভৃত্য; তারাসুন্দরী রামাকে বিশ্বাস করিয়া একেবারে এতগুলি টাকা হাতে দিলেন। রামা "আচ্ছা" বলিয়া, চুপি চুপি নোট গুলো আপনার রন্ধনশালায় একটী হাঁড়ির ভিতর রাখিয়া দিল। সিন্দুক বাক্স থাকিতেও যে রামা কেন এরূপ স্থানে রাখিল, তা রামাই জানে।

অধিক রাত্রি হইয়াছে চন্দ্রবাবু বাটীর ভিতর আসিয়া আহার করিতে বসিলেন। তারাসুন্দরী দেবী পার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হ্যাগা তারা কি দেবে থোবে ব'ল্লে?"

চন্দ্রবাবু কহিলেন,—"কিছুই না"।

তারাসুন্দরী। একেবারে কিছুই না? গায়ে হলুদের জিনিস কি রকম পাঠাবে?

চন্দ্রবাবু। তাদের যেমন ক্ষমতা হবে।

তারাসুন্দরী। পাঁচএয়োর পাঁচখানা কাপড়ের কথা ব'লেছ কি ?

চন্দ্রবাবু। শোন বলি। তারা যা পাঠাবে, যে রকম খরচ কর্ব্বে, তাতে কেউ নিন্দে ক'ত্তে পার্ব্বে না।

তারাসুন্দরী। আমাদের জিনিস পত্তর সব কলিকাতা থেকে আসবেত ? চন্দ্রবাবু কহিলেন,—হাঁ।

তারাসুন্দরী। বর কোণের কাঁপড় যেন ভাল আসে। বরের আংটী কি রকম হবে ?

চন্দ্রবাবু। আংটী কিনতে গেলেই ঠোক্‌তে হবে, তোয়ের করবারও সময় নাই। তাই ভেবেছি যে, আমার হীরের আংটীটা দেওয়া যাবে।

তারাসুন্দরী। ঘড়ি টোড়ি ?

চন্দ্রবাবু। আমারই যা আছে।

তারাসুন্দরী দেবী দেখিলেন যে তাঁর আশানুযায়ী সমস্তই হইবে। তত্রাচ তিনি বলিলেন যে, খরচ পত্তর ভাল করে ক'রো, লোকে যেন একথা বলে না যে,—মধুমতীর মা নেই ব'লে বিবাহ যৎসামন্যের উপর হ'ল।

চন্দ্রবাবু, তারাসুন্দরীর এই গুণেই বশীভূত। তারাসুন্দরী মধুমতীকে স্বপত্নীতনয়া ব'লে একদিনও ভাবেন না, আপনার কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন, তাই চন্দ্রবাবুও তারাসুন্দরীর মতান্তরে কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। যাহা হউক চন্দ্রবাবুর আহারের পর সকলেই আহার সমাপনান্তে এই বিবাহে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিষয় স্থির করিতে লাগিলেন। মধুমতী এতদিনের পর সুখে নিদ্রাভিভূতা হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কূট মন্ত্রণা।

হুগলীর জমিদার শ্রীযুক্ত কমলাকান্তের বাটির আজ সকলেই নিরব নিস্তব্ধ!—সকলেরই মুখ বিষণ্ণ!! কমলাকান্তের পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়াছে। বিশেষতঃ আজ তাঁর অবস্থা অতি শোচনীয়। কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার ও কবিরাজে বাড়ি পরিপূর্ণ। সকলেই নিরাশ, ঔষধ খাওয়ান হইতেছে, কিন্তু রোগের উপশম হইতেছে না! কমলাকান্ত বাবু বাক্-শক্তি রহিত হইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে কবিরাজেরা দেখিয়া আসিতেছেন সত্য, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। জনৈক আত্মীয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে মহাশয়! আপনারা কিরূপ দেখিতেছেন? বিজ্ঞ ডাক্তার মহাশয় উত্তর করিলেন যে কিছুতেই উনি আর রক্ষা পাইবেন না। আত্মীয়টী গঙ্গা-যাত্রার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে ডাক্তার মহাশয়েরা অমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—না-এখন দুইদিন কোন আশঙ্কা নাই। ভবনাথ আজ কদিন ধরিয়া আশাতীত চিকিৎসা করাইল, অহোরাত্র পিতার নিকট থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিল। কিন্তু কিছুই হইল না। এক্ষণে সে হুতাশ প্রাণে

বিষণ্ণ মনে অচিরাৎ পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন এই ভাবিতে ভাবিতে একবার বহির্ব্বাটীতে আসিয়া বসিল।

এদিকে ভদ্রেশ্বর হইতে নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়া পঁহুছিল। জনৈক বেহারা পত্র খানি আনিয়া ভবনাথের হস্তে প্রদান করিল। ভবনাথ পত্র খানি উন্মোচন করিয়া চকিতভাবে পুনঃপুনঃ আদ্যোপান্ত পাঠ করিল। পত্রপাঠে ভবনাথের ভাবান্তর ঘটিয়াছে। তার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, ক্রোধে শরীর বিকম্পিত হইতে লাগিল, নাসিকা হইতে ঘন ঘন উষ্ণশ্বাস বহিতে লাগিল। ভবনাথ গুরু গম্ভীর স্বরে বেহারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, "যে পত্র নিয়ে এসেছে সে কোথা? তাকে ডেকে নিয়ে আয়।" চন্দ্রবাবুর জনৈক কর্ম্মচারী নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিল। বেহারা কমলাকান্তের নায়েবের নিকট পত্রখানি রাখিয়া গিয়াছিল তাই রক্ষা, নতুবা নিশ্চয়ই যে পতঙ্গবৎ ভবনাথের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইত। বেহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"চ'লে গেছে।" ভবনাথ ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "তবে ও ঘর থেকে অটল বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।" বেহারা আজ্ঞামাত্র অটলবিহারীকে আনিল।

অটলবিহারী ভবনাথের হস্তে পত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, —"কিহে! চিঠি কিসের?"

ভবনাথ উত্তর করিল,—যমের বাড়ী।"

অটল। কেন?

ভবনাথ। কাকেও পাঠাতে হবে ব'লে।

অটল। ব্যাপার খানা কি?

ভবনাথ অটল বিহারীকে পত্রপ্রদান করিয়া বলিল,—"কি আশ্চর্য্য! চন্দ্রবাবুকে আমরা ভদ্রলোক ব'লে জান্‌তুম, এখন দেখ্‌ছি তাঁর মতন ইতর লোক আর নেই। এই বলিয়া ক্রোধভরে বসিয়া রহিল। অটলবিহারী পত্রপাঠ করিয়া কহিল,—"তাইত হে, আমায় ধন অপরে নেয় যে দেখ্‌ছি?" ভবনাথ ক্রোধ-বিকম্পিত স্বরে কহিল,—"কখনই না—আমি বেঁচে থাক্‌তে কেউ তাকে বিবাহ ক'র্‌ত্তে পার্ব্বেনা। কি বল হে তুমি? এ কি কম দুঃখের কথা! চন্দ্রবাবু সে দিন বাবার কাছে সমস্ত ঠিক ক'রে গিয়ে শেষটা এই কল্লে। অটলবিহারী কহিল, "বোধ হয় চন্দ্রবাবু তোমার চেয়ে ভাল পাত্র পেয়েছে।" ভবনাথ সক্রোধে কহিল, "কেমন ভাল ছেলে তাও দেখে নেব। দ্যাখ অটল! এ বিবাহ কিছুতেই হ'তে দেওয়া হবে না, এ বিবাহ হ'লে আমাদের আর কিছুতেই মান থাক্‌বে না। তুমি শীঘ্র একটা উপায় কর, যত টাকা খরচ হয় ক'র্ব্বো।" অটলবিহারী এইই চায়, সে পরের ভাল ক'র্‌ত্তে পারেনা, কিন্তু সর্ব্বনাশ করিতে অতি সুনিপুন।

অটলবিহারী ভবনাথকে এই সর্ব্বনাশ কার্য্যে সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত খুব আড়ম্বর করিয়া বলিল,—"দ্যাখ ভবনাথ! চন্দ্রবাবু কিন্তু খুব অন্যায় কাজ ক'রেছে, তোমরা যে এত বড় এক্‌টা জমীদার, তা জেনে শুনেও তোমাদের অপমান কত্তে ব'সেছে, এতে ত তোমার রাগ হবেই আর হওয়াই উচিত, এতে আমার মাথার চুল সুদ্ধ কেঁপে উঠেছে। কি ব'ল্‌বো, আমি হ'লে এতক্ষণ—" এই বলিয়া কৃত্রিম ক্রোধভরে বসিয়া রহিল। অটল-বিহারীর বাক্য গুলি প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতির ন্যায় বোধ

হইল। অটলবিহারীর বাক্যে ভবনাথ দ্বিগুণতর ক্রোধান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা ভাই এখন তুমি কিরূপ স্থির ক'চ্চো বল দেখি? তুমি যা বল্‌বে আমি তাই কর্ব্বো।

অটলবিহারী ভবনাথকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"দ্যাখ ভবনাথ! প্রথমে সেই ছোঁড়াটাকে কোন রকমে নিকেশ ক'ত্তে হবে, তা একেবারে মেরেই ফেল, কি কোন সুযোগে দেশান্তর কর, তার পর মেয়েটাকে চুরি কর। পরে চন্দ্রবাবুকে একটা মাম্‌লা মকদ্দামায় ফেলে সর্ব্বস্বান্ত কর। চন্দ্রবাবুকে সর্ব্বস্বান্ত করা বাহুল্য মাত্র, কেন এতেই সে যথেষ্ট শিক্ষা পাবে।"

অটলবিহারী হৃদয় বিষে পরিপূর্ণ, অটলবিহারীর জিহ্বা হইতে এই ভাবি দম্পতীর সর্ব্বনাশ মন্ত্রণা সুধাসম ভবনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। ভবনাথের হৃদয়ে পূর্ব্বেই এই মন্ত্রণা জাগরিত হইয়াছিল, কিন্তু লোকলজ্জায় হউক বা অন্তরে এক্‌টু দয়ার ভাব আসাতেই হউক, অথবা কমলাকান্তের ঔরসজাত বলিয়াই হউক, প্রকাশ করিতে পারে নাই। ভবনাথের হৃদয়ে এখন আর ভয় নাই, লজ্জা নাই; এখন সে অটলবিহারীর চাটুবাক্যে দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়াছে। এখন তার ক্রোধাগ্নি লোহিশিখায় সর্ব্ব প্রলয় হেতু দিগ্মণ্ডল ছাইয়া ফেলিল।

ভবনাথ অটলবিহারীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"অটল! একাজ কবে হবে?"

অটলবিহারী ত্বরিতবাক্যে কহিল,—"মাস খানেকের মধ্যে।"

ভবনাথের পিতা যে দারুণ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, আর দুদিন পরেই যে ভবনাথ পিতৃহীন হইবে, আর দুদিন পরেই

যে ভুরপনেয় সংসার চিন্তা লোলরসনায় তার শোণিত পানে নিযুক্ত হইবে, এখন সে এ সমস্ত কিছুই ভাবিতেছে না, পিতার তরে এখন আর কোন চিন্তা নাই। এখন সে মধুমতী-লাভ-পন্থা সন্দর্শন করিতেছে। এখন সে ভাবিতেছে যদি মধুমতীর বিবাহই হইল, এক দিনের তরে যদি মধুমতী অপরের হৃদয়ে স্থান পাইল, একদিনের তরে যদি অপরে মধুমতী রত্ন উপভোগ করে, তবে আর মধুমতী হরণে লাভ কি? তা হ'লে আর আমার গৌরব কোথায়? তা হ'লে আর আমার ক্ষমতা কি? তা হ'লেত সমস্তই বৃথা। না—তা কখনই হবেনা, আমার লক্ষিত হরিণী অপরের অঙ্কে শোভা পাবে না, আমার আশার রতন অপরের হস্তে ন্যস্ত হবে না। ক্রোধে ভবনাথের শরীর কাঁপিতে লাগিল, চক্ষুর প্রত্যেক শিরা রক্তবর্ণ হইল, ঘন ঘন নিশ্বাসে তার ক্রোধাগ্নির দাহিকতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

ভবনাথ লক্ষ্য ভ্রষ্ট শার্দ্দূলের ন্যায় ইতস্তত করিয়া অটল বিহারীকে কহিল,—"অটল! তা হবেনা, বিবাহ কোন প্রকারেই হ'তে দেওয়া হবেনা। তুমি এমন কোন উপায় দ্যাখ, যাতে কা'ল না বিবাহ হয়। অটলবিহারী ক্ষণকাল চিন্তার পর কহিল, সবেই হ'তে পারে, তবে সাহস চাই, টাকা চাই।

ভবনাথ। ভাল ভাই! কি ক'ত্তে হবে বল?

অটল। কাল বিবাহ হ'বেত? ভবনাথ। হঁ্যা।

অটল। বর নৌকায় আস্‌বেত?

ভবনাথ। তা না হ'লে আর কিসে আস্‌বে?

অটল। তা হ'লেই সব হ'য়ে গেল। নৌকা খানা ডুবিয়ে দেওয়া যাবে।

ভবনাথ। পার্ব্বেত?

অটল। সব পার্ব্বো। এখন তুমি টাকা বার ক'ত্তে পাল্লেই হ'ল। এ সমস্ত হ'ল টাকার খেলা. দাঁড়ি মাঝিদের টাকায় বশ ক'ত্তে হবে। আশে পাশে দশ পোঁনের খানা নৌক থাকবে, ছোঁড়াটা যদি ভেসে ওটে তা হ'লে তোলবার ছলা ক'রে ডুবিয়ে দিতে হবে।

ভবনাথ। তার পর মেয়েটাকে?

অটল। সে দুএক দিনের ভিতর ঠিক ক'রে নেওয়া যাবে। ভবনাথ অটল বিহারীর কুমন্ত্রণার প্রশংসা করিয়া কহিল,—"ভাই অটল! তোমার যত টাকা খরচ ক'ত্তে ইচ্ছা হয়, তত টাকা খরচ ক'র তাতে আমার কোন আপত্য নাই, দুঃখও নাই, তুমি কেবল একবার সেই রূপসীটিকে আমার হাত তুলে দিও।"

অটলবিহারী দম্ভের সহিত কহিল,—"নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই দেখবে দু তিন দিনের মধ্যেই সেই বনবিহঙ্গিনীটী তোমার পিঞ্জরাবদ্ধ হ'য়েছে।"

ভবনাথ অটলবিহারীর বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া কহিল,—"দেখ ভাই যেন প্রকাশ হয় না, তা হ'লে ভারি লজ্জা পেতে হবে।"

অটলবিহারী আপনাকে বড় করিয়া কহিল,—"তবে আর বাহাদুরীটা কি? এমন কাজ কর্ব্বো যে লোকে আবার জাত্তে পার্ব্বে? এই তুমিই আজ আমার মনের ভাব জাত্তে পাল্লে, তার পর কবে কি ক'র্ব্বো কোথা দিয়ে কি হ'য়ে যাবে, তার কি আর কিছু টের পাবে?"

এতক্ষণের পর ভবনাথ স্থির হইল। অটলবিহারী যথা-

র্থই বন্ধু, অটলবিহারীই একজন উপযুক্ত লোক, এবং অটলই আমার দুঃখে দুঃখী, ইহার দ্বারাই আমার আশা পূর্ণ হবে। ভবনাথ এইরূপে অটলবিহারীর গুণের প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। অটলবিহারী দেখিল যে আর সময় নাই, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। একার্য্য একাকী হইতে পারে না, ইহাতে দুদশজন ভোজপুরী পালওয়ান চাই, এ কার্য্যে আরও দুচারিটি বন্ধুর সাহায্য নিতে হবে। তা আর আশ্চর্য্য কি, টাকায় সবই হয়। ইতর ভদ্র সকলেই টাকার বশ টাকায় সকলের মুখ বন্ধ করিতে হইবে। আরও দেখছি, ইহাতে তোমারও বেশ দুপয়সা টাকা লভ্য হবে। ভবনাথ কিছু আর খরচ দেখ্‌তে যাবে না, তার পর কৃতকার্য্য হ'তে পাল্লেত আর কোন চিন্তা থাকবে না, আমি যা চাইব তাই পাব। অটলবিহারী এইরূপ নানা বিষয় ভাবিয়া ভবনাথকে কহিল, "দ্যাখ তোমাদের বাগানের পাশে সেই ভজা চাঁড়াল আর তার ভাগিনা তিনটেকে সঙ্গে নিতে হবে, তারা এ কাজের ঠিক উপযুক্ত, তাদের নিয়ে এত কাজ করা গেল, কিন্তু একটা কথাও প্রকাশ করেনি। ভবনাথও এত ক্ষণ মনে মনে উপযুক্ত লোকের অনুসন্ধান করিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে ভজার কথা শুনিয়া আর কোন চিন্তা রহিল না। ভজা চাঁড়াল ভবনাথের বশীভূত, সে অত্যন্ত বিশ্বাসী। ভবনাথ মধ্যে মধ্যে অনেক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, অনেক সতীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে, ছলে বলে অনেক ভাগ্যবতী কুলকামিনীকে ভবনাথের পদতলে ভজদ্বদে পতিবিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে, বিতংস বিজড়িতা কুলঙ্গিনীর সাহায্য করিতে গিয়া অনেককেই

মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছে। কিন্তু হায় টাকায় সকলই বশীভূত। হুগলীর বিচারপতিও সময়ে সময়ে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। ভজা প্রায়ই এ সমস্ত কার্য্যে ছিল, সে এ সমস্ত কার্য্যে প্রচুর পারদর্শীতা প্রকাশ করিয়াছিল, এমন কি কোন সময়ে ভবনাথের পরিবর্ত্তে সে ছয় মাস জেলে বসবাস করিয়াছে।

ভবনাথ অটলবিহারীর মুখে ভজা চাঁড়ালের নাম শুনিয়া মহা আনন্দিত। সে অটল বিহারীকে কহিল,—"ঠিক্ ব'লছে অটল! তুমি শীঘ্র ক'রে তার সঙ্গে একটা মতামত স্থির করোগে, সেটা সকল দিকেই আছে, আমার নাম ক'রে বলগে যে, যেমন ক'রে হোক এ কাজ শেষ ক'ত্তেই হবে।"

অটলবিহারী ভবনাথের নিকট হইতে বিদায় লইবে এমন সময় একটী ভৃত্য আসিয়া ভবনাথকে কহিল,—' আপনি একবার বাড়ির ভিতর যান, ডাক্তার বাবু আপনাকে ডাকচেন।" ভবনাথ ও অটলবিহারী উভয়েই বাড়ির ভিতর গমন করিল।

দিবা অবসান, বেলা আর নাই। এদিকে কমলাকান্তের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিতেছে, বৃদ্ধের বদন সৌন্দর্য্য বিকৃতিভাব ধারণ করিয়াছে, হস্তপদ সমস্তই অবশ, নাভি হইতে সবেগে শ্বাস উত্থিত হইয়া নাসাপথ অতিক্রম করিতেছে। চক্ষু পলক বিহীন হইয়া গহ্বরস্থ হইয়াছে মধ্যে মধ্যে গঙ্গাজলে বিশুষ্ক জিহ্বাটীকে ভিজান হইতেছে। ভবনাথ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল মৃত্যুর বিলম্ব নাই, অতি শীঘ্রই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন। তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, নয়নাশ্রু নিপতিত হইল। ভবনাথ অগোবদনে শয্যার এক

পার্শ্বে বসিয়া মুখে একটু একটু জলপ্রদান করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে ভবনাথ কমলাকান্তের কর্ণমূলে মুখ দিয়া দুতিন বার "বাবা বাবা" বলিয়া ডাকিল, কিন্তু কমলাকান্ত নিরব। কমলাকান্তের আশু মৃত্যু ঘটিবে সত্য, কমলাকান্ত বাক্‌শক্তি রহিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু, তিনিত অচেতন হন নাই, তাঁর সম্পূর্ণই চৈতন্য আছে। তিনি কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন কিনা তা তিনিই জানেন, কিন্তু ভবনাথের কথায় উত্তর দিলেন না, তাঁর স্থির নেত্র দুটী জলে ভাসিতে লাগিল। এদৃশ্য সকলের পক্ষেই ভয়ানক, এ দৃশ্যে সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, সকলেরই চক্ষে জল আসিল। এই হৃদিবিদারক দৃশ্যে কমলাকান্তের স্ত্রী চিৎকার শব্দে কাঁদিয়া উঠিলেন। হতভাগিনীর ক্রন্দন রোল সকলের প্রবোধ বাক্যে অবিলম্বে থামিল সত্য, কিন্তু তার প্রাণের আবেগ হৃদয় উচ্ছ্বাস নয়ন দ্বার দিয়া অনর্গল ধারায় ধরা পতিত হইতে লাগিল। ভবনাথ ও আত্মীয়গণ আর স্থির থাকিতে পারিল না, ডাক্তার কবিরাজের অনভিমতে তারা কমলাকান্তকে উপর হইতে প্রাঙ্গনস্থ তুলসী তলায় সংরক্ষণ করিল। হায় আজ হুগলীর জমীদার সুদক্ষ কারু-খোদিত সুচারু পালঙ্কের পরিবর্ত্তে, সুকোমল দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যার পরিবর্ত্তে বেত-বিনির্ম্মিত কদর্য্য চৌপায়ায় সামান্য শয্যার উপর শয়ন করিলেন। পাঠক! এখন কি কমলাকান্তের হিতাহিত জ্ঞান আছে? এখন কি কমলাকান্তের বিবেচনা শক্তি আছে? যদি থাকে তা হলে অবশ্যই তিনি তাঁর মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা দারুণ বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। তিনি অবশ্যই ভাবিতেছেন যে আমার অতুল বিভব ইন্দ্রভবন সদৃশ্য সুসজ্জিত

প্রাসাদ, প্রণয়প্রতিমা ভার্য্যা ও প্রাণসম পুত্রকে চিরজীবনের মতন পরিত্যাগ করিতে হইবে, আর আমি তাদের দেখিতে পাইবনা, আর আমি তাদের কথা শুনিতে পাইবনা, আর আমি কোন সুখের অধিকারী নই। আমি একা এসেছি, আমায় একা যেতে হ'বে। যাদের আমি কত স্নেহ করেছি, যাদের আমি কত ভাল বেসেছি, যাদের সুখের জন্য আমি কত যন্ত্রণা সহ্য করেছি, আজ তারা কেহই আমার সঙ্গে যাবেনা। যে দেহের কত যত্ন কল্লুম, তাও অচিরাৎ ভস্ম হবে। শুনেছি আত্মার ক্ষয় নাই; তবে কি হবে? আবার কোথা যাব? সে খানে কি যত্নে থাক্‌ব? না এ সংসারের চেয়েও সে সংসারে কষ্ট পাব? ইত্যাদি বিষয় ভাবিবার কথা সত্য, কিন্তু তিনি কখনই এরূপ প্রকার ভাবিবেন না। তিনি সদাশয়, তিনি ধার্ম্মিক তিনি পরদুঃখে কাতর হ'তেন। "অসার সংসার, জীবন নশ্বর, কেহ কার নয়" ইহা তিনি অনেক দিন স্থির করিয়াছেন, ইহ-লোকের স্নেহ মমতা তিনি অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি অনেক দিন হইতে আত্মসংযম করিয়াছেন। অতএব মৃত্যুকালে হিতাহিত জ্ঞানসত্বেও তাঁর পার্থিব বিষয় চিন্তা আসি-বেনা, অবশ্যই তিনি তাঁর অভিষ্ট দেবতার চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

যাহাহউক কমলাকান্তের হৃদয়ে কণ্ঠে ও ললাটে হরিনাম অঙ্কিত করা হইল, কর্ণমূলে প্রাচীনেরা হরিনামামৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে ভবনাথ সজল নয়নে তুলসী পত্রদ্বারা গঙ্গোদক পিতার মুখে প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু আর না। কমলাকান্তের শ্বাসবদ্ধ হইল, মুখের জল মুখেই রহিল, আর

গলাধঃকরণ হইল না, শরীর নিস্পন্দ, নয়ন নিমীলিত। কমলাকান্তকে আর অধিককাল মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না, কালের শাসনে তাঁকে শীঘ্র, শীঘ্রই ইহজীবন পরিত্যাগ করিতে হইল, অবসর বুঝিয়া প্রাণ পাখিটী হৃদ্‌পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিল। কমলাকান্তের সহিত আর কোন সম্পর্ক রহিল না। চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল, রোদন নিনাদে প্রাসাদ বিকম্পিত হইতে লাগিল। কমলাকান্তের সাধ্বী স্ত্রী কাতরা কুররীসমা ধরা বিলুণ্ঠিতা; শোক বিহ্বলা চিত্তে পুরনারীরা তাঁকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেনা। সাধ্বী পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মনবেদনা জানাইতেছেন। ভবনাথ পিতৃতরে কাঁদিয়া আকুল যদিও সে চিৎকার স্বরে কাঁদিতে পারিতেছে না সত্য, কিন্তু দরদর ধারায় তার হৃদয় ভাসিয়া যাইতেছে।

এ আবার কি? ভবনাথ! এমন সময় তোমার একি কাজ? তোমার মতন পাষাণত আর পৃথিবীতে নাই, তুমি যে কমলাকান্তের একটী কুলাঙ্গার কুপুত্র জন্মিয়াছ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কমলাকান্তের চিরসঞ্চিত যশধ্বজা যে তোমা হতে অচিরাৎ ভগ্ন হবে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। তোমার কল্পাতিত, তোমার মুখ দর্শনে শরীর কলঙ্কিত হয়। তোমার মত এমন পাষণ্ড কে আছে, যে এই সমূহ বিপদে, এই পরমারাধ্য পিতার মৃত শরীর সম্মুখে থাকাতেও তার হৃদয় বিদীর্ণ না হইয়া কুঅভিপ্রায়ে গমন করে? ছি ছি একি ব্যবহার? তোমার একি বিবেচনা? তুমি যখন এ বিপদে কপট শোক প্রকাশ করিতেছ, তুমি যখন এমন দারুণ বিপদে নিপতিত হইয়াও আত্মতুষ্টি ভরে অন্যমনস্ক হইয়াছে, তখন না জানি আর দুদিন পরে সর্ব্বেশ্বর

হইয়া কি সর্ব্বনাশই করিবে? ভবনাথ! কথা শোন স্থির হও, পাশব আচার পূরণের সময় আছে, অভিলাষ চরিতার্থের দিন আছে। এখন নয়, এখন সে সমস্ত মন্ত্রণার সময় নয়। এখন একবার তুমি ভাব যে, তুমি পিতৃহীন হ'লে—তুমি অভিভাবক বিহীন হ'লে, এখন তোমাকে অনেক ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে! তোমার পিতার সামান্য জমীদারী নয়, তুমি এত লঘু চিত্তে এই অতুল বিভব কি ক'রে রক্ষা করিবে? তুমি চেষ্টা কর, যাতে সকলের প্রিয়পাত্র হও, যাতে সকলে তোমায় সম্মান করে। তুমি অটলবিহারীর সঙ্গ পরিত্যাগ কর। তোমার কি এই উচিত? এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম? পিতৃ বিয়োগ যন্ত্রণা অপেক্ষা মধুমতী তরে এতই চিন্তান্বিত হ'য়েছ যে ইঙ্গিতাকারে অটল-বিহারীকে ভজা চাঁড়ালের নিকট গমন করিতে আদেশ করিলে? অটল বিহারী যদিও এই বিষাদ পরিপূরিত স্থানে দাঁড়াইয়া কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে ভবনাথের আদেশে আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া স্বকার্য্য সাধনে গমন করিল। এদিকে ক্রমে রাত্রি হওয়ায় কমলাকান্তের আত্মীয়েরা আর বৃথা হা হুতাসে প্রয়োজন নাই ভাবিয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নিমিত্ত সকলে মৃতদেহটী সঙ্গে লইয়া হুগলীর দাহঘাট অভিমুখে গমন করিল। জমীদার বাটীর ভাগ্যরবি আজ কক্ষচ্যুত হইল, একা কমলাকান্ত বিহনে প্রাসাদ অন্ধকারময় হইল, সমগ্র হুগলীবাসী আজ শোকনীরে ভাসিতে লাগিল!

উদ্যোগ ব্যাপার।

অটলবিহারী সমকক্ষ জনৈক বন্ধুকে এই সমস্ত অভিপ্রায়, ভবনাথের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও আপনাদের প্রচুর অর্থলাভের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া উভয়ে ভজা চাঁড়ালের বাটীতে উপস্থিত হইল। রাত্রি অধিক হইয়াছে। ভজা চাঁড়াল এক্ষণে তার সহস্র ছিদ্র-যুক্ত একখানি পর্ণশালাভ্যন্তরে শয়ন করিয়া আছে। ভজা চাঁড়াল যদিও ভবনাথেয় কুকার্য্যের সহযোগী হইয়া যথেষ্ট অর্থ উপায় করে, কিন্তু সে ব্যয় ব্যবহার জানে না। সে উপায় করিতে জানে, কিন্তু অর্থের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে জানে না। যথেচ্ছাচারে, অপব্যয়ে তার আর কিছুই স্থিতি হয় না, বরঞ্চ দু চার দিবস পরেই যে দৈন্য দশা সেই দৈন্য দশা ঘটে। সে যে পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করে, তাতে একটু বিবেচনা পূর্ব্বক চলিলেই যথেষ্ট হয়, চিরদিন সে সচ্ছলে থাকিতে পারে, চণ্ডাল মণ্ডলীর মধ্যে সে একজন সম্ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু সে নীচ জাতি, তার আচার ব্যবহার অধিকতর নীচ, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিতে অর্থ উপার্জ্জন করে, কাজেই সে অর্থের যত্ন জানে না, কমলা তার ঘরে আদৌ বসবাস করেন না। ভজা চাঁড়ালের বাটিতে ভজা চাঁড়ালের আত্মীয়েরা একদিনের তরে একমুষ্টি অন্ন পায় না,

তার বিধবা সহোদরা দুটী উদরান্নের তরে সাধারণের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে। তার স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া আছে, তার ঘরখানি ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। কিন্তু এতদ অভাবেও তার বাটীতে আমাদের দেশীয় কুক্কুর গোষ্ঠীর অভাব নাই, দু চারিটী ছাগলও আছে।

অটল বিহারী ও তাহার বন্ধুটী ভজা চাঁড়ালের জমীতে উঠিতে না উঠিতেই কুকুরগুলি বিকট চিৎকারে বাহিরে আসিয়া আগন্তুকদিগকে অগ্রসর হইতে নিবৃত্তি করিল, আর ইহারা অগ্রসর হইতে পারিল না, বরঞ্চ আরও দশ হাত পিছাইয়া দাঁড়াইতে হইল। অটলবিহারী কুকুর গুলিকে তাড়াইবার বিস্তর চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অধিকন্তু প্রভুভক্তেরা প্রভুকে অপরিচিত ব্যক্তির আগমন বার্ত্তা জানাইবার নিমিত্ত অধিকতর চিৎকার আরম্ভ করিল। অগত্যা অটল দূর হইতে "ভজহরি! ভজহরি!" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ভজা চাঁড়াল যদিও গাঢ়নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে কুকুর-চিৎকারে ও মনুষ্য শব্দে নিদ্রাভঙ্গ হইতে বাকি রহিল না। অটলবিহারী কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ "ভজহরি ভজহরি" বলিয়া শব্দ হওয়াতে ভজহরি জাগরিত হইয়া কহিল,—"এত রাত্রিতে কে ডাকে গা?"

অটল উত্তর করিল,—"আমি।"

ভজা চাঁড়াল কুকুর চিৎকার জনিত অটলবিহারীর কোন কথা শুনিতে না পাইয়া বিরক্তির সহিত কহিল,—"আঃ কুকুর গুলর জালায় কিছু শুন্তে পাবার যো নেই।" এই বলিয়া কুকুর দিগকে দু এক টা ধমক দিতেই কুকুরেরা কথঞ্চিত স্থির হইল।

ভজা চাঁড়াল আবার কহিল,—"কে ডাকে গা ?"

অটল কহিল—"আমি ডাকছি, তুমি বাহিরে আসিলেই চিনিতে পারিবে।"

ভজা শয্যা হইতে উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিল, ধীরে ধীরে দরজা খুলিল, পরে বাহিরে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া কহিল,—"কোথায় গো ?"

অটলবিহারী ও তাহার বন্ধুটী দূর হইতে কহিল,—"তোমার কুকুরের ভয়ে যেতে পাচ্চি না।"

"কিছু বোল্‌বে না তোমরা এস এস" এই বলিয়া ভজা কুকুর গুলিকে তাড়াইয়া দিল, তাহারাও প্রভুর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া আগন্তুকদের পথ ছাড়িয়া দিল। ভজা আগন্তুক দ্বয়কে প্রাঙ্গনস্থ হইতেই চিনিতে পারিল, অমনি একটী নমস্কার করিয়া কহিল,—"বাবুরা এসেছেন, বসুন ব'সুন" এই বলিয়া দাওয়ার উপরে দুই জনকে দুই খানি কাষ্ঠাসন পাতিয়া দিল। অটল ও তাহার বন্ধুটী ধীরে ধীরে কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিল, ভজা তামাকু সাজিতে সাজিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁগা বড় বাবুর যে ব্যায়রাম বেড়েছিল, তা তিনি কেমন আছেন ?"

অটলবিহারী কহিল,—"আজ সন্ধ্যার সময় তিনি মারা গেছেন।"

কমলাকান্তের বাড়ি হইতে ভজা চাঁড়ালের বাড়ি প্রায় এক ক্রোশেরও অধিক হইবে, এ কারণ ভজা কমলাকান্তের মৃত্যুর বিষয় কিছুই জানে না, সে এক্ষণে অটলবিহারীর মুখে এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল, চক্ষে দু এক ফোঁটা জলও আসিল ; কমলান্তের বিয়োগে ভজহরির অশেষ দুঃখ হইতে পারে, চক্ষে

জলও আসিতে পারে, কেননা ভজহরি একজন প্রভুভক্ত। যাহা হউক আক্ষেপের পর জিজ্ঞাসা করিল,—"তা এত রাত্রে আপনারা আমার কাছে এসেছ কেন ?"

অটল উত্তর করিল,—"সে অনেক দরকার, তোকে এক্ষণি বাবুদের বাড়িতে যেতে হবে।"

ভজার বুঝিতে বাকি নাই, এত রাত্রে যখন বাবুরা তার বাড়িতে এসেছে, তখনই সে বুঝেছে যে তার কপাল ফিরেচে আর কার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। ভজা একখণ্ড কদলী পত্র আনিয়া অটলবিহারীকে প্রদান করিল এবং কহিল,—"আমিত বাবু হুকুমে খাড়া আছি, যখন যা ক'ত্তে ব'লবে তখনই তাই ক'র্ব্বো। তা এখানেত আর কেউ নেই ব্যাপারখানা কি বলেই ফেলুন না। বাবুদের অনভ্যাস কিছুই নাই, হুঁকার পরিবর্ত্তে বাবুরা কদলী-পত্রে নল প্রস্তুত করিয়া তামাকু সেবন করিতে লাগিল। অটল একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া তামাকু সেবন করিতে করিতে ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিল। ভজা চাঁড়াল উৎসাহের সহিত কহিল,—"তার আর কি বাবু, দেখবেন নিমীষের মধ্যে সব কাজ সাবাড় ক'রে দেব।"

অটলবিহারী ভজা চাঁড়ালকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত কহিল,—"কি জানিস্, একি কম ডুঃখের কথা, বাবু যদিও দু এক দিন বাঁচতেন, তা এই অপমানেই তিনি জীবন ত্যাগ ক'ল্লেন। যেমন শুন্‌লেন যে ভবনাথের সঙ্গে বে না দিয়ে অন্য এক্‌টা ছেলের সঙ্গে বে দিচ্চে, অম্নি তিনি যে ক্যামন হ'য়ে গেলেন, আর কথা কইলেন না। ডাক্তারেরা ত এই কথা ব'লে, যে বাবু এই সংবাদটায় হতাশ হ'য়ে পড়াতে এত শীঘ্র মারা

গেলেন।” অটলবিহারীর চেষ্টা বিফল হইল না, ভজার ক্রোধাগ্নি শীঘ্রই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

ভজা চাঁড়ালের বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর, খর্ব্বাকার, রং কৃষ্ণবর্ণ, মস্তকটী অতি ক্ষুদ্র, চুলগুলি ছোট ছোট, চোখ দুটী ভাঁটার ন্যায়, নাসিকা চ্যাপটা, ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয় দন্তাবরণে অক্ষম, বক্ষ বিস্তৃত, অঙ্গুলিগুলি এক একটী কদলীর ন্যায় বোধ হয়, হস্ত পদ ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শিরা-গ্রন্থিগুলি এত শক্ত যে বিবেচনা হয় সূচিকা ভেদ হয় কি না। ভজা চাঁড়ালের আকার প্রকার ও গঠন প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রকৃত একটী যমদূত ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। যাহা হউক অটলবিহারীর কথা শুনিয়া ভজহরির কোঠরস্থ চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ হইল, তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, সে দন্তে দন্তে সজ্ঘর্ষণ করিয়া কহিল,—“কি বোল্‌বো বাবু যদি ধ'ত্তে পারি, তা হ'লে কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খাই।” ভজা চাঁড়ালের মুখে যে কথা প্রকাশ পাইল, এ কাজ যে তার অনায়াসসিদ্ধ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সে সমস্তই করিতে পারে, নৃশংস দয়া মায়াহীনের কোন কার্য্যই আট্‌কায় না।

অটলবিহারী পুনঃ পুনঃ ভজহরিকে উত্তেজিত করিয়া কহিল,—“তবে তুই তোর ভাগ্নেদের ডেকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে চল।”

ভজহরি ত্রস্তভাবে আপনার স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল,—“তুই দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে থাক্‌, আজ রাত্রে আমার আসা হয় কিনা” এই বলিয়া বাবুদের বলিল,—“তবে আপনারাও আসুন, ঐ রাস্তা দিয়েইত যেতে হবে, আপনারা বাইরে দাঁড়িয়ে থেক,

আমি তাদের ডেকে নিয়ে আস্‌ব। একে একে সকলেই বহির্গত হইল, ভজা চাঁড়াল আপনার আগ্না যষ্ঠী গাছটী লইয়া বাবুদের অগ্রে অগ্রে গমন করিল।

ভজা চাঁড়ালের স্ত্রী গৃহ মধ্য হইতে সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়াছে। বাবুদের আচার ব্যবহার সে অনেক দিন হইতেই জানে, গুণধর স্বামী যে বাবুদের দুষ্কর্ম্মের সহায়তা ক'রে, দশ টাকা উপার্জ্জন করে, তাও সে অনেক দিন হইতেই জানে; কিন্তু ভজা চাঁড়ালের শাসনের গুণে কোন কথাই তার অধরস্ফুট হয় না। তাই ভজা চাঁড়াল নিজের বাড়িতে এই সমস্ত মন্ত্রণা করিতে সাহস করে, তাই বাবুরাও ভজা চাঁড়ালের বাড়িতে কোন কথা কহিতে ভয় করে না, বরঞ্চ যদি কোন দিন ভজহরিকে বাড়িতে না দেখিতে পায়, তাহা হইলে ভজার স্ত্রীকে সমস্ত কথা বলিয়া আসে। ভজা চাঁড়াল কাজকর্ম্ম কিছুই করে না, কেবল মধ্যে মধ্যে লোক দ্যাখান লোকের বাড়িতে রোজ হিসাবে কাজ করিয়া থাকে, নচেৎ বাবুদের অর্থে তার দিনাতিপাত হয়। আজ দুতিন মাস হইল, ভজা কোন পাপ কর্ম্ম করে নাই, কাজে কাজেই তার সংসারে বিশেষ টানাটানি পড়িয়াছে। আজ ভজা চাঁড়ালের স্ত্রী ভাবিল, ভাল কাজেই হোক আর মন্দ কাজেই হোক, বাবুরা মধ্যে মধ্যে ডাকে ব'লেই আমরা দুবেলা দু মুটো খেতে পাই! যাই হোক, কালকে কিছু নিয়ে এলে পর আগে থান কতক কাপড় কিনে নিয়ে আস্‌তে বোলবো, তার পর যা হয় হবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ভজহরির স্ত্রী দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

এদিকে অটলবিহারী, অটলবিহারীর বন্ধু ভজহরি ও তার

ভাগ্নাত্রয় একত্রিত হইয়া এই ঘোর রজনীতে চুপে চুপে চণ্ডাল-পাড়া অতিক্রম করিয়া চলিল। আজ রাত্রে তাহাদের সমস্ত আয়োজন করিতে হইবে, এই ভাবিয়া তাহারা একেবারে হুগলীর মালাপাড়ায় উপস্থিত হইল। দাঁড়ি মাঝিরা সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর রাত্রে একটু সুখে নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময় ভজহরি দ্বারে দ্বারে বিকট চিৎকারে সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করিল। ভজহরি অটলবিহারীর নিকট সকলকেই ডাকিয়া আনিল। মাঝিরা অটবিহারীকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু এত রাত্তিরে কেন গা?"

অটলবিহারী তাহাদের একজনকে চুপি চুপি বলিল,—"দ্যাখ ছোট বাবুর হুকুম, কাল একখানা নৌকায় বর আস্‌বে, সেই নৌকা খানা ডুবিয়ে দিতে হবে, কি বলিস?"

মাঝি অটলের এই কথা শুনিয়া বলিল,—"না বাবু আমার দ্বারা তা হবে না, তাতে যদি আমায় অন্য জমীদারের জমীতে বাস কত্তে হয় তাও ভাল।"

অটলবিহারী তাহাকে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া বলিল,—"শোন, একাজ যদি তুই ক'ত্তে পারিস্ তা হ'লে পঞ্চাশ টাকা পাবি।"

মাঝি উত্তর করিল,—"কি বলেন বাবু পঞ্চাশ টাকার জন্যে কতকগুলো লোককে মেরে ফেল্‌তে হবে? আমার দ্বারা তা হবে না।"

অটলবিহারী পুনরায় বলিল,—"দ্যাখ একশ টাকা পাবি।"

মাঝি তাতেও স্বীকার হইল না। অটল ক্রমে ক্রমে দুই

শত টাকা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিল। ইতর লোক একেবারে দুই শত টাকার লোভ আর পরিত্যাগ করিতে পারিল না, আজ দুইশত টাকার লোভে সে এই নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে বাধ্য হইল। অটলবিহারী মাঝির সহিত অনেক প্রকার মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিল যে তবে দশখানা নৌকা ভাড়া করা হইবে এবং প্রত্যেক নৌকার ভাড়া দুইশত টাকার হিসাবে দেওয়া হইবে।

যাহার সহিত মন্ত্রণা করা হইল, সে মাঝি দিগের মধ্যে এক-জন প্রধান, কাজে কাজেই অন্যান্য সকলে তার কথায় স্বীকৃত হইল। এ বিষয়ে তাহাদের কোন রূপ আশঙ্কা হওয়া দূরে থাক; কোন রূপ দুঃখ হওয়া দূরে থাক, বরঞ্চ এরূপ কথা কহিতে লাগিল যে "মধ্যে মধ্যে এ রকম দু একটা ভাড়া না হ'লে কি চলে? নৌক ডুবিয়ে দেওয়া যাবে, আমরাত আর লোক গুলকে মেরে ফেলতে যাচ্ছি না?"

মাঝিদের মধ্যে একজন বলিল,—"হ্যাগা বাবু এ কাজটা হবে কোথা?"

অটলবিহারী কহিল,—"বর নৌকা ক'রে চাণকের ঘাট থেকে বরাবর ভদ্রেশ্বরের ঘাটে আস্‌বে, তা তোরা এই টুকুর মধ্যে যে খানে সুবিধা পাবি, সেই খানে কাজ সাবাড় করিস্।"

অপর একজন নিকটস্থ হইয়া কহিল,—"বেশ সুধুত বরের নৌক খানি আস্‌বেনা, তার সঙ্গে আরও দু চার খানা আস্‌বেত? কোন লোক না বেশী আস্‌বে?"

অটলবিহারী কহিল,—"তাতে তোদের ক্ষতি কি?"

অটলবিহারীর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই জনৈক বিচক্ষণ মাঝি অন্যান্য মাঝিদিগকে সদর্পে কহিল,—"ওরে ভাই! ডোবা-

বার কায়দা আছে—কস্ত আছে, ডুবিয়ে দিয়ে এমন সরে দাঁড়াব যে আবার লোকে জান্‌তে পার্ব্বে ?"

অটলবিহারী কহিল,—"যার যত খ্যামতা কাল সব জানা যাবে।"

কথায় কথায় রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অটলবিহারী একবার আকাশের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া প্রধান মাঝিকে কহিল,—"দ্যাখ রাত্রি শেষ্‌ হ'য়ে এসেছে, এখন বাড়ি গিয়ে কি ক'র্ব্বো ? তার চেয়ে চল নৌকোর উপর খানিক শুয়ে থাকিগে, তারপর সকাল বেলা খাওয়া দাওয়া ক'রে তোরা নৌক নিয়ে বৈদ্যবাটীর ঘাটে থাক্‌বি, আর আমি বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আস্‌ব, কাজ শেষ হ'লেই হাতে হাতে টাকা, কি বলিস্‌ ?" চতুর অটলবিহারী মাঝিদিগকে নয়ন অন্তরাল করিতে ইচ্ছা করিতেছে না। ইহার কারণ পাছে মাঝিরা এই দুঃসাহসিক পাপ কার্য্য হইতে বিরত হয়, পাছে তাহাদের মতভেদ হয়, পাছে তাহারা এ কার্য্যে অবজ্ঞা প্রকাশ করে, এই নিমিত্ত অটলবিহারী ইচ্ছা করিয়াছে যে যতক্ষণ না কার্য্য শেষ হয়, ততক্ষণ তাহাদের সঙ্গে থাকিবে, তাহাদের প্রলোভিত মনকে উত্তেজিত করিবে। যাহা হোক মাঝিরা অটলবিহারীর বাক্যে স্বীকৃত হইল। সকলে নৌকায় গিয়া শয়ন করিল, কিন্তু কাহার নিদ্রা হইল না, কথাবার্ত্তায় রজনীর অল্প অংশটুকু শেষ হইল।

দেখিতে দেখিতে ঘাট জনতা পূর্ণ হইল, একে একে গ্রামবাসীরা স্নান করিতে আসিতেছে। অটলবিহারী আর অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করিল না, মাঝিদিগকে ডাকিয়া কহিল,—"তোরা তবে শিগ্গির শিগ্গির খাওয়া দাওয়া ক'রে নে।"

মাঝিদিগের এত প্রত্যূষে খাওয়া অভ্যাস নাই, তাহারা কহিল,—"এখন কি খাব বাবু? এত সকাল সকাল আমরা কখন খাই না, তখন সে বৈদ্যবাটী গিয়ে যা হয় তাই হবে।"

অটলবিহারী কহিল,—"তবে একখানা নৌক রেখে সব ছেড়ে দে, আমি টাকা এনে তোদের পেছনে যাচ্চি।" মাঝিরা নৌকা ছাড়িবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। অটলবিহারী আপনার বন্ধু ও ভজা চাঁড়ালকে ডাকিয়া কহিল,—"দ্যাখ যেন ব্যাটারা অন্যমত না করে, তোরা পাঁচজনে পাঁচ খানা নৌকোয় যা।" অটলের কথামত সমস্ত হইল। মাঝিরা একে একে নৌকা ছাড়িল, তরণী তরঙ্গ কোলে হেলিতে দুলিতে বৈদ্যবাটীর ঘাট অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। অটলবিহারী ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ঘাট হইতে জমীদারের বাটী সন্নিকট। অটলবিহারী অনতিবিলম্বে ভবনাথের সহিত মিলিত হইল। ভবনাথ দীনবেশে উপবিষ্ট, ভবনাথের আত্মীয়গণ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা চতুঃপার্শে বসিয়া আছে ও মধ্যে মধ্যে কমলাকান্তের গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। ভবনাথের অন্তর মধ্যে যাহাই থাকুক, কিন্তু বাহিরে তার পিতৃ-শোক-চিহ্ন সমস্তই বিরাজ করিতেছে। ভবনাথের রক্তবর্ণ চক্ষুদুটী এক ভাবে এক দিকে স্থির হইয়া আছে; সে নীরব, সে কাহার সহিত অধিক কথা কহিতেছে না, যাহারা তাহার সহিত কথা কহিতেছে, সে সংক্ষেপে তাহাদিগকে উত্তর প্রদান করিতেছে। অটলবিহারী ভবনাথের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র ভবনাথের চিত্তের বিপর্য্যয় ঘটিল, পিতৃশোক ভুলিয়া গেল, তার অন্তর হইতে প্রজারঞ্জন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য

চিন্তা দূর হইল, সে অবিলম্বে অটলবিহারীকে সঙ্গে করিয়া কক্ষান্তরে গমন করিল। ভবনাথ অটলবিহারীর মুখে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া, রাত্রি মধ্যেই সমস্ত আয়োজন হইয়াছে অবগত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে অটলবিহারীকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। অটলবিহারী কার্য্যতৎপরতা প্রকাশ করিয়া ভবনাথের নিকট অর্থের প্রার্থনা করিল।

ভবনাথ উন্মত্ত ভবনাথ অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিতেছে না, সে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নয়, সে কাজ যে কোন প্রকারে হোক তার অভীষ্ট সিদ্ধি হ'লে হ'ল। টাকা খরচ হোক তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু মধুমতী হস্তান্তর হ'লে তার প্রাণে আঘাত লাগিবে। ভবনাথ আজ সর্ব্বেশ্বর, পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য আজ তার করতলগত, সকলে আজ তার বশীভূত। সে তৎক্ষণাৎ দেওয়ানকে ডাকিয়া তার অর্থের অভাব জানাইল। দেওয়ান ভবনাথের চরিত্র বিষয় বহু দিন হইতে অবগত আছে; ভবনাথের ইঙ্গিত মাত্রেই সে যদি কার্য্য নির্ব্বাহ না করে তাহা হইলে তার অনিষ্টের আশঙ্কা আছে, এই ভাবিয়া বেচারা দ্বিরুক্তি না করিয়া ভবনাথের কথামত অটলবিহারীকে সমস্ত টাকা বুঝাইয়া দিল। অটলবিহারী আর অপেক্ষা করিল না, সে সমস্ত টাকাগুলি যত্ন পূর্ব্বক লইয়া ভবনাথকে কহিল,—"তবে আমি চল্লুম তুমি কিছু ভেবনা।"

ভবনাথ আগ্রহের সহিত কহিল,—"অটল! চুরির কাজটা আজই হবেত?"

অটলবিহারী চিন্তান্বিত হইয়া কহিল,—"তা ভাই ঠিক্ বল্‌তে পারি না, তবে আমি খুব চেষ্টা কর্ব্ব বটে।"

ভবনাথ কহিল,—"আচ্ছা ভাই আজ না পার, কিন্তু দু এক দিনের ভিতর নিয়ে আস্‌তে হবে।"

অটল তাহাতেই স্বীকার হইয়া কহিল,—"নিয়ে এসে রাখবো কোথা?"

ভবনাথ উত্তর করিল,—"কেন? আপাতত আমাদের বাগানে এনে রাখবে, তার চেয়ে আর নির্জ্জন স্বস্থান কোথা পাবে?

অটলবিহারী "আচ্ছা তাই হবে" এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল।

ভবনাথ পুনরায় দেওয়ানকে ডাকিয়া কহিল,—"ত্মাখ, অটল যদি আজ কালের মধ্যে কিছু টাকা চায়, তা হ'লে দিও।" এই বলিয়া ভবনাথ বাড়ির ভিতর গমন করিল।

দেওয়ান ভাবিল যে একি ব্যাপার, অটল আজ এত টাকা নিয়ে গেল, আবার দু এক দিনের মধ্যে তার টাকার দরকার হবে। তবেই দেখছি, জমীদারী আর বেশী দিন থাক্‌বে না, তবে আর কেন? এই অবসরে আমিও যা কিছু ক'রে নিতে পারি।
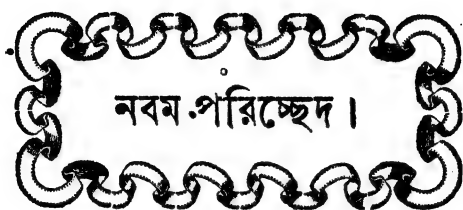
নবম পরিচ্ছেদ।

আশা ভাঙ্গিল।

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই, সূর্য্যদেব পশ্চিম সাগরে অবগাহন করিয়াছেন, সূর্য্যমুখী সূর্য্যবিরহে পশ্চিম মুখেই রহিল, পশ্চিমাকাশ শ্বেত নীল পীত লোহিত ছটায় নয়নমুগ্ধকর ভাতী বিকাশ করিতে লাগিল। ঝুরু ঝুরু স্বরে সান্ধ্যসমীরণ বহিতেছে, বিহঙ্গমচয় পল্লবাশ্রমে বসিয়া সন্ধ্যাদেবীর গুণানুকীর্ত্তন করিতেছে, কুলকামিনীরা প্রদীপ জ্বালিয়া শঙ্খধ্বনি করিতেছে, গ্রাম্য দেবালয়ে মঙ্গলারতি হইতেছে। পরিশ্রমিরা দিক্ দিগন্তর হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিল, শিশু সন্তানেরা সমস্ত দিনের পর পিতাকে দেখিতে পাইয়া আধ আধ স্বরে মহা আনন্দে পিতার গলদেশ বেষ্টন করিল, হতভাগ্য সারাদিন পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াও ধূলি ধূসরিত শিশুটীকে বক্ষে তুলিয়া শিশুর প্রভাত প্রস্ফুটিত অমল কমল বিনিন্দিত বদনকমলে একটী চুম্বন করিয়া সকল ক্লেশ দূর করিল। দারিদ্র্য নিবন্ধন অষ্টপ্রহর পরিশ্রমজনিত ক্ষুৎপিপাসা তার দূরে পলাইল। বিধাতা সকলের ভাগ্যে সমান সুখ লেখেন নি, সকলকেই সমান অবস্থায় রাখেন নি, সকলেই কিছু এই সুখের সন্ধ্যার সুখ ভোগ করিতে পায়না। কেহ হয়ত পরিশ্রান্তে

গৃহে আসিয়া পাদ ধৌতের জন্ত এক বিন্দু জলও পাইতেছে না। কি ক'রে পাবে? তার কলহপ্রিয়া ভার্য্যাটী সকলের সহিত বিবাদ করিয়াছে, সকলকেই কটু উক্তি করিয়াছে, কাজে কাজেই রন্ধন কার্য্য হইতে সকলেই বিরত, সংসারের কোন কার্য্যই করিবে না, অভিমানে সকলেই আপন আপন স্থানে বসিয়া আছে, শ্রীমতিও বিবসনা হইয়া শয্যাপ্রান্তে পড়িয়া আছে। পুত্রশোক-শেল-প্রপীড়িত কোন লোক হয়ত বাড়িতে আসিয়াই শোকান্বিত হইল, পূর্ব্বেকার সমস্ত কথা তার মনে পড়িল। সে ভাবিল,—আহা অন্যদিন এমন সময়ে আমি কত আনন্দিত।

বিষয়ী কি ব্যবসায়ীরাত অহরহই চিন্তান্বিত, নিশ্চিন্ত প্রাণে তারা অতি অল্প সময়ই অতিবাহিত করে। হয় ত তারা কোন ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া সন্ধ্যার সময় বাড়িতে আসিল, বাড়িতে আসিয়াই সংসারের তিলমাত্র বিশৃঙ্খলা দেখিয়া একেবারে সপ্তমে উঠিল। কর্ম্মচারীদিগের সমস্তই সহ্য। যাহারা সমস্ত দিন প্রভু-পদতাড়নায় নয়নজল নয়নে শুখাইয়া অসাধারণ সহিষ্ণুতা শক্তি প্রকাশ করে, তাহাদের সংসারে এমন সময়ে কি ঘটনা হইতে পারে যে তাহাতে অটল অচল, কালাপাহাড় কেরাণী বাবুদের হৃদয় বিচলিত হইবে। তাহাদের শুষ্ক নয়নে জলপ্রপাত করিতে পারে একমাত্র সেই সর্ব্বনিয়ন্তা কাল আর সেই মহামহিম শ্রীযুত প্রভু মহাশয়, যাহার পদ লেহনে সংসার প্রতিপালিত।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা ছবি বিলীন হইল। রাস্তায় লোক জনের চলাচল কমিয়া আসিল, মনুষ্য কোলাহল অতি কম। কিন্তু চন্দ্রবাবুর বাটী আজ জনতাপূর্ণ। মধুমতীর বিবাহ হবে,

সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, একে একে নিমন্ত্রিতগণও আসিয়াছে। ভদ্রেশ্বর ঘাট হইতে বাবুর বাড়ি পর্য্যন্ত সারি সারি আলোকমালায় রাস্তার দুইপার্শ্ব সজ্জিত করা হইয়াছে। বিবাহ আসরটী অতি মনোরম, ঢালা বিছানা, মধ্যস্থলে কারু-খচিত মখমলাসনে বরের বসিবার স্থান হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে সুকোমল উপাধান পড়িয়া আছে, স্থানে স্থানে নানা রঙ্গের পুষ্প সমষ্টী কাচবিনির্ম্মিত পুষ্পাধারে রাখা হইয়াছে। সমস্ত আলোগুলি প্রজ্জ্বলিত করাতে আসরটী ইন্দ্রভুবন সদৃশ বোধ হইতেছে। বাটীর একপার্শ্বে খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিবার মহা আড়ম্বর পড়িয়াছে। অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের জনতায় প্রবেশ করাই দায়। নিমন্ত্রিত কুটম্বিনী অপেক্ষা প্রতিবাসিনীই অধিক। সকলেই বিবাহ দেখিতে আসিয়াছে। কারাবাসিনী অবগুণ্ঠনবতী যুবতীদিগের আজ মহা আনন্দ। আজ তাহারা বাসর আসন অধিকার করিবে, আজ তাহারা প্রাণ খুলিয়া বরের সহিত কথা কহিবে, রহস্য করিবে, বাক্‌চতুরতায় বরকে পরাজিত করিবে। আজ তাহারা বর কন্যাকে একাসনে বসাইয়া রস-পয়োধীর রসতরঙ্গ ছুটাইবে। যুবতীদের যার যত আদি রস মিশ্রিত গান ছড়া ইত্যাদি জানা আছে, এই বেলা সকলেই এক একবার মনে মনে আবৃত্তি করিয়া লইতেছে। সীমন্তিনীদিগের মধ্যে একজন অপরকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"কিলো পার্ব্বিত ?"

সে অমনি ঈষৎ নাকি সুরে যাত্রার দলের ছেলেদের মতন হাত নাড়িয়া একটী গানের এক অংশ গাহিল,—

"ননদী সাপিনী, বিষম বাঘিনী,
কত কথা কয় ছলে।"

গান শুনিয়া সকলেই হাঁসিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল,—"তাইত লো! এরি মধ্যেই যে তোর মুখ খুলেছে? আচ্ছা সেই সময় দ্যাখা যাবে।"

রসিকাটী কহিল,—"খুব দেখো খুব শুনো, কিন্তু ভাই ঠাকুর-ঝিকে ঘরের ভিতর থাকৃতে দিও না।"

অম্নি সকলে এক বাক্যে কহিল,—"না-না তাকে সে ঘরে যেতে দেওয়া হবে না।"

এইরূপে যুবতীদের রহস্য পরিপূরিত অনেক কথা হইতেছে। এদিকে দু চারিটী যুবতীরা একটী ঘরের ভিতর মধুমতীকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত। নিতম্বিনীদের মধ্যে একজন বামহস্তে মধুমতীর চিবুক ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলির সাহায্যে সূক্ষ্ম খড়িকার দ্বারায় চন্দন বিন্দুতে মধুমতীর ললাট খানিকে ধীরে ধীরে চিত্রিত করিতেছে। সকলেই স্থির, কাহার মুখে কথা নাই, সকলেই এক দৃষ্টে মধুমতীর মুখের প্রতি চাহিয়া আছে এবং মনে মনে মধুমতীর বদন চন্দ্রিমার প্রশংসা করিতেছে, মনে মনে চিত্রকারিণীর ধৈর্য্যতাকে ধন্যবাদ দিতেছে। চিত্র-কারিণী এত ধীরভাবে কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে যে, বোধ হয় সে যেন নিশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলিতেছে না, শুদ্ধ দক্ষিণ হস্তটী তার সজ্ঞানতার প্রমাণ দিতেছে। যুবতী পরে পরে চন্দন বিন্দুতে মধুমতীর বদনচন্দ্রিমা সমুজ্জ্বল করিল। অবশেষে ধীরে ধীরে অতি সূক্ষ্মরূপে ললাটমধ্যে একটী খদিরের টিপ পরাইয়া দিল। এতক্ষণের পর নিতম্বিনীরা নিস্তার পাইল, এইবার তাহারা মধুমতীর স্বর্ণ অঙ্গে এক এক খানি স্বর্ণাভরণ পরাইতে আরম্ভ করিল। এই বার তাহারা পরস্পর রহস্য ভঙ্গিমায় কথা

কহিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে একজন মধুমতীকে কহিল,—"দ্যাখ শুভদৃষ্টির সময় বেশ ক'রে চেয়ে দেখো, যেন মুখ নিচু ক'রে থেকোনা।"

অপর একজন হাঁসিতে হাঁসিতে কহিল,—"কি ক'রে চেয়ে দেখ্‌তে হয়, ওকে একবার দেখিয়ে দেনা ভাই, আমরা শুদ্ধ দেখে নিই।"

প্রথমাটীও রহস্য করিয়া কহিল,—"কেন তোমার বের সময় কি শুভদৃষ্টি হয়নি?"

পুনশ্চ দ্বিতীয়াটী কহিল,—"সে ভাই না হওয়ারই মধ্যে।" দ্বিতীয়া রমণীটী হাঁসিতে হাঁসিতে এইরূপ উত্তর করিল বটে, কিন্তু তার একটী দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হইয়াছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবার কারণ যথেষ্ট, গুণধর স্বামিটী ইদানিন্তন নব্য সভ্যসম্প্রদায়-সম্ভূত, সে পিতৃদত্ত বিবাহ নামঞ্জুর করিয়াছে, সরলার সরল প্রণয়টী তার পক্ষে লঘু বোধ হইয়াছে, প্রণয়িনীর মুখে কখন "প্রাণেশ্বর প্রাণবল্লভ" শুনিতে পায় নাই, এই নিমিত্ত তার প্রাণে বিরাগ জন্মিয়াছে, এই নিমিত্ত সে ক্বচিৎ কখন বাড়ির ভিতর আসে, এই নিমিত্তই সে বামী জেলেনীর প্রেম পারাবারের কাণ্ডারী হ'য়ে বসে আছে। যাহা হউক, এইরূপে যুবতীরা মধুমতীকে লক্ষ্য করিয়া স্ব স্ব আত্মকাহিনী বিবৃত করিতে লাগিল। মধুমতীকে আর শুভদৃষ্টির বিষয় কিছু শেখাতে হবে না, এ কার্য্য মধুমতী বহুদিন পূর্ব্বে শেষ করিয়াছে ও অদৃষ্টের ফলাফলও মধুমতী ভোগ করিয়াছে। যুবতীদের বাক্যে মধুমতীর লজ্জা আসিল, অবশেষে সে সে ঘরে আর থাকিতে না পারিয়া কক্ষান্তরে গমন করিল।

বহির্ব্বাটীতে নিমন্ত্রিত গণ সকলেই আসিয়াছে, কিন্তু এখনও বর কিম্বা বরযাত্রীদিগের মধ্যে কেহই আসে নাই। যদিও সুবেশধারী নিমন্ত্রিতগণ বিবাহ সভায় উপবিষ্ট, যদিও চন্দ্রবাবুর ক্ষুদ্র দালানটীতে গ্রাম্য বালকমণ্ডলীদ্বারা স্থানাভাব ঘটিয়াছে, তত্রাচ কিন্তু এক বিহনে সমস্তই ফাঁকা বলিয়া বোধ হইতেছে। বিবাহ আসরে বর না থাকিলে কি আসরের আদর হয়? রাত্রি নয় ঘটিকার সময় বিবাহের লগ্ন স্থির হইয়াছে, কিন্তু আট টা বাজিয়া গেল, এখনও বর আসিয়া পঁহুছিল না। সকলেই ব্যস্ত হইয়াছে, ইহার কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিল না। চন্দ্রবাবুর সমস্ত দিন আহার হয় নাই, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্প্রদান কার্য্য শেষ না হয়, ততক্ষণ তিনি এক গণ্ডুষ জল পর্য্যন্তও খাইতে পারিবেন না। প্রতিবাসীরা চন্দ্রবাবুকে ব্যাকুলিত দেখিয়া কহিল,—"আপনি এত চিন্তিত হ'চ্চেন কেন? যদ্যপি তাঁরা নটার পূর্ব্বে না পহুছিতে পারেন, তা হ'লে সাড়ে এগারটার সময় একটা লগ্ন আছে, না হয় সেই লগ্নতেই বিবাহ হবে।

চন্দ্রবাবু উত্তর করিলেন,—"তোমরা বল্‌ছ সত্য, দেরি হয় তাতে ক্ষতি নেই, কি জান জলপথ বলেই ভয় হয়, বিশেষ আজ কাল গঙ্গায় যে রকম তুফান।"

চন্দ্রবাবুর হৃদয়ে অমঙ্গলের আশঙ্কা আসিয়াছে, তাঁর প্রাণ-পাখিটী এরিই মধ্যে অঘটনের গীতাভিনয় আরম্ভ করিয়াছে।

ক্রমে রাত্রি হইতে লাগিল, বাড়ি সুদ্ধ সকলেই অস্থির। কি আত্মীয়গণ, কি প্রতিবাসীগণ, কি কুটুম্বগণ সকলেই ব্যতি-ব্যস্ত, সকলেরই উদ্বিগ্ন হইয়াছে। কেহ বা একবার ঘাট পর্য্যন্ত দৌড়িয়া যাইতেছে, কেহ বা একখানি নৌকা করিয়া কিঞ্চিৎ

অগ্রসর হইবার ইচ্ছা করিতেছে, অন্যান্য সকলে তাহাকে কহিতেছে যে, "তুমি না হয় একবার তাদের বাড়ি পর্য্যন্ত যাও, তাদের একবার খবর নিয়ে এস, কি জানি তারা যদি ভিন্ন পাত্রী মনস্থ করিয়া থাকে, তা হ'লে আমরাও অন্য পাত্রের অনুসন্ধান করি।"

চন্দ্রবাবু ভাবিতেছেন, এরূপ কখনই হ'তে পারে না, উপেন বাবুর মতন সজ্জন লোক অতি বিরল।"

হায় তাদের আর অগ্রসর হইয়া দেখিতে হইল না! অচিরাৎ এক খানি নৌকা আসিয়া পঁহুছিল। এই নৌকা খানিতে মধুমতীর মাতুল মহাশয় অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁর বাড়িও মণিরামপুর, তিনিও বরযাত্রীদের সঙ্গে আসিতেছিলেন। তিনি দৈব দুর্ঘটনায় সমস্ত বিষয় অবগত আছেন, তাঁর চক্ষের উপর সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। তিনি ঘাটে উঠিয়াই, এই নিদারুণ বার্ত্তা সকলকে অবগত করাইয়া কহিলেন যে "বৈদ্য বাটীর ঘাট পার হ'তে না হ'তে, অপর একখানা নৌকার আঘাতে বরের নৌকা খানি জলমগ্ন হইয়াছে, নৌকায় বর পুরোহিত ইত্যাদি যারা ছিল, তাহাদের কাহার সন্ধান নাই। বর যাত্রীদের চার পাঁচখানি ও অন্যান্য আট দশখানি নৌকা আসিয়া এত ক'রে অনুসন্ধান ক'ল্লে, কিন্তু কাহার সন্ধান পাইল না।" এই সংবাদ শুনিয়া সকলেই হায় হায় করিতে লাগিল। ক্ষণমাত্রেই এই সংবাদ চন্দ্রবাবুর বাটীতে পঁহুছিল।

বাড়িতে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। কি সর্ব্বনাশ! বিধাতার একি বিড়ম্বনা! এই বজ্রসম অসহনীয় বার্ত্তা চন্দ্রবাবুর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র চন্দ্রবাবু জ্ঞানশূন্য হইলেন, তাঁর

মাথা ঘুরিয়া গেল। একে সমস্ত দিন উপবাস, একে পিপাশায় তাঁর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে, তার উপর এই সর্ব্বনাশ! এতে তিনি জ্ঞান রহিত হবেন না ত আর কি হবেন? চন্দ্রবাবু থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতলশায়ী হইবা মাত্র সকলে,—“এ আবার কি! একি সর্ব্বনাশ!” এই বলিয়া চন্দ্রবাবুকে ধরিয়া ফেলিল। চন্দ্রবাবুর চোখে মুখে ও মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে করিতে চন্দ্রবাবুর চৈতন্য হইল। চন্দ্রবাবু কি করিবেন, কি হবে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, চন্দ্রবাবু স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। প্রতিবাসীরা তাঁকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। কেহ বলিলেন,—“আপনি স্থির হোন,—এই রাত্রের মধ্যেই আপনার কন্যার বিবাহ দিয়ে দিচ্চি।”

কেহ বলিতেছেন—“তা বৈকি, বিধি বিড়ম্বনায় এরূপ ঘটেই থাকে, তা বলে কি আর বিবাহ হয় না? তবে দুঃখের বিষয় বটে, তা কি কর্ব্বেন বলুন?”

চন্দ্রবাবু আত্মধিক্কার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—“দেখুন এ সমস্ত আমার দুষ্কর্ম্মের ফল, আমি হুগলীর কমলাকান্ত বাবুকে বঞ্চনা করেই এই প্রতিফল পেলুম।”

গ্রাম্যবাসীর মধ্যে একজন কমলাকান্তের নাম শুনিয়াই কহিল,—“কলমাকান্ত বাবুত কাল রাত্তিরে মারা গেছেন।” চন্দ্রবাবুও পূর্ব্বে এ সংবাদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এক্ষণে হতাশ, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। প্রতিবাসীদিগের মতানুযায়ী অন্য পাত্রের অনুসন্ধান করিবেন কি না এই ভাবিতে লাগিলেন।

অবশেষে চন্দ্রবাবু উপায়ান্তর ভাবিয়া প্রতিবাসীদিগকে

কহিলেন যে, "তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর, আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করোনা।

তাহারা চন্দ্রবাবুর মুখে এই কথা শুনিতে পাইয়াই পরস্পর স্থির করিতে লাগিল। পাত্র অনুসন্ধানে আর দেশ বিদেশ গমন করিতে হইলনা, গ্রামের মধ্যেই একটী সুপাত্র স্থির হইল। পাত্রটী শিক্ষিত ও চরিত্র সম্বন্ধীয় সমস্তই ভাল, কিন্তু পিতৃহীন ও ধনসম্পত্তি কিছুই নাই। তা না থাকুক, তাতে কোন ক্ষতি নাই, এখন চন্দ্রবাবু স্বীকার হ'ন তবেই। চন্দ্রবাবুকে প্রতিবাসীরা আপনাদের মনস্থ পাত্রটীর বাহুল্য প্রকারে গুণ ব্যাখ্যা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, "আমাদের শিবরাম মুখুয্যের ভাই-পোর সঙ্গে দিলে হয় না?"

চন্দ্রবাবু বলিলেন,—"তা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'চ্চো কি? তোমরা যা ভাল বিবেচনা কর, তাই কর।"

গ্রামস্থ মহোদয় গণ চন্দ্রবাবুর মুখে এই কথা শুনিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিবার মনস্থ করিলেন। লগ্ন থাকুক আর নাই থাকুক, এই রাত্রের মধ্যেই বিবাহ দিতে হবে।

শিবরাম মুখুয্যের ভ্রাতষ্পুত্রটীকে অনুসন্ধান করিতে আর কোথাও গমন করিতে হইল না, সেও এই নিমন্ত্রিত সভায় উপস্থিত। শিবরাম মুখুয্যে আজ মহা আনন্দিত, আজ তিনি বিনা ব্যয়ে ভ্রাতষ্পুত্রের বিবাহ দিবেন, তাঁর মতন সাধারণ লোকের সহিত তাঁর কুটুম্বিতা হ'চ্চে না, ভদ্রেশ্বরের চন্দ্রবাবুর কন্যার সহিত আজ তাঁর ভ্রাতষ্পুত্রের বিবাহ। শিবরাম মুখুয্যে চন্দ্রবাবুর জনৈক আত্মীয়কে ডাকিয়া কহিলেন,—"কি বলেন, যদি বিবাহ দেওয়া মত হয়, তা হ'লে আর অপেক্ষা কেন? হয়

আপনারা এই খানেই মেয়েদের ডেকে গায়ে একটু হলুদ ছুঁইয়ে নিন, আর তা না হয় বাড়ি থেকে সমস্ত কাজ শেষ ক'রে আগা যাগ, বাড়িত আর দূর দূরান্তরে নয় যে দেরি হবে?"

শিবরাম মুখুয্যের এই কথা গুলি সকলেরই কর্ণে প্রবেশ করিল, সকলেই এক বাক্যে উত্তর করিলেন,—"সেই ভাল বর বাড়ি থেকে আসুগ না গা, বাড়িত বেশী দূরে নয়?"

নিমন্ত্রিতের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "হ্যাঁ মহাশয়! যে বাড়িতে বিবাহের কথা হ'চ্চে সে বাড়িটী কত দূর?" অনৈক প্রতিবাসী উত্তর করিলেন,—এই খান তিনেক বাড়ির পর।" শিবরাম বাবু ভ্রাতস্পুত্রটী ডাকিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন। কার্য্যতৎপরতার নিমিত্ত চন্দ্রবাবুর আত্মীয় দু একটী ও সেই সঙ্গে গমন করিল।

অন্দর মহলে মহা কোলাহল। তারাসুন্দরী দেবীর মস্তকে বজ্রাঘাত হইয়াছে। ধীরেনকে তিনি আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, যথেষ্ট ভাল বাসেন। আজ তিনি এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া অকুলপাথারে ভাসিতেছেন, তিনি আকুল প্রাণে মধুমতীর অদৃষ্টলিপির বিষয় চিন্তা করিয়া দরদর ধারায় হৃদয় প্লাবিত করিতেছেন। এই সর্ব্বনাশে চন্দ্রবাবুর মাতা ঠাকুরাণী ও মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন পুরনারীরা সকলেই এই দুর্ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করিতেছে, সকলেই হায় হায় করিতেছে।

মধুমতী উন্মাদিনী, মধুমতী ছিন্ন লতিকাসমা ধরাশায়িতা, তার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মধুমতী একটী নিভৃত কক্ষের মধ্যে পড়িয়া আছে, হতভাগিনীর হৃদয়ে যেন শত শত বৃশ্চিকে দংশন করিয়াছে, হতভাগিনী অসহ্য যন্ত্রণায় ধরা বিলুণ্ঠিতা হইয়া

এ পাশ ওপাশ করিতেছে। হায় আজ তার কি সর্ব্বনাশ! আজ তার হরিষে বিষাদ!! ক্ষণকাল পূর্ব্বে তার প্রাণে কত আনন্দ হ'য়েছিল, আজ তার আশা পূর্ণ হবে, আজ সে অমিয় সরসে অবগাহন ক'রে বিরহ জনিত সকল জ্বালা নিবারণ ক'র্ব্বে। কোথায় আজ তার প্রাণ পাখীটী সুমেরুসম বিশাল তরু কোঠরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুরন্ত কীরাতের কঠোর হস্তে নিস্তার পাবে, তা না হ'য়ে হায় বিহঙ্গিনীটী ঘোর দাবানলে নিপতিত হইয়া আত্ম হারাইল। মধুমতীর হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে, তার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, তার মুখের আর সে ভাব নাই, সে জ্যোতি নাই, নয়ন জলে তার মুখ ভাসিয়া যাইতেছে, মণিহারা ফণিনীসমা তার বিনান বেণী ধূলি ধুসরিতা, নাগিনীর হৃদয় উচ্ছাস মধুমতীর নাসাপথ অবলম্বন করিয়াছে। হায়! আজ সে তার সুখ নিশা অবসান দেখিয়া অকুল পাথারে ভাসিতেছে! প্রেম ভিখারিনী চাতকিনী প্রেমসুধা পাবার আশায় পূর্ণিমার পূর্ণ শশধরের উদ্দেশে আশা পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক পূর্ণগগণে উড্ডীয়মান হইল, কিন্তু হায় হতভাগিনীর আর আশাপূর্ণ হইল না! ষোল কলাপূর্ণ শশধর আর সমুখিত হইল না, কাল মেঘ হ'তেই আজ সে হতাশ প্রাণে পড়িয়া রহিল।

তৈল অভাবে প্রদীপটী নির্ব্বাণ হইয়াছে, ঘর অন্ধকার, মধুমতী একা পড়িয়া আছে, তার নয়ন জলে হর্ম্ম্যতলে ভাসিয়া যাইতেছে। দরজার সম্মুখে গুটিকতক স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে এই বিপদ ব্যাপারের আন্দোলন করিতে করিতে একটী স্ত্রীলোক কহিল,—"তা যা হোক বাপু মেয়েটার এখন বে হ'য়ে গেলে বাঁচা যায়।" আর একটী স্ত্রীলোক কহিল,—"চলনা দেখে আসি

গায়ে হলুদ দেওয়া হ'ল কি না। স্ত্রীলোকদিগের এই কথাকটী মধুমতীর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র যেন তার মস্তকে এক কালে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, এই কথা কয়টী যেন তার কোমল হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। মধুমতী চকিতা বনকুরঙ্গিনীর ন্যায় একচিত্তে স্ত্রীলোকদিগের কথাগুলি আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিল,—কথাগুলির মর্ম্মগ্রহণ করিল, সে এই কথাগুলির যতই অন্তস্পর্শ করিতেছে, ততই তার অন্তর তরঙ্গ উদ্বেলিত হইতেছে। মধুমতী বুঝিতে পারিয়াছে যে সে অপর হস্তে নীতা হইবে, ক্ষণকাল পরেই তাকে অন্য তরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। হায়! সে যে তার প্রাণের ধীরেন ব্যতিত আর কাকেও জানেনা, সে যে স্থির করিয়াছে ধীরেন ব্যতিত আর কাকেও বিবাহ করিবেনা, সে যে মনে মনে ধীরেনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, প্রাণ মন সমস্তই সমর্পণ করিয়াছে। হায়! আজ আবার সে কি প্রকারে অন্যের নিকট আত্মবিক্রয় করিবে? আজ আবার সে কি ক'রে তার অমূল্য রত্নটী অপরের হস্তে সমর্পণ করিবে? মধুমতীর ক্ষুদ্র হৃদয়াসনটী ধীরেন্দ্রনাথের আয়ত্তাধীন, এক্ষণে সে আসনে আর কাহার অধিকার নাই, মধুমতী সেই নির্ম্মল আসনটীতে আর কাহাকেও বসাইয়া কলঙ্কিত করিবে না।

স্ত্রীলোকগুলি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলে পর মধুমতী ধীরে ধীরে কক্ষের বাহিরে আসিল। সে বাহিরে আসিয়া দেখিল যে সকলেরই মুখে এককথা। কি সর্ব্বনাশ! তবে কি সত্য সত্যই আজ মধুমতীর আশা বিপরীত কার্য্য হইবে? সত্য সত্যই কি আজ ধীরেনের পরিবর্ত্তে অন্যের সহিত মধুমতীর বিবাহ হইবে? কখনই না, সরলার হৃদয়ে একবার যে ছবি অঙ্কিত

হইয়াছে, প্রাণ থাকিতে সে ছবির পরিবর্ত্তে অন্য ছবি আর প্রতিফলিত হইবে না! সে হৃদয়ে অন্য ছবি আর স্থান পাইবেনা!! সে হৃদয়ে অন্য ছবির আর আদর হইবে না!!! মধুমতী কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। সে এক্ষণে মহা চিন্তায় নিমগ্ন, সে এক্ষণে এই বিপদ সঙ্কুল দুঃখ পারাবার হইতে পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন করিলে লাগিল। এক্ষণে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না, সে অবিচলিত ভাবে চিন্তার দূর-ব্যাপী মরুভূমিতে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

অবিলম্বে অন্তঃপুরে শঙ্খধ্বনি হইল, বহির্ব্বাটীতে বর আসি-য়াছে, কুলকামিনীরা ত্রস্ত হইয়া অন্তরাল হইতে নব বরের নবরূপ দর্শন করিতে গমন করিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে "বরের আর দেখ্‌ব কি? প্রাণকৃষ্ণকে আবার দেখব কি? তাকেত চিরকাল দেখে আস্‌ছি।" মধুমতীর সর্ব্বনাশ, অচিরাৎ তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে, অচিরাৎ প্রাণকৃষ্ণের সহিত তার বিবাহ হইবে। মধুমতী উপায়ান্তর ভাবিয়া স্থির করিল,— "তবে আর কেন, যার যা ইচ্ছা, সে তাই করুক, আমার কাজ আমি করি।" এই ভাবিয়া সে সকলের অলক্ষিতে একেবারে খিড়্‌কির ঘাটে উপস্থিত হইল। সে ঘাটে আসিয়াই একবার পুষ্করিণীর প্রতি স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিল। মধুমতী অর্দ্ধ উলঙ্গিনীবেশা, তার বস্ত্রাঞ্চলে ধুলায় লুটাইয়া যাইতেছে, বিনান বেণী লম্বিতভাবে পৃষ্ঠোপরি পড়িয়া আছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস নিপতিত হওয়ায় অনাচ্ছাদিত বক্ষ খানি উর্দ্ধাধভাবে চালিত হইতেছে। চক্ষে এক বিন্দু জল নাই, তার চক্ষু হইতে যেন আগুণের কণা বাহির হইতেছে, সর্ব্বশরীর হইতে উত্তাপ

নির্গত হইতেছে। মধুমতীকে দেখিলে প্রাণে আতঙ্ক হয়, এই মধ্যরাত্রিতে মধুমতী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তার বাহ্য-জ্ঞান নাই, তার হস্তস্থিত কজ্জললতাটী মাটিতে পড়িয়া গেল, কজ্জললতাটী নিপতিত হওয়ায় ঝণাৎ করিয়া একটী শব্দও হইল, কিন্তু সে শব্দ মধুমতীর কর্ণে প্রবেশ করিল না।

মধুমতীর আজ জীবন পরিত্যাগ করিতে বাসনা হইয়াছে, সে তার প্রাণেশ্বরের বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবে না, সে ধীরেন ব্যতিত অন্য পুরুষকে স্পর্শ করিবে না, ধীরেন ব্যতিত অন্য কেহ তার প্রেমের অধিকারী হইতে পারিবে না। হায়! বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আজ শোকাকুলা অবলা ঘোর অন্ধকার রাত্রে একাকিনী ধীরে ধীরে জলে অবতরণ করিল। মধুমতী একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, অসঙ্খ্য তারকাচয় যেন তার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া ক্ষীণালোকে মিটি মিটি চোক্ষে তার প্রতি চাহিয়া আছে, সে একবার পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থিত বিটপীচয়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তারাও যেন তার এই ভয়াবহ কাণ্ডে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, পুষ্করিণীর কমল নিচয় যেন এই বিপদপাতে বিষাদবদনে শোক-সাগরে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। মধমতী ভাবিল,—হায়! আমার প্রাণের ধীরেন যে অবস্থায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, আমিও সেই ভাবেই প্রাণ বিসর্জ্জন করি, মনের দুঃখ মনেই রইল, একবার তার সঙ্গে দ্যাখা হ'ল না। আবার ভাবিল, আমায় সে ভাল বাসে আমার জন্য হয়ত সে দাঁড়িয়ে আছে, যাই যাই আমিও তার সঙ্গে দ্যাখা করিগে।

স্বভাবত ঘাটের উভয় পার্শ্বে জল অধিক থাকে, উভয় পার্শ্বে

দ্বিগুণ জল অবস্থান করে। মধুমতীও তাহাই ভাবিল, ধীরে ধীরে ঘাটের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। হায়! আজ সে উন্মাদিনী, প্রাণ পরিত্যাগ ব্যতীত আর তার অন্য উপায় নাই, আজ সে প্রাণ বিসর্জ্জনে সমুদ্যত! হায়! হতভাগিনী একবার প্রাণপতির নাম উচ্চারণ করিয়া জলে ঝম্প প্রদান করিল। স্থির জল আলোড়িত হইল, তরঙ্গাঘাতে কমলচয় পুনঃ পুনঃ ডুবিতে ও ভাসিতে লাগিল, এই ভীষণ ব্যাপার সমুত্থিত লহরীচয় কূলস্পর্শ করিয়া ছি ছি শব্দে বিধাতার বিধি-লিপিকে ধিক্কার করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মধুমতী পুষ্করিণীর অতল জলে নিমগ্ন হইল। গম্ভীরভাবে রজনীদেবী সমস্তই নিরীক্ষণ করিলেন। এই ঘোর রজনীতে তরু পল্লবাদি সমস্তই স্থির, দেখিতে দেখিতে পুষ্করিণীর জলও স্থির হইয়া আসিল। হায়! আজ কি সর্ব্বনাশ! সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া মধুমতী জলমগ্না হইল। এ ভীষণ ব্যাপার কেহই দেখিতে পাইল না, এ ভীষণ ব্যাপার কাহার চক্ষে নিপতিত হইল না!!

বহির্ব্বাটিতে বর বরাসনে উপবিষ্ট। চন্দ্রবাবুর আত্মীয় ও প্রতিবাসীরা কাল বিলম্বের প্রয়োজন নাই ভাবিয়া চন্দ্রবাবুকে কহিল,—"তবে আর অপেক্ষা করা কেন? বরকে বাড়ির ভিতর নিয়ে যাওয়া হোক্ না? চন্দ্রবাবু সকলের কথানুযায়ী আসন হইতে বর লইয়া যাইবার অনুমতি গ্রহণ করিলেন। নাপিতও কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়া বরকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল, কুলকামিনীরাও শঙ্খধ্বনি করিল, কিন্তু মধুমতী কৈ? তাকেত কেহ দেখিতে পাইতেছে না। একে একে সকল ঘর অনুসন্ধান করা হইল, তন্ন তন্ন করিয়া বাটির সকল স্থানই দেখা হইল,

তত্রাচ তার সন্ধান পাওয়া গেল না। তারাসুন্দরীর হৃদয়ে অমঙ্গলের চিন্তা আসিল। তিনি মধুমতীর হৃদয়ভাব জানেন, মধুমতী মানিনী, হতভাগিনী না জানি ধীরেন-শোকে কি সর্ব্ব-নাশই ঘটাইয়াছে। তারাসুন্দরী দেবী ক্ষিপ্তা পাগলিনীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য! এমন সময় মধুমতী কোথায় গেল? মধুমতীর জন্য স্ত্রী পুরুষ, সকলেই ব্যতিব্যস্ত, সকলেই তার অনুসন্ধানে বিব্রত। আলো লইয়া রাস্তাঘাট সমস্তই অনুসন্ধান করা হইল, তন্ন তন্ন করিয়া গ্রামের সমস্ত বাটীতে খোঁজা হইল, তত্রাচ মধুমতীর সন্ধান পাওয়া গেল না।

আজ তারাসুন্দরী প্রমুখাৎ মধুমতীর চরিতাবলী প্রকাশিত হইল, ধীরেন ব্যতীত আর কাহাকেও মধুমতীর বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই, এ কথাও সকলে জানিতে পারিল। এতক্ষণের পর সকলের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল, যে মধুমতী আত্মবিনাশ করিয়াছে, আর না হয় অন্য কোথাও চলিয়া গিয়াছে। আর কেহ স্থির থাকিতে পারিল না, চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল। নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাগান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন আলোয় আলোকিত হইল। ক্ষণ-কাল পূর্ব্বে সকলেই মধুমতীকে দেখিয়াছে, আর এই অল্পকাল মধ্যেই, বিশেষ এই অন্ধকারে সে আর কোথায় যাইবে। এই ভাবিয়া কতকগুলি লোক চন্দ্রবাবুর খিড়কির বাগানে আলো লইয়া গমন করিল। নিমেষের মধ্যে এই ক্ষুদ্র বাগানের চতু-র্দ্দিক অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। শেষ তাহারা পুষ্করিণীর চতুস্পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিল, কি জানি যদি অভিমানে জলেই প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া

থাকে। এই ভাবিয়া তাহারা বড় বড় মশাল জ্বালিয়া বিশেষ-রূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কিছুই দেখিতে পাইল না। ক্ষণ-কাল পরে মধুমতী যে জলমগ্না হইয়াছে, অচিরাৎ তাহা সকলে বুঝিতে পারিল। ঘাটের উপরে রৌপ্য নির্ম্মিত কজ্জল লতাটী পড়িয়া আছে। সকলে ভাবিল, কজ্জললতা মধুমতীর হস্তে ছিল, ঘাটে আসিল কি ক'রে? ইহা চিন্তার বিষয় বটে। ক্ষণ-কাল পূর্ব্বে সকলেই এই কজ্জললতা মধুমতীর হস্তে দেখিয়াছে. কিন্তু এক্ষণে সেই কজ্জললতা ঘাটে পড়িয়া। তবে নিশ্চয়ই মধুমতী জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে মধু-মতী ঘাটের যে পার্শ্বে ঝম্প প্রদান করিয়াছিল, সে পার্শ্বটীও সকলের নয়নগোচর হইল, সে পার্শ্বের জল ও পদ্মপত্রগুলি ছিন্ন ভিন্ন ভাবে রহিয়াছে, দেখিলে বোধ হয় এই অগম জলে ক্ষণ-পূর্ব্বে কি এক প্রলয় কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। আর সন্দেহ নাই, নিশ্চয়ই মধুমতী জলে নিমগ্না হইয়াছে, নিশ্চয়ই মধুমতী এই এই স্থানে আছে। আর কেহ স্থির থাকিতে পারিল না, সক-লেই জলে অবতরণ করিল।

এই ঘোর রজনীতে, এই ঘোর অন্ধকারে সকলেই প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া মধুমতীর অনুসন্ধানে জলে অবতরণ করিল। হায়! এই শুভবিবাহে—শুভ কার্য্যে চন্দ্রবাবুর আত্মীয়-বর্গ ও পুরজনেরা কোথায় আনন্দসাগরে ভাসিয়া যাইবে, তাহা না হইয়া আজ বিধি বিড়ম্বনায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। তারা-সুন্দরী দেবী ও চন্দ্রবাবুর মাতাঠাকুরাণীর হৃদয়বিদারক রোদন ধ্বনিতে সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। চন্দ্রবাবুর বাটিতে আজ সুখউৎসের পরিবর্ত্তে শোকপ্রস্রবণের ধারা বহিতে লাগিল।

পাঠক! এই বিপদে আমাদের শিবরাম মুখুয্যেও মহা বিপদে পতিত হইলেন। তিনি এক্ষণে হতাশ, তিনি এক্ষণে কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। শিবরাম মুখুয্যের ততদূর অর্থবল নাই যে তিনি এই রাত্রেই অন্যত্র ভ্রাতষ্পুত্রের বিবাহ দেন। যাহাহউক, ইহাতে শিবরামের অভিমান নাই, এ বিষয়ে শিবরামকে কেহ নিন্দা করিতে পারিবে না, বরঞ্চ তিনি চন্দ্রবাবুর উপকারার্থেই অগ্রসর হইয়াছিলেন! শিবরাম বাবুর আত্মীয়েরা তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে কহিল,—"তার আর কি হবে? তার জন্যে তুমি ভাবচ কি? এতে তোমার অখ্যাতি হবে না, প্রাণকৃষ্ণকে বাড়ী গিয়ে কাপড় ছাড়্‌তে বলগে।" শিবরাম মুখুয্যে আত্মীয়দিগের প্রবোধ বাক্যে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি তাঁর ভ্রাতষ্পুত্রটিকে সঙ্গে করিয়া বাড়িতে ফিরিয়া গেলেন। তাঁর আজ আশা ভঙ্গ হইল, তিনি তাঁর ভ্রাতষ্পুত্রটিকে মধুমতীর সঙ্গে বিবাহ দিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু বিধি তায় সাধে বাদ সাধিলেন। এমন সুযোগ পাইয়াও তিনি সফলকাম হইতে পারিলেন না। এ বিষয়ে প্রাণকৃষ্ণেরও লজ্জা আসিবার কথা—অভিমান হইবার কথা, কিন্তু তার তিলমাত্র লজ্জা আসিল না, বরঞ্চ ইহাতে তার সম্পূর্ণ দুঃখ হইয়াছে। চন্দ্রবাবুর বিপদে সে সম বিপদ ভাবিয়া সে ত্রস্তভাবে বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পুনরায় চন্দ্রবাবুর বাটিতে উপস্থিত হইল, সেও মধুমতীর অন্বেষণে ব্যগ্র।

চন্দ্রবাবুর খিড়কিতে লোকে লোকারণ্য। এত রাত্রি হইয়াছে, নিমন্ত্রিতগণের ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই, সকলে পুষ্করিণীর পার্শে মধুমতীর অন্বেষণের উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। যাহারা জলে

নামিয়াছিল, অবিরাম পরিশ্রমে তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সকলে নিরাশ হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে মধুমতী এই পুষ্করিণীর মধ্যেই আছে। অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে আর তাহাদের তিলমাত্র ইচ্ছা নাই। কেহ কেহ বলিতেছে যে জলে নামিয়া অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই, যদি যথার্থই জলে মগ্ন হইয়া থাকে, তাহাহইলে সে এতক্ষণ আর জীবিত নাই, ক্ষণপরেই তার মৃতদেহ ভাসিয়া উঠিবে। অপর একজন বলিল,—"তা কি হ'তে পারে, চুপ ক'রে কি থাকা যেতে পারে? তার চেয়ে জেলে ডেকে একবার জাল নাবিয়ে দ্যাখা ভাল।"

এই পরামর্শে সকলেই স্বীকার হইল। অবিলম্বে জাল লইয়া চার পাঁচটী ধীবর আসিয়া উপস্থিত হইল। একে একে জাল লইয়া তাহারা জলে অবতরণ করিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ পুষ্করিণীর এক প্রান্ত হইতে জাল টানিয়া পদ্মমূল উৎপাটন করিতে করিতে অপর প্রান্তে উপস্থিত হইতে লাগিল, তত্রাচ মধুমতীর নিদর্শন পাওয়া গেল না, কিন্তু মধুমতী যে জলমগ্না হইয়াছে, এ বিশ্বাস কাহারও দূরীভূত হইল না, বরঞ্চ জাল মধ্যে মৃণাল বিজড়িত মধুমতীর পরিধৃত বস্ত্রখানি দেখিতে পাওয়ায় তাহাদের বিশ্বাস-ভিত্তির মূলদেশ অধিকতর দৃঢ় হইল। হায়! যদিও চন্দ্রবাবু, কি চন্দ্রবাবুর পুরজনেরা মনকে প্রবোধ দিয়া রাখিতেছিলেন, কিন্তু আর না, আর তাঁহারা চিত্তবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, সকলে উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, সকলেই শোকে অধীর হইলেন। তারাসুন্দরী ও চন্দ্রবাবুর মাতাঠাকুরাণী মধুমতীর বস্ত্রখানি দেখিতে পাইয়া পুষ্করিণীর পার্শ্বে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে তাঁহাদের

আদরের মধুমতী আজ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। তাঁহারা "মধুমতী মধুমতী" শব্দে গগন বিদীর্ণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না, তাঁহাদের রোদনে সকলেরই চক্ষে জল আসিল—সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল—সকলেই শোকে অধীর হইল। হায় বিধি! তুই কি সুখের বাদী? তোর একি বিধি? তুই আজ এই শুভদিনে অশুভ ঘটন ঘটালি? সকলকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিলি? আজ তোর এই অখণ্ডনীয় লেখনী বলে গ্যাখ দেখি পুষ্করিণী পার্শ্বে কত নর নারী হা হা শব্দে রোদন করিতেছে। ধিক্ তোর লেখনীকে?

ধীবরেরা বহু পরিশ্রমে বহু আয়াসেও জলমধ্যে মধুমতীর সন্ধান পাইল না। আর উপায় নাই, এক্ষণে সকলেই হতাশ। মধুমতী নিশ্চয়ই জলমগ্ন হইয়াছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যখন তার দেহ পাওয়া গেল না, এত চেষ্টাতেও যখন তার সন্ধান পাওয়া গেল না তখন আর বৃথা পরিশ্রমে প্রয়োজন নাই, ক্ষণকাল পরেই তার দেহ ভাসিয়া উঠিবে। এক্ষণে সকলেই নিশ্চেষ্টভাবে পুষ্করিণীর পার্শ্বে বসিয়া রহিল, সকলে আকুল নয়নে পুষ্করিণীর প্রতি চাহিয়া রহিল। পুষ্করিণীর স্থানে স্থানে শেহালার দল ভাসমান থাকায় সময়ে সময়ে সকলের প্রাণকে বিচলিত করিতেছে। সকলে একাগ্র চিত্তে শেহালার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া শেষ হতাশ প্রাণে আবার ঘাটে আসিয়া বসিতেছে। হায়! এত চেষ্টা বিফল, মধুমতীর সন্ধান পাওয়া গেল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

কারাবাস।

রাত্রি তিনটা বাজিয়াছে, কাহার শাড়া শব্দ নাই, গঙ্গায় ভাটা পড়িয়াছে, মাংসলোভী শৃগাল দুএকটী চড়ার উপর বিচরণ করিতেছে, আর স্বভাবসিদ্ধ বিকট চিৎকারে দিক্‌সকল প্রতি-ধ্বনিত করিতেছে। প্রভাত হইলেই বৈদ্যবাটির হাট বসিবে, এ নিমিত্ত ফলমূল ও শাক শবজী পরিপূরিত দুএক খানি নৌকা গঙ্গাবক্ষ ভেদ করিয়া তর তর বেগে ঘাট অভিমুখে গমন করি-তেছে। একের পর একটী, ক্রমান্বয়ে তরঙ্গনিচয় কুলস্পর্শ করিয়া ছুপ ছাপ শব্দ করিতেছে। ভদ্রেশ্বরের সন্নিকট গরিটির ঘাট, গরিটির ঘাটটী স্বভাবতঃ অপরিষ্কার, দিবাভাগে অল্প লোকেই এই ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া থাকে। ঘাটের উভয়পার্শ্বে নিবীড় বন, এই বনেতে বন্যবরাহ ইত্যাদি বনচর পশুরই আবাস স্থান। এই বনের এক পার্শ্বে শবদাহ হইয়া থাকে, চতুর্দ্দিকে অস্থিকঙ্কালে পরিপূর্ণ। বড় বড় বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ সকল শাখা প্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক স্থানটিকে দিবারাত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া আছে, ঘন কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষনিচয় এই ক্ষুদ্র বনে বিস্তৃত থাকায় মনুষ্য পক্ষে দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে। এই ঘোর রাত্রে—এই

দুর্গম বনমধ্যে মধ্যে মধ্যে পেচক শব্দে ও বন্যবরাহ আদির পদচারণে মনুষ্য মাত্রেরই ভীতি উৎপাদন করিতেছে। এই নির্জ্জন নিবীড় অরণ্য মধ্যে এখন আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইতেছে না, পেচক পেচকী আহার অন্বেষণ হইতে বিরত হইয়া স্থিরভাবে শাখাগ্রে বসিয়া আছে। শৃগালগণ অরণ্যপ্রান্তে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে বনমধ্য স্থলটী লক্ষ্য করিতেছে। শৃগালদিগকে দেখিলেই বোধ হয় তাহারা যেন তাহাদের কোন অভীষ্ট পূরণের অবসর খুঁজিতেছে, মধ্যে মধ্যে এক এক পদ অগ্রসর হইতেছে, আবার পরক্ষণেই ভয়চকিত প্রাণে ফিরিয়া আসিতেছে। বন্যবরাহগণ প্রাণভয়ে ঝোপের অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছে। বনমধ্যভাগটী নিস্তব্ধ, কোন শাড়া শব্দ নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ হইতে শুষ্কপত্র প্রপাতের খুস খাস শব্দ হইতেছে ও আর একটী কি ঠুক ঠাক করিতেছে। অকস্মাৎ বনমধ্যস্থলটী আলোয় আলোকিত হইল, দপ্ করিয়া কি যেন একটা জলিয়া উঠিল, ভয়ে শৃগালগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল, বন্যবরাহেরা আচম্বিতে বনমধ্যে আলো দেখিয়া স্বস্থান হইতে পলাইতে আরম্ভ করিল, শাখাসীন বিহঙ্গমকুল এককালে কিচির মিচির করিয়া ডাকিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সে আলো নিবিয়া গেল, যে অন্ধকার সেই অন্ধকার, কিছুই লক্ষ্য হয় না। একেত পাদপচয়ের শাখা সকল পরস্পর সংলগ্ন থাকায় দৃষ্টিভেদ হইতেছে না, তাতে আবার লতামণ্ডলী ঘনপত্রে তরুশির ঘনাচ্ছাদিত করিয়াছে, আকাশের নক্ষত্রটী পর্য্যন্তও পরিদৃশ্যমান হইতেছে না।

আলো নিবিয়া গেল, সমস্ত নিস্তব্ধ হইল। কেবল এই ঘোর রজনীতে বনমধ্যে ঝিল্লীরব ও নদীতীরে কুলনাশিনীর কুলকুল

শব্দ ব্যতীত এখন আর কিছুই শোনা যাইতেছে না। অচিরাৎ বনমধ্য হইতে খস্‌খস্‌ শব্দ হইতে লাগিল। শব্দটী ক্রমে ক্রমে নদীতীরাভিমুখে অগ্রসর হইল, শব্দটী অতি ধীর, এই শব্দটিকে মনুষ্য পদশব্দ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না, এ শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বোধ হয় কে যেন অতি ধীরে ধীরে শুষ্ক পত্রিকায় পদবিক্ষেপ করিয়া গমন করিতেছে। এত রাত্রে এই নিবিড় অরণ্য মধ্য হইতে মনুষ্যের পদশব্দ শোনা যাইতেছে কেন? এমন সাহসিক পুরুষ কে যে, এত রাত্রে এই দুর্গম বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। স্বভাবতঃ দিনের বেলাই কেহ এই বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস করে না, আর এই রাত্রে কার এমন কি প্রয়োজন হইল, যে সে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া এই করাল কালসদনে প্রবেশ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বন হইতে একটী মনুষ্য বাহির হইল, মনুষ্যটী ধীরে ধীরে দু এক পদ অবতরণ করিল। তাহাকে দেখিলেই প্রাণে আতঙ্ক হয়, তার পরিধানে কৌপিন বস্ত্র, হস্তে একগাছি যষ্টি, আকার অতি ভীষণ। তাহাকে দেখিলেই সাক্ষাৎ যম বলিয়া অনুমিত হয়। যদি কেহ এইরূপ ঘোর রাত্রিতে ইহাকে বন হইতে বাহিরে আসিতে দেখিতে পায়, তা হ'লে বোধ হয় তৎক্ষণাৎ তাহার আতঙ্কে প্রাণ বাহির হয়। লোকটী নদীতীরে একটী বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিল। গঙ্গায় একখানি ছোটো নৌকা যাইতে দেখিয়া সে একদৃষ্টে নৌকাখানির প্রতি চাহিয়া রহিল। নৌকাখানি যখন ক্রমে ক্রমে নয়নের অন্তরাল হইল—তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি যখন ঘোর তম ভেদ করিতে অক্ষম হইল, তখন সে ভূমি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড লইয়া বনমধ্যে নিক্ষেপ

করিল। দেখিতে দেখিতে বন হইতে যমদূত আকারে একে একে আরও আট দশটী লোক বাহির হইল। কি ব্যাপার? এদের উদ্দেশ্য কি? এরা কি অভিপ্রায়ে এই রাত্রে ঘোর নিবিড় বন মধ্যে অবস্থান করিতেছিল?

নদীতীরে একখানি ক্ষুদ্র জেলে ডিঙ্গী বাঁধা আছে। একে একে সকলে হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক ডিঙ্গীর উপর উঠিয়া সকলে এক একখানি দাঁড় হস্তে করিল। কিন্তু একজন এখনও উঠে নাই, সে চড়ায় দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে কি দেখিতেছে। অন্যান্য সকলে নৌকা হইতে তাহাকে কহিল,—"কিরে কি দেখ্‌চিস্?"

সে কহিল,—"চড়ার উপর একটা লোক পড়ে রয়েছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র সকলে চমকিত হইল, সকলেই পুনরায় নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া একে একে সেই স্থানে গমন করিল। তাহারা দেখিল যে একটী লোক উলঙ্গাবস্থায় পড়িয় আছে। সকলের মনে সন্দেহ হইল, সকলেই মনে মনে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল, তাহাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তাহারা মনে করিল যে, কোন দুষ্টলোক হয়ত আমাদের দুরভিসন্ধি জানিবার নিমিত্ত ছল করিয়া পড়িয়া আছে।

পাঠক! ইহাদের চিন্তা করিবার কারণ আছে, অমঙ্গলের আশঙ্কারও কারণ আছে, এত রাত্রে এই বনের ভিতর আসিবারও উদ্দেশ্য আছে। ইহারা একদল দস্যু, এই গ্রামের শেষ সীমায় ইহাদের বসবাস ও দস্যুবৃত্তিই ইহাদের উপজীবিকা। আজ ইহারা বৈদ্যবাটির বিখ্যাত বোসেদের বাটিতে পদার্পণ করিয়াছিল। শুভলগ্নে—শুভদৃষ্টি নিক্ষেপে বোসেদের ভাণ্ডার শূন্য করিয়াছে বলিয়া আজ ইহারা এই রাত্রে—এই দুর্গম অরণ্য মধ্যে

প্রবেশ করিয়াছিল। অপহৃত অর্থ এই বনের মধ্যে পুতিয়া রাখিয়াছে। ইহারা ভাবিয়াছিল যে নিশীথে এই বনের মধ্যে আমরা আমাদের কার্য্য সমাধা করিলাম, কেহই জানিতে পারিল না, আবার কিয়দ্দিবস পরে এই সমস্ত অর্থ স্বস্থানে লইয়া যাইব। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের মনে দারুণ সন্দেহ হইল, এই লোকটাকে দেখিয়া তাহাদের বিস্ময় জন্মিল। কেহ ভাবিল, এটী মৃতদেহ জলে ভাসিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সকলে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে জীবিত। দস্যুদিগের অনুমান হইল যে জলমগ্ন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এখনও মরে নাই, এখনও চেষ্টা করিলে বাঁচিতে পারে। এক্ষণে ইহার জীবন দস্যুদিগের হাতে, রাখিলে রাখিতে পারে, মারিলেও মারিতে পারে। শেষ কথাটী দস্যু-দিগের হৃদয়ে উপস্থিত হইল, দস্যুরা ইহাকে মারিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিল। মারিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়,—এখনও যখন তার জীবন রহিয়াছে,—সে যখন সুস্পষ্টরূপে চাহিয়া আছে, তখন অবশ্যই তার জ্ঞান আছে,—অবশ্যই সে আমাদিগকে দস্যু বলিয়া স্থির করিয়াছে, অবশ্যই সে আমাদের উপস্থিত কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছে। অতএব যদি ইহাকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়া যাই, তাহলে আমাদের অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে, তাহলে আমরা অতি শীঘ্র ধরা পড়িব। অনন্তর আর ভাবিবার প্রয়োজন নাই, ইহাকে কোনরূপে মারিয়া ফেলা উচিত। সকলের কথা এক হইল,—সকলের মত এক হইল,—সকলে স্থির করিল, ইহাকে মারিয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়া হউক।

দস্যুদিগের মধ্যে একজন তার ভীমযষ্ঠি উত্তোলন করিল। হায়! হতভাগ্য চড়ার উপর পড়িয়া দস্যুদিগের সমস্ত কথা

বার্ত্তা শুনিতে পাইতেছে! যদিও সে মৃতবৎ, তবুও তার জ্ঞান আছে, কিন্তু তার কথা কহিবার ক্ষমতা নাই! সে এক্ষণে দেখিল মরণ সন্নিকট, সাক্ষাৎ শমন তার শিয়রে উপস্থিত। তার শরীর শিথিল, হস্ত পদ অবশ, সে বাক্‌শক্তি রহিত! হায় এক্ষণে সে কি উপায়ে ইহাদের হস্ত হইতে নিস্তার পায়, কি উপায়ে সে তার জীবন রক্ষা করে! বিপন্ন ব্যক্তির ঈশ্বর সহায়, দয়াল পরমেশ তার হৃদয়ে একটু বল দিলেন, দয়াল তার অবশ হস্ত দুটীকে একত্রিত করিয়া দিলেন! দস্যু তার মস্তকে যেমন যষ্টির আঘাত করিবার উদ্যোগ করিল, অমনি সে প্রাণভয়ে প্রাণপণে যোড়হাত করিয়া কাতরভাবে তার প্রাণভিক্ষা করিল। দস্যুর হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, দস্যু আর আঘাত করিতে পারিল না।

দস্যুর হৃদয়ে দয়া! ইহা অতি আশ্চর্য্য, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। নিরস বৃক্ষে কখন উপবৃক্ষ জন্মাইতে পারে না, মরুভূমে কখন জলের আশা করা যাইতে পারে না। পাঠক! ইহারা দস্যু সত্য, কিন্তু ইহারা সচরাচর দস্যুদিগের ন্যায় নির্দ্দয় নয়। যদিও ইহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরাও দস্যু ছিল,—যদিও দস্যুবৃত্তিই ইহাদিগের জীবিকা, কিন্তু ইহাদিগের দলপতি একজন বিবেচক। দলপতির নাম রমানাথ সরকার, রমানাথ জনসাধারণের নিকট সরকার উপাধিতেই বিখ্যাত। রমানাথ বাল্যকাল হইতে লেখা পড়া শিক্ষা করে নাই, আজীবন সে দস্যুসহবাসেই কাটাইল, দস্যুবৃত্তি দ্বারা সে গরিটীর মধ্যে একজন সঙ্গতিসম্পন্ন লোক হইয়া উঠিয়াছে। দরিদ্রের দুঃখ মোচনের নিমিত্ত সে সময়ে সময়ে অনেক অর্থব্যয়ও করিয়া থাকে। এই দস্যুদল রমানাথের বশতাপন্ন, রমানাথের অসা-

ধারণ বুদ্ধি বলে এ পর্য্যন্ত তাহারা কোন বিপদে পতিত হয় নাই, এপর্য্যন্ত তাহারা রাজদণ্ড উপভোগ করে নাই—এ পর্য্যন্ত তাহাদের দস্যু বলিয়া কেহ জানিতে পারে নাই। রমানাথ নিজেও একজন অসীম বলশালী, সে সকল প্রকার খেলা জানে, সে দস্যুবৃত্তিতে সুনিপুণ। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে কোথাও দস্যুদলের সঙ্গে ডাকাতি করিতে যায় নাই। রমানাথ আপন অসীম ক্ষমতায়, অসীম বুদ্ধিচাতুর্য্যে দস্যুদিগের সর্দ্দার হইয়াছে,—দস্যুদিগকে আপন বশে রাখিয়াছে। এই দস্যুদল রমানাথের বিনানুমতিতে, যখন ইচ্ছা তখন, কিম্বা যার তার বাড়িতে ডাকাতি করিতে পায় না। অর্থের অভাব হইলেই রমানাথ দস্যুদিগকে দস্যু কার্য্যে নিয়োজিত করে। দুষ্ট কিম্বা কৃপণ ধনী মাত্রেই রমানাথ সর্দ্দারের দল কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া থাকে। রমানাথ সর্ব্বদা আপন দলস্থ দস্যুদিগকে এই উপদেশ দিয়া থাকে যে, আপন কার্য্যের সুবিধার জন্য কাহার গৃহে অগ্নি প্রদান করিও না, সতীর সতীত্ব নষ্ট করিও না, বৃদ্ধ, রোগী, শিশু কিম্বা অবলার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিও না, এবং কখন কাহারও প্রাণ বিনাশ করিও না। ফল কথা, যদি সহজে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার ত ভাল, নচেৎ ফিরিয়া আসিবে। দস্যুদলও রমানাথের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এ পর্য্যন্ত তাহারা সর্দ্দারের মতবিরুদ্ধ কোন কার্য্য করে নাই, রমানাথের বুদ্ধি কৌশলে তাহারা বিনা আয়াসে কার্য্য উদ্ধার করিয়া থাকে। এই দস্যুবৃত্তিতে এ পর্য্যন্ত তাহারা রক্ত দর্শন করে নাই। কাজে কাজেই সাধারণ দস্যুদিগের সহিত ইহাদের তুলনা করা যাইতে পারে না, এবং ইহারা সাধারণ দস্যুদিগের ন্যায় নির্দ্দয় নহে।

যাহা হউক, এই দস্যুদলস্থ যে ব্যক্তি ধরাশায়িতের প্রাণ বিনাশে উদ্যত হইয়াছিল, সে এক্ষণে স্থির, তার হাতের লাঠি হাতেই রহিল। তাহাকে নিস্তব্ধ ভাবে থাকিতে দেখিয়া অপর একজন কহিল, –"কিরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?"

সে কহিল,—"না ভাই মেরে ফেলা হবে না, ওই দ্যাখ হাত যোড় ক'চ্চে।"

অপরাপর দস্যুরা অগ্রসর হইয়া দেখিল,—সকলেরই দয়া উদয় হইল, প্রাণ বিনাশ করিতে আর কাহারও ইচ্ছা হইল না। উভয় সঙ্কট, তাকে প্রাণে বিনষ্ট করিতেও ইচ্ছা হইতেছে না, অথচ এখানে সজীব অবস্থায় রাখিয়া যাইতেও পারিতেছে না। দস্যুদিগের মধ্যে একজন কহিল, "দ্যাখ একে আমাদের আড্ডায় নিয়ে চল, যদি বাঁচেত, সেই খানে রেখে দেওয়া যাবে, আর মরেত ফেলে দেওয়া যাবে।" অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে এই কথাই স্থির হইল। হতভাগ্যের হৃদয়ে জীবনের আশা আসিল, অবিলম্বে সকলে ধরাধরি করিয়া নৌকার উপর তুলিল। দস্যুরা একে একে দাঁড় লইয়া বহিতে আরম্ভ করিল। দস্যুরা দাঁড় বাহিতে বাহিতে উপস্থিত বিপন্ন ব্যক্তির জীবন প্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। একজন আসিয়া তাহার উদরের উপর পা চাপাইয়া দিতেই নাক মুখ দিয়া কথঞ্চিত জল বাহির হইল। বলীয়ান দস্যু এইবার তাহাকে উত্তোলন করিল, আপন মস্তকোপরি তাহাকে সংরক্ষিত করিয়া সজোরে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। নৌকা টলমল করিতেছে, তবু নিস্তার নাই। ক্ষণকাল এরূপ করাতে জলমগ্ন রোগীর উদরস্থ সমস্ত জল মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। দস্যু ধীরে ধীরে পুনরায় রোগীকে

শোয়াইয়া রাখিল। এতক্ষণের পর রোগী কথঞ্চিত সুস্থ হইয়াছে, এতক্ষণের পর রোগীর কথা কহিবার ক্ষমতা আসিয়াছে। আগুণের তাপ দিতে পারিলেই ভাল হইত, কিন্তু এক্ষণেত সে সুবিধা আর নাই। তা না হোক, দস্যুরা দেখিল যে রোগী অনেক সুস্থ হইয়াছে, এইবার দ্যাখা যাক্ যদি কথা কহিতে পারে। এই ভাবিয়া একটী দস্যু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার বাড়ি কোথায় ?"

রোগী অতি ক্ষীণ স্বরে উত্তর করিল,—"মণিরামপুর।"

দস্যু। তোমার নাম কি ?

রোগী। ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

দস্যু। বামুন ?

রোগী। হ্যাঁ।

দস্যু। জলে ডুবলে কি ক'রে ?

রোগী। আমি বে ক'ত্তে আস্‌ছিলুম, এক খানা নৌকার ধাক্কায় আমাদের নৌকা ডুবে যায়।

দস্যু। কখন ?

রোগী। সন্ধ্যার পর।

দস্যু। তুমি কোথায় বে ক'ত্তে যাচ্ছিলে ?

রোগী। ভদ্রেশ্বরে চন্দ্রবাবুর বাড়ি।

দস্যু। নৌকায় আর লোক ছিল না ?

রোগী। ছিল বৈকি ? তোমাদের কাছে কাপড় নেই ?

দস্যু। দিচ্চি।

এই বলিয়া দস্যু ডিঙ্গীর খোল হইতে থানকতক কাপড় বাহির করিয়া আপনারাও এক এক খানি পরিধান করিল ও

তাহাকেও একখানি পরাইয়া দিল। ডিঙ্গির মধ্যে দু একখানি অধিক কাপড় থাকে তাই রক্ষা।

পাঠক! এই হতভাগ্য যুবক আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত ধীরেন্দ্রনাথ। ধীরেন্দ্রনাথের এই বিপদে নিপতিত হইবার কারণ সকলেই অবগত আছেন, অটলবিহারী কর্ত্তৃক যে তার এই বিপদ, তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তবে এই মাত্র বলি, অটলবিহারী যে ধীরেন্দ্রনাথের প্রাণবিনাশের সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা পূর্ণ হয় নাই। ধীরেন্দ্রনাথের প্রাণবিনাশ হেতু অটলবিহারী যে সমস্ত কৌশল করিয়াছিল, তাহা সমস্তই বিফল হইয়াছে, নৌকা খানি ডুবাইয়া দেওয়ার পর অটলবিহারী আর ধীরেনকে দেখিতে পায় নাই। সে ভাবিয়াছিল যে, 'ধীরেন একেবারে মরিয়া ভাসিবে, কিন্তু ধীরেন অপূর্ব্ব সন্তরণ কৌশলে ও ঈশ্বরানুগ্রহে আজ গরিটীর ঘাটে জীবন প্রাপ্ত হইল। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বিধিবিরুদ্ধ কোন কার্য্যই হয় না। ঈশ্বর যাহাকে মারিবেন, তাহাকে কেহ কোন প্রকারেই রক্ষা করিতে পারিবে না, আবার ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করিবেন, তাহাকে কেহ কোন প্রকারেই মারিতে পারিবে না, ধীরেন্দ্রনাথই ইহার নিদর্শন স্বরূপ, তা না হ'লে ধীরেন্দ্রনাথ যে স্থানে পড়িয়াছিল, বিবেচনা কর পুনরায় জোয়ার আসিলে নিশ্চই তার মৃত্যুর সম্ভাবনা, আবার দস্যু হৃদয়ে যদি দয়ার সঞ্চার না হইত, তাহা হইলেও অচিরাৎ ধীরেনকে শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্যরূপে পরিণত হইতে হইত।

যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে ধীরেন্দ্রনাথের শরীরে বল আসিল, তার বসিতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু সে বসিতে পারিতেছে না,

তার মাথা ঘুরিয়া পড়িতেছে। দস্যুরা নানা বিষয় চিন্তা করিতেছে, তাঁহারা ভাবিতেছে যে, ভদ্রেশ্বরের চন্দ্রবাবুকে আমরা চিনি, তিনি অতি ভদ্রলোক, কিন্তু তা বলেত ইহাকে ছাড়িতে পারা যায় না, কি জানি কার মনে কি আছে, যদি আমাদের সমস্ত কথা প্রকাশ করে। আবার ভাবিতেছে যে ইহাকে যে আমাদের আড্ডায় নিয়ে যাচ্চি, যদি সর্দ্দার রাগ করে, তা হ'লেও ত মহাবিপদ। পরস্পর এই ভাবিতেছে ও আপনা আপনি অস্পষ্ট স্বরে মন্ত্রণা করিতেছে। দস্যুদের মধ্যে একজন ধীরেন্দ্রনাথকে কহিল,—"তুমি যে বোল্‌চো আমি বামুন তা তোমার পৈতে কৈ?"

ধীরেন্দ্রনাথ উত্তর করিল,—"জলে ভেসে গেছে, তা যাক্ কোমরে এক গাছা বাঁধা আছে।"

দস্যু পুনরায় বলিল,—"তোমায় আমরা যা ব'ল্‌বো, তুমি তা ক'র্ত্তে পার্ব্বে?"

ধীরেন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞতার সহিত কহিল,—"তোমরা আমার জীবনদাতা, তোমরা আমার হিতকারী, এ জীবনে তোমাদের ঋণ পরিশোধ ক'র্ত্তে পার্ব্বে না, এ জীবনে তোমাদের অমতে কোন কাজই ক'র্ত্তে পার্ব্বোনা, তোমরা আমায় যা ব'ল্‌বে, আমি তাই ক'র্ব্বো।"

দস্যু। তুমি আর বাড়িতে যেতে পার্ব্বে না, চিরকাল আমাদের আড্ডা বাড়িতে থাকতে হবে।

ধীরেন। থাক্‌ব।

দস্যু। আমাদের সর্দ্দারকে তোমার পরিচয় দিও না, তুমি যে জলে ডুবে গেছলে একথাও ব'লোনা।

ধীরেন। কোনকথা জিজ্ঞাসা ক'ল্লে কি বল্‌বো ?

দস্যু। ব'লো যে আমার কেউ নেই, বৈদ্যবাটীর থানায় আমি থাকি। তারপর যা বল্‌বার আমরা বলবো, তুমি আমাদের কথায় বেশ মিল ক'রে কথা ক'য়ো।

ধীরেন। আচ্ছা আমি তাই বোল্‌বো, কিন্তু তাতেত আমার কোন বিপদ নেই ?

দস্যু। কিছু নয়। তাতে তোমার ভাল বই মন্দ হবে না। এস তোমার চোখ বেঁধে দিই।

ধীরেন। কেন ?

দস্যু। দরকার আছে।

ধীরেন্দ্রনাথ দস্যুদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল, রাস্তা ঘাট পাছে আমি চিনিতে পারি, এই নিমিত্তই দস্যু আমার চোখ বাঁধিতে ইচ্ছা করিতেছে, নচেৎ ইহাদের উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে ? তা না হ'লে ইহারা আমায় মৃত্যুমুখ হ'তে রক্ষা করিয়া পুনরায় কি মারিবার ইচ্ছা করিয়াছে ? না, তা কখন হ'তে পারে না। যাহা হউক, ইহারা আমার জীবনদাতা, ইহাদের নিকট আমি চিরকালের তরে ঋণে আবদ্ধ, ইহারা যা ইচ্ছা তাই করুক, আমার কোন আপত্য নাই। এই ভাবিয়া ধীরেন্দ্রনাথ স্থির হইয়া রহিল, দস্যুও বস্ত্র দ্বারা ধীরেনের চক্ষু বন্ধন করিল। অপরাপর দস্যুরা রাত্রি শেষ হ'তে না হ'তে পঁহুছিতে হবে, এই ভাবিয়া ঝুপ ঝাপ শব্দে দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল, নৌকা দ্বিগুণবেগে তরঙ্গ ভেদ করিয়া গমন করিতে লাগিল। দস্যুরা যখন গরিটী ঘাট হইতে নৌকা ছাড়ে, তখনই প্রায় জোয়ার আরম্ভ হইয়াছিল, এক্ষণে গঙ্গায় ভরন্ত জোয়ার। দস্যুরা স্বল্প

পরিশ্রমেই, চন্দননগরের ঘাটে নৌকা লাগাইল। ধীরেন্দ্রনাথকে ধরাধরি করিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করাইল, ধীরেন দাঁড়াইতে পারিতেছে না, তার পা কাঁপিতেছে, দুই জন দস্যু ধীরেনের দুই পার্শ্ব ধরিয়া রহিল, ধীরেনও তাহাদের গলবেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। ধীরেন পা ফেলিতেছে সত্য, কিন্তু সকল সময়ে ধরাস্পর্শও করিতেছে না।

এখনও অন্ধকার, রাস্তায় লোক জন নাই। দস্যুরা সদর রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া গলি রাস্তায় গমন করিতে লাগিল। গ্রাম নিস্তব্ধ, সকলেই নিদ্রাভিভূত, কেবল দু একটী গৃহস্থের বাড়ি হইতে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি ও স্থানে স্থানে কুক্কুরের চিৎকার শোনা যাইতেছে। চন্দননগরের এই গলি রাস্তার উপর এক খানি বাগান আছে, বাগানটী রাস্তা হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও গঙ্গাতীর ব্যতিত অপর তিন দিক্ উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। রাস্তার দিকে একটী দরজা আছে, অহরহ সেখানে প্রহরী নিযুক্ত, বাগানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। বাগানের মধ্যে একটী সাধারণতঃ পুষ্করিণী ও একখানি দ্বিতল বাটী, এতদ্ভিন্ন চতুর্দ্দিকে আম জাম কাঁঠাল ইত্যাদি বৃক্ষে পরিপূর্ণ। গঙ্গাতীর হইতে বাগানে প্রবেশ করিবার পথ থাকিতেও দস্যুরা গ্রাম্য পথ দিয়া প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিল। বাগানের দ্বারে উপস্থিত হইয়া "বলদেব বলদেব" বলিয়া দুইবার ডাকিল। বলদেব দ্বারের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র গৃহে বসিয়াছিল, সে দস্যুদিগের স্বর বুঝিতে পারিয়াই তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এদিক্ দিয়ে যে ?"

দস্যুরা উত্তর করিল,—"এর পর শুনো।"

বলদেবের বুঝিতে আর বাকি রহিল না, সে দেখিল যে ইহার সঙ্গে একটী অপরিচিত যুবক রহিয়াছে, বিশেষ ইহার আবার চক্ষু আবদ্ধ করা। অবশ্যই ইহাকে কোন গুপ্ত পথ দ্যাখান হইবেনা ও কোন বিষয় জানান হইবেনা, এই ভাবিয়া সে ইঙ্গিতাকারে কহিল যে সর্দ্দার ভোরের বেলা আস্‌বে। দস্যুরা ধীরেন্দ্রনাথকে লইয়া একেবারে বাগান বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। এতক্ষণের পর ধীরেন্দ্রনাথের বন্ধন মোচন হইল, ধীরেন চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল যে সে একটী অন্দর মহলের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু কোন গৃহে আলো নাই, জনমানবের শাড়া শব্দ নাই। একটী দস্যু ঝনাৎ করিয়া একটী ঘরের দরজা খুলিল, পরে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া গৃহের বাহিরে আনিল। দস্যুরা প্রাঙ্গনস্থ কূপ হইতে জল উত্তোলন করিয়া হস্ত পদ প্রক্ষালনান্তে কতকগুলি কাষ্ঠ আনয়ন করিল। অগ্নি সংযোগে কাষ্ঠগুলিকে প্রজ্বলিত করিয়া ধীরেন্দ্রনাথকে পার্শ্বে উপবেশন করাইল এবং সকলে মিলিয়া ধীরেনের সর্ব্বাঙ্গে অগ্নির উত্তাপ দিতে আরম্ভ করিল।

ধীরেন্দ্রনাথ মনমধ্যে এরূপ আশা করে নাই যে দস্যুরা তাহার প্রতি এতাদৃশ ব্যবহার করিবে। জলমগ্ন হেতু ধীরেনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়াছিল, শীতে সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছিল, গাত্রচর্ম্ম বিবর্ণভাবে কুঞ্চিত হইয়াছিল। এক্ষণে অগ্নির উত্তাপে তার দেহে বল আসিল, শীতল শোণিত উত্তপ্ত হইয়া শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, ধীরেন দস্যু কৃপায় এক্ষণে যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইল। দস্যুরা ধীরেনের সঙ্গে নানা প্রকার কথা কহিতেছে, এমন সময়ে বাহির হইতে একটা

লোক আসিয়া কহিল যে,—"সর্দ্দার এসেছে।" দস্যুরা এই কথা শুনিবামাত্র ধীরেনকে কহিল—"ঠাকুর! তবে তুমি এইখানে খানিক ব'সে থাক, আমরা একবার সর্দ্দারের কাছ থেকে আসি।" এই বলিয়া একজনকে ধীরেনের প্রহরী স্বরূপ রাখিয়া অপরাপর সকলে বহির্ব্বাটীতে গমন করিল। ধীরেন্দ্রনাথ এক্ষণে দেখিল যে, ভোর হইয়াছে, অন্দর মহলটী অন্ধকূপ সদৃশ, তাই এখন সুস্পষ্ট আলো দেখা যাইতেছে না; তত্রাচ এখন আর দীপালোকে প্রয়োজন নাই। ধীরেন্দ্রনাথ প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। উর্দ্ধ দিকে চাহিয়া দেখিল, বাড়িটী দ্বিতল, তাই পার্শ্বস্থ বৃক্ষ চুড়া পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ধীরেন ভাবিল, এত বড় বাড়িটা, কিন্তু একটীও লোক নাই, লোকের মধ্যে এই দস্যুরা, ইহার কারণ কি? এই ভাবিয়া উপস্থিত সেই দস্যুটীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ বাড়িটী কার?"

দস্যু উত্তর করিল,—আমাদের সর্দ্দারের বাড়ি?"

ধীরেন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমাদের সর্দ্দারের নাম কি?" আর এটা কোন গ্রাম?"

এবার দস্যু আর কোন উত্তর করিল না, ক্ষণকালে নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল,—"এর জবাব আমি দিতে পার্ব্বো না।"

ধীরেন ভাবিল, "এটী যদি সর্দ্দারের বাড়ি হয়, তা হ'লেত সর্দ্দার নিতান্ত সামান্য লোক নয়, নিশ্চয় সে একজন ধনী। যাহা হউক, শীঘ্রই আমি তাকে দেখ্‌তে পাব, শীঘ্রই দস্যুরা আমাকে সর্দ্দারের কাছে নিয়ে যাবে।"

ধীরেন এইরূপ নানা বিষয় ভাবিতেছে, এমন সময় একজন আসিয়া ধীরেনকে কহিল,—"তুমি আমার সঙ্গে এস, তোমাকে

সর্দ্দারের কাছে যেতে হবে।” ধীরেন্দ্রনাথ ত্রস্ত হইয়া দস্যুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। ধীরেন বহির্ব্বাটীর দালানে আসিয়া দেখিল যে, একটী পঞ্জাবী পরিচিত দস্যুদলে পরিবেষ্টিত হইয়া একটী সুসজ্জিত গৃহমধ্যে বসিয়া আছে। ধীরেন্দ্রনাথ এই পঞ্জাবীটীকে সর্দ্দার বলিয়াই স্থির করিল। পাঠক! এই পঞ্জাবীটীই আমাদের রমানাথ সরকার। ধীরেনের দ্বারা পাছে ভবিষ্যতে কোন বিপদ ঘটে কিম্বা ধীরেন পাছে তাহাকে চিনিতে পারে, এই ভাবিয়া সুচতুর রমানাথ আত্মভাব গোপন পূর্ব্বক পঞ্জাবীবেশে বসিয়া আছে, এবং পঞ্জাবী ভাষাতেই দস্যু দিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। রমানাথ ধীরেনের সঙ্গেও যে সমস্ত কথা কহিল, তাহাও পঞ্জাবী ভাষাতে। চাল চলন ও কথাবার্ত্তায় ধীরেন্দ্রনাথ রমানাথকে একজন পঞ্জাবী বলিয়াই বিবেচনা করিল। এক্ষণে পাঠক পাঠিকার সুবিধার নিমিত্ত রমানাথ ও অপরাপরের কথাবার্ত্তা বাঙ্গালা ভাষাতেই লেখা হইল।

রমানাথ ধীরেনকে দেখিবা মাত্রেই ভাবিল, সে যেন ইহাকে কোথায় দেখিয়াছে। রমানাথ ধীরেনকে জিজ্ঞাসা করিল,—“তোমার নাম কি?”

ধীরেন দস্যুদিগের কথামত উত্তর করিল,—“আমার নাম শামাপদ চট্টোপাধ্যায়।”

রমানাথ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—“তোমার পিতার নাম কি?”

ধীরেন এইবার মহাচিন্তায় নিপতিত, সে পিতার নাম পরিবর্ত্তন করে কি প্রকারে। ধীরেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

রমানাথ কোন উত্তর না পাইয়া কহিল,—"চুপ ক'রে রইলে যে ?"

ধীরেন অনন্যোপায় হইয়া উত্তর করিল,—"তোমাদের কাছে বিশেষ পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি না, কারণ তোমরা দস্যু, আমি থানার লোক, আমি তোমাদের শত্রু, আমায় যখন তোমরা ধ'রে নিয়ে এসেছ, তখন যা ইচ্ছা তাই ক'ত্তে পার, আমার পরিচয় নেবার কোন প্রয়োজন নাই। ধীরেন্দ্রনাথের এবম্বিধ উত্তরে দস্যুপতি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"পরিচয় দিতে তোমার আপত্য কি ?"

ধীরেন উত্তর করিল,—"আপত্য যথেষ্ট, পরিচয় দিলে পাছে তাহাদের কোন বিপট ঘটে।"

দস্যুপতি ধীরেন্দ্রনাথের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল, সে ভাবিল যুবক পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হইয়াছে, যুবক ভাবিয়াছে, দস্যুরা পরিচয় পাইলেই আমার পিতামাতার সর্ব্বনাশ করিবে। ভাল পরিচয়ের আর প্রয়োজন নাই, কিন্তু যুবক অতি সুচতুর, ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না এবং ইহাকে অতি সাবধানে রাখিতে হইবে, কারণ ইহার দ্বারা আমাদের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এই ভাবিয়া দস্যুপতি দস্যুদিগকে কহিল,—"দ্যাখ একে তোমরা খুব সাবধানে রাখবে" পরে ধীরেন্দ্রনাথকে কহিল,—"তোমাকে চিরকাল বাড়ির ভিতর থাকিতে হইবে, বাহির বাড়িতে আসিতে কিম্বা ছাদের উপর উঠিতে পারিবে না।"

দলপতির আদেশ গুলি ধীরেনের পক্ষে নূতন নহে, সে এ বাড়িতে আসিবার পূর্ব্বেই এ আদেশ অবগত হইয়াছে, সে

বহুক্ষণ পূর্ব্বে স্থির করিয়াছে যে আজীবন তাকে কারাবাসীর মত থাকিতে হইবে। একজন দস্যু ধীরেন্দ্রনাথকে কহিল,—"ঠাকুর তবে বাড়ির ভিতর চল, খাওয়া দাওয়ার যোগাড় ক'র্ব্বেত চল।" এই বলিয়া দস্যু বাঁড়ির ভিতর গমন করিল, ধীরেন্দ্রনাথও ভাবিতে ভাবিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। দস্যু যে দরজা দিয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল, ধীরেন সে দ্বারটি লক্ষ্য করেনাই, যদিও সে এই ক্ষণপূর্ব্বে সেই দ্বার দিয়া বহির্ব্বাটি আসিয়াছিল, কিন্তু তার চিত্তচাঞ্চল্য হেতু সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছে, সে অন্দর মহল ও বাহির মহলের মধ্যস্থ একটী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সে মনে করিয়াছে যে এই গৃহের ভিতর দিয়া বুঝি ভিতর বাড়িতে যাইতে হয়।

ধীরেন যে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে সে গৃহ হইতে দস্যুদিগের সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায়। সে গৃহটী উপস্থিত সভা-গৃহের পার্শ্বে। ধীরেন যে গৃহে প্রবেশ করিয়াছে তাহা দস্যু-পতি কিম্বা দস্যুদলের কেহ দেখিতে পায় নাই। তাহারা এক্ষণে নিঃশঙ্কচিত্তে কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন আর ভাষার পরিবর্ত্তন নাই, এখন সকলেই বাঙ্গালা ভাষাতে কথা কহিতেছে। দস্যুপতি দস্যুদিগকে কহিল,—"দ্যাখ কাল রাত জাগার দরুণ আমার শরীর বড় অসুস্থ হয়েছে, আমি এক্ষণি বাড়ি যাব; তোমরা যদি সব বাড়ি যেতে ইচ্ছা কর ত যাও, আবার সন্ধ্যার সময় এস।

দস্যু। আপনি রাত জাগ লেন কেন?

দস্যুপতি। শুদ্ধ রাত জাগা নয়, আবার খাওয়া হয় নাই।

দস্যু। কেন?

দস্যু নিরব, আর তাহাদের মুখে কথা নাই, তারা বাড়ির খবর দিয়ে আস্‌তে পারে, কিন্তু দিয়ে আস্‌তে পারে না, ধীরেনের ও এ আশা করা বৃথা। দস্যুদিগের মধ্যে একজন কহিল,—"ঠাকুর সে সব বিষয় এক সময় বিবেচনা করা যাবে, এখন তুমি কাপড় ছাড়্‌বেত এস।" এই বলিয়া দস্যু ধীরেনকে লইয়া বাড়ির ভিতর গমন করিল, ধীরেনও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এত-ক্ষণের পর ধীরেন্দ্রনাথ প্রকৃত কারাবদ্ধ হইল। অনুক্ষণ দুইজন প্রহরী তার নিকটে থাকিবে, তাহাকে বাহিরে আসিতে দেওয়া হইবে না। ধীরেন ব্রাহ্মণ, দস্যুদিগের সুবিধা, আর তাহাদের রন্ধন করিতে হইবে না, ধীরেন রাঁধিলেই সকলে খাইতে পারিবে? কাজে কাজেই মাজ হইতে ধীরেনকে রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আমি কোথায়?

ভবনাথের আজ মহাআনন্দ, তার ইচ্ছামত সমস্ত কাজই হ'য়েছে। আজ সে আর বাড়িতে নাই, প্রাতঃকাল হতেই সে বাগানে আছে। উদ্যান বাটী আজ উৎসব ব্যাপারে পরিপূর্ণ। আজ ভবনাথ পিতৃবিয়োগ যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছে, বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে সুরাপানে উন্মত্ত। সন্ধ্যা হইতে আর বাকি নাই। উদ্যান বাটীর সম্মুখেই একটী বৃহৎ পুষ্করিণী, চারিদিকে বেল, জুঁই, গোলাপ ফুল ফুটিয়াছে। পুষ্করিণীর চারি কোনে চারিটী চম্পাক বৃক্ষ, চম্পক বৃক্ষের তলায় এক একটী শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত অর্দ্ধ উলঙ্গিনীবেশা বিদ্যাধরী বঙ্কিমনয়নে স্থিরদৃষ্টে পুষ্করিণীর প্রতি চাহিয়া আছে। দিনমনিকে অস্তগত দেখিয়া মৃণালিনী মৃণালসনে যেন বিষাদে শত অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। বিষাদিনীর বিষাদ ভাব সন্দর্শন করিয়া মধুপায়ী ভ্রমরকুল আর অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছেনা। অলিকুল সন্ধ্যা সমাগম দেখিয়া এক একবার পুষ্করিণীর পর পার পর্য্যন্ত যাইতেছে আবার ব্যাকুল প্রাণে কমলিনীর নিকট আসিয়া গুন গুন স্বরে কি বলিতেছে। বোধ করি বিরহ ব্যাকুলা

প্রণয়িনীর নিকট প্রিয় সম্ভাষণে বিদায় প্রার্থনা করিতেছে, তাই বিরহিনীও ভাব ভঙ্গিমায় অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া বঁধু বাক্যের প্রতিযোগ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে অস্তগত রবির লোহিত আভাটুকু মিশিয়া গেল, নীলিমা আকাশ পরিষ্কার পরিছন্ন। উজ্জ্বলা প্রভায় প্রদোষ তারাটী বিশাল গগণের এক প্রান্তে বসিয়া হৃষ্ট চিত্তে কান্ত আশাপথ নিরীক্ষণ করিতেছে। মধুর মলয়ানীল জলক্রীড়া করিতে করিতে তীরস্থ কুসুম কুমারী দিগকে বিবসানা করিয়া হেলিতে দুলিতে ধীরে ধীরে দেশ দেশান্তরে গমন করিতেছে।

ভবনাথ বন্ধুবর্গ সমবেত হইয়া ঘাটের উপর বসিয়া আছে। আজ সে কোন বিশেষ কারণে অধিক মাত্রায় সুরাপান করে নাই। ভবনাথ বন্ধুবর্গ সমবেত থাকিয়াও এক্ষণে সে একাকী, কারণ অন্যান্য সকলে নাথাকারই মধ্যে, তাহাদের উত্থান শক্তি নাই, মধ্যে মধ্যে এক একবার মস্তক উত্তোলন করিয়া বিকট চিৎকার করিতেছে, কাহার মুখে পীপিলিকা প্রবেশ করিতেছে, কেহ বা বমনের উপর পড়িয়া আছে। সন্ধ্যা সমীরণ ভোগ করিতে ভবনাথের আর ইচ্ছা হইল না, সে একটি ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল,—"দেখিস্ যেন বাবুরা জলে নাবে না।" এই বলিয়া ভবনাথ প্রাসাদ অভিমুখে গমন করিল। বাগান বাড়িটির পশ্চাত ভাগ রন্ধনশালা, রন্ধন শালার উপরে ভবনাথের নিজস্ব প্রমোদ ঘর, প্রমোদ ঘরের দুইপার্শ্বে দুইটি শয়ন কক্ষ। সম্মুখের নিম্নতল সাধারণের আমোদের নিমিত্ত। উপরে নাচ-ঘর, কিন্তু সকল দিনের জন্য নহে, যে দিন কলিকাতা হইতে দু চারিটী বন্ধু বান্ধব আসে, সেই দিন নাচ ঘরের দ্বার মুক্ত হয়।

ভবনাথের নিজস্ব প্রমোদ ঘরের আজ সমস্ত আলো গুলি জ্বালা হইয়াছে, গৃহটী বিলাস উপযোগী নানাদ্রব্য সজ্জিত, চিত্রিত দেয়ালে দেশী ও বিলাতি ছবিতে পরিপূর্ণ, দুই পার্শ্বে দুই খানি বৃহৎ দর্পণ, দর্পন, তলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই পালঙ্ক। এক খানিতে একটী বৃদ্ধা বসিয়া আছে আর অপর খানিতে বিষাদ মগনা মলিন বদনা উষাতারা সদৃশা ক্ষীণ প্রভায় একটী দ্বাদশ বর্ষীয়া কনক বরণী অনূঢ়া কামিনী পালঙ্কস্থ উপাধানে অঙ্গ ঢালিয়া অর্দ্ধ শায়িতা বস্থায় বৃদ্ধার সহিত কথোপকথন করিতেছে। পাঠক! এই অনূঢ়াটী আমাদের মধুমতী। অপূর্ব্ব বিধির খেলা এসংসারে অনুধাবন করে কার ক্ষমতা। অটলবিহারী পূর্ব্ব কার্য্য সমাধা করিয়া মধুমতী হরণের নিমিত্ত ভজহরি ও ভজহরির ভাগ্নাত্রয়কে চন্দ্রবাবুর বাটীতে প্রেরণ করে। তাহারা খিড়কির পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ একটী বৃক্ষতলে বসিয়া উপায় অনুসন্ধান করিতেছিল, এমত সময়ে স্বয়ং মধুমতীই প্রাণ পরিত্যাগের আশায় ঘাটে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহারা মধুমতীকে চিনিতনা। অবশ্যই আপনারা বলিতে পারেন যে, যদিই তাহারা মধুমতীকে চিনিতনা, তবে কি প্রকারে মধুমতীকে চুরি করিত? আশ্চর্য্য কিছুই নয়, অটলবিহারী তাহাদিগকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে,—"তোরা আগে বাড়ির ভিতরে যাবি, বাড়িতে আজ লোকে লোকরন্য, তোরা জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আগে দেখিবি মধু কার নাম, তার পর অবসর মতে কাজ সারবি।" মধুমতীকে চিনিতে কাল বিশেষ কষ্ট ছিলনা, কারণ মধুমতী কাল সর্ব্বজন পরিচিতা; সাজ সজ্জা ও বসন ভূষণই মধুমতীর পরিচয় প্রদান করিতেছিল। যাহা হউক, ভজহরি

দস্যুপতি। কাল ভদ্রেশ্বরে একটা বিবাহের নিমন্ত্রণ ছিল, তা সে'বে হওয়া চুলোয় যাক, বরটীও জলে ডুবে মরে গেছে, মেয়েটীও জলে ডুবে মরে গেছে।

দস্যু। বলেন কি? একেবারে দুটীই মল কি ক'রে?

দস্যুপতি। বরের বাড়ি মণিরামপুর, নৌক ক'রে বে ক'ত্তে আস্‌ছিল, অন্য একখানা নৌকর ধাক্কায় বরের নৌক খানি ডুবে গেছে, বর ও আর অার যারা ছিল, সকলেই ডুবে গেছে, কাকেও খুঁজে পাওয়া যাইনি। এই কথা শুনে চন্দ্রবাবুর মেয়েটীও খিড়কির জলে ডুবে মরেছে।

দস্যু। কি সর্ব্বনাশ! কাছে কেউ ছিল না?

দস্যুপতি। কে জানে যে জলে ডুবে মর্‌বে?

দস্যু। মরে ভেসে উঠলে পর বুঝি সকলে টের পেলে?

দস্যুপতি। না এখনও পাওয়া যায়নি, জেলেরা জাল এনে টানা দিলে তা কেবল কাপড় খানি পাওয়া গেল। অগাধ জল, আর যে পদ্ম বন সে কোথায় জড়িয়ে আছে।

ধীরেন্দ্রনাথ পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে এই সমস্ত কথা শুনিতে পাইল, তার আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল, তার হৃদয় এক কালে শতধা হইয়া দর দর ধারায় নয়নাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। হায়! হায়! দস্যুরা একি কথা বলিতেছে, আমা বিহনে আমার মধুমতী জলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। ধীরেন উন্মত্তের ন্যায় দস্যুদিগের নিকটে আসিয়া সবিশেষ অবগত হইবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু হায় তার হৃদয়ে আর বল নাই, সে সমস্তই অন্ধকার দেখিতেছে, তার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে! হত ভাগ্য গৃহতলে বসিয়া পড়িল। হায়! ধীরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে শোকানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল

সে হতাশ, মধুমতী আশা তার হৃদয় হইতে জনমের মত বিদায় হইল, মধুমতী লাভের জন্য কত উপায় নির্দ্দেশ করিতেছিল, যে কোন প্রকারে হউক তাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে, প্রাণ থাকিতে অন্যের উপভোগ্য হইতে দেওয়া হবে না, তাকে লাভ করিয়া যদি জাবজ্জীবন দুঃখ ভোগ করিতে হয় তাতেও সুখ, তার জন্যে যদি সাধারণের কাছে লাঞ্ছনীয় হইতে হয় তাতেও সুখ, তার জন্যে যদি লোকালয় ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতে হয় তাতেও সুখ। ধীরেন্দ্রনাথ জলমগ্ন হওয়ার পর নদিতীরে যখন পড়িয়া থাকে, তখন ও একবার ভাবিয়াছিল যে যদি কোন প্রকারে আমি বাঁচিয়া উঠি, তা হ'লে আমার প্রাণের মধুমতীকে ব'লবো যে, "মধুমতি! মৃত্যু যন্ত্রনা অপেক্ষা তোমার ভাবনাই অধিক যাতনা প্রদ।" আবার যখন দস্যুরা তাকে বলিয়াছিল যে তোমাকে চিরকাল আমাদের আড্ডা বাড়িতে থাকতে হবে। তখন সে একবার আশা সরসে অবগাহন করিয়া কল্পনায় কনক নলিনী-টিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিল, তখনও সে একবার ভাবিয়াছিল যে আমার জীবন দাতা এই দস্যুদল কর্ত্তৃক শারদ জোৎস্না সমা প্রণয়প্রতিমা আমার সেই প্রাণ প্রেয়সীর হাস্য আস্য বিনিসৃত অমিয় বচন পুনরায় আমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিবে। তখন পর্য্যন্ত সে মনে স্থির করিয়াছিল যে এই দস্যুদল কৃপায় অবশ্যই একদিন না একদিন আমার সেই লাবন্যময়ী ললনা লতিকার আলিঙ্গন উপভোগে স্বর্গসুখ লাভ করিব। কিন্তু হায় এখন তার সে আশা কোথায়? এখন যে তার প্রাণ পাখীটী মধুমতী অবসান গীতাপাঠ ক'চ্চে, আর অবিরল দরদর ধারায় ভেসে যাচ্চে।

দস্যুদিগের কথা বার্ত্তা শেষ হ'লে পর দস্যুপতি গরিটী অভিমুখে গমন করিল ও অন্যান্য দস্যুরাও বাড়ির ভিতর আসিল। সকলে ধীরেনকে বাড়ির ভিতর না দেখিতে পাইয়া চিন্তিত হইল। তাহাদের আর বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইল না। তাহারা দেখিল বাহিরেরই একটী ঘরের মধ্যে ধীরেন অবনত মস্তকে রোদন করিতেছে। একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি এখানে বসে কেন?"

দস্যুর কথায় ধীরেন মস্তক উত্তোলন করিয়া সজল নয়নে কহিল,—"তবে কোথায় বোসবো?"

দস্যু জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কাঁদ্চ কেন?"

এরূপ প্রশ্নে ধীরেনের শোক উচ্ছ্বাস দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"আমি কেন কাঁদ্চি তাকি তোমরা জান না? আমার যে কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, তাকি তোমরা শোন নি? আমি যে সকল সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছি, তাকি তোমরা বুঝতে পারনি? এই কতক্ষণ আগে তোমরা কোন বিবাহের আন্দোলন ক'চ্ছিলে? কাদের মৃত্যুর আন্দোলন ক'চ্ছিলে! আমারই বাড়ি যে মণিরামপুর, আমিই যে গঙ্গায় ডুবে গেছলুম, আমারই মৃত্যু সংবাদে যে চন্দ্রবাবুর কন্যা জলে ডুবে মরেছে। চন্দ্রবাবুর কন্যা যে অপর কেহ নয়, সে যে আমার প্রাণ প্রতিমা, সে যে আমার প্রাণ পাখী, সে যে জন্মের মত উড়ে গেছে, আর যে আমি তাকে দেখ্তে পাব না। ভাই তোমরা আমার জীবন দাতা, মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসে ভেবেছিলুম, তোমাদের দয়ায়, তোমাদের সহায্যে একদিন না একদিন আমি তাকে দেখ্তে পাব, তার সঙ্গে কথা কইতে পাব। কিন্তু

এখনত আমার সে আশা নাই, আর ত আমি জন্মের মত তাকে দেখ্‌তে পাব না। ভাই তবে আর বেঁচে ফল কি? তোমরা আমায় মেরে ফেল, আমিই সর্ব্বনাশের মূল, আমারই জন্তে সে জলে ঝাঁপ দিয়েছে। এই বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথ রোদন করিতে লাগিল।

দস্যুদল স্থির। দস্যুদল সর্দ্দারের মুখে এ দুর্ঘটনার কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল যে তাহারা যাকে লইয়া আসিয়াছে, সেই যুবকই মণিরাম-পুরস্থ ধীরেন্দ্রনাথ, সেই চন্দ্রবাবুর বাড়িতে বিবাহ করিতে যাইতেছিল। কিন্তু প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই, কি করিয়া প্রকাশ করিবে, তা হ'লে যে তাহাদের মিথ্যা বাদী বলিয়া সর্দ্দার তিরস্কার করিবে, তাহ'লে যে তাহাদের আর কোন সময়ে কোন কথায় বিশ্বাস করিবে না। এই ভয়ে তাহারা ধীরেণের প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিতে পারে নাই। এক্ষণে ধীরেন্দ্রনাথের রোদন দেখিয়া তাহাদের চক্ষে জল আসিল, কিন্তু নিরুপায়, এখন প্রকাশে অমঙ্গল বই মঙ্গল নাই। যাহা হউক একজন দস্যু ধীরেনের হাত ধরিয়া কহিল,—"ঠাকুর! তা আর কেঁদে কি হবে? যা হবার তা হ'য়েগেছে, সে যখন মরে গেছে, তখন আর তার জন্তে কেঁদে কি হবে? এখন উঠে খাওয়া দাওয়া উদ্যোগ ক'র্ব্বে ত চল।"

আর একজন কহিল,—"এখানে তোমার কোন কষ্ট হবে না, বেশ দুবেলা খাবে আর মজা ক'রে শুয়ে থাক্‌বে, আমি দু দিন অন্তর তোমার বাড়ির খবর এনে দেব।"

ধীরেন এইবার উত্তর করিল,—"বাড়ির খবর এনে দেবে, আমার খবর ত বাড়িতে দিতে পার্ব্বে না?"

ঘাটের সন্নিকটেই ছিল, সে ভাবিয়াছিল যে খিড়কির দরজা দিয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিবে, কিন্তু আর তাকে বাড়ির ভিতর যাইতে হয় নাই, স্ব ইচ্ছায় কুরঙ্গিনী কীরাত করতলেই উপস্থিত হইয়াছিল। যখন মধুমতী ঘাটে আসে, তখন ভজহরি ভাবিয়াছিল যে "ইহারই নামকি মধুমতী? পরনের কাপড় খানাত দেখছি লাল চেলী, বোধ হয় এই চন্দ্রবাবুর কন্যা, এরই আজ বিবাহ হবে।" আবার ভাবিয়াছিল যে "যদি না হয়, তা হ'লে কি হবে?" কিন্তু সে যখন বালিকাকে জলে ঝাঁপ দিতে দ্যাখে, তখন তার প্রাণে একটী চিন্তা আসিয়াছিল, তখন সে ইহার কোন কালে স্থির করিতে পারে নাই ও আপনি ও স্থির থাকিতে পারে নাই। তখন সে ভাবিয়াছিল যে,—যদি সত্যই এর নাম মধুমতী হয়, তা হ'লেত সমস্তই বিফল, কারণ এখনইত ইহার মৃত্যু ঘটিবে। ভজহরি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, যে কোন প্রকারে হোক, একে জল থেকে তুল্‌তে হবে। এই অঘটনে ভজহরি ও তাহার ভাগ্নাত্রয় আশ্চর্য্য হইয়া সন্দিহানচিত্তে জলে অবতরণ করিয়া ছিল এবং অল্প পরিশ্রমেই মধুমতীকে জল হইতে উত্তোলন করিয়াছিল। ভজহরি মধুমতীকে জল হইতে তুলিয়াই দ্যাখে যে, সে উলঙ্গিনী ও তার জ্ঞান নাই। ভজহরি আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, সে সেই অবস্থাতেই একেবারে তাকে নৌকায় আনিয়াছিল। অটলবিহারী সেই নৌকায় ছিল। অটলবিহারী ও মধুমতীকে চিনিতে পারে নাই। কিন্তু সে বালিকাকে বিবসনা দেখিয়া আপন উত্তরীয় খানি দ্বারা তাহার অঙ্গাচ্ছাদন করিয়াদিয়াছিল। হুগলীর ঘাটে যখন নৌকা উপস্থিত হয় তখন ও মধুমতীর চেতন হয় নাই। অটলবিহারী

সংবাদ প্রেরণ মাত্রেই ভবনাথ ঘাটে আসিয়া বালিকাকে চিনিতে পারে ও একেবারে বাগান বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য আদেশ করে। অটলবিহারী মধুমতীকে বাগানে আনিয়া বিশেষ শুশ্রূষায় চেতন করাইল ও আপনাদের দুষ্ক্রিয়ার সহায়তা কারিণী অর্থ লোলুপা একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীকে মধুমতীর নিকটে রাখিল। সেই অবধি এই প্রাচীনাটী মধুমতীর নিকটেই আছে এবং নানা কথায় ও নানা ছলায় মধুমতীকে পূর্ব্বচিন্তা হইতে নিবৃত্ত করিতেছে।

কিন্তু মধুমতীর এক্ষণে নানা চিন্তা, নানা, সন্দেহ। সে সর্ব্বদাই ভাবিতেছে যে, আমি জলে ডুবিয়াছিলাম, জলথেকে আমায় কে তুল্‌লে ? এখানেই বা আমাকে কে আন্‌লে ? আর বাড়িটীই বা কাদের ? মধুমতী কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। শেষ বৃদ্ধার সহিত কথা কহিতে কহিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ বাড়িটী কাদের ?"

বৃদ্ধা হাসিতে হাসিতে কহিল,—"কেন ? তুমিকি কখন এ বাড়িতে আসনি ? এটী তোমার বাপের একটী বন্ধুর বাড়ি।"

মধুমতী ক্ষণকাল চিন্তার পর উত্তর করিল,—"না এ বাড়িতে আমি কখন আসিনি, আচ্ছা এ বাড়িতে কি আর কেউ নেই ? আর কাকেও দেখ্‌তে পাচ্চিনা কেন ? আমার বাপ, আমার মা আমার ঠাকুর মা এরা সব কোথায় ?"

বৃদ্ধা অটলবিহারী ও ভবনাথের মন্ত্রনানুযায়ী কহিল,—"তারা তোমায় এইখানে রেখে গেছে, হয়ত কাল সকাল বেলাই তোমায় নিয়ে যাবে।"

মধুমতী বৃদ্ধার কোন কথা বুঝিতে পারিল না, তার প্রাণে

সন্দেহ উপস্থিত হইল, সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল যে,—"বাবা আমায় এখানে রেখে গেলেন কেন?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল,—"তুমি দিদি কিছু ভেবনা, তুমি আর আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রনা তাঁর কোন উদ্দেশ্য আছে, তাই তিনি তোমাকে এখানে রেখে গেছেন।"

মধুমতী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না, কিন্তু প্রাণের সন্দেহ দ্বিগুণ তর বৃদ্ধি হইল। তার চিন্তা আর কিছুই নয়, পাছে আর কাহার সঙ্গে তার বিবাহ হয়, পাছে সে হৃদয়ে আঘাত পায়। মধুমতী এই মহা চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পালঙ্কস্থিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার দিকে স্থির দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। এই পুস্তকের উপর নয়ন নিবিষ্ট করিবা মাত্রেই মধুমতীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। বালিকা দেখিল, পুস্তকের উপর হুগলীর জমীদার শ্রীযুত কমলাকান্তের নাম লেখা। কি সর্ব্বনাশ! তবে কি এটা হুগলীর জমীদারের বাড়ি? বাবাকি আমাকে হুগলীর জমীদারের বাড়িতে রেখে গেছেন? আশ্চর্য্য কিছুই নয়, এতক্ষণের পর আমার সন্দেহ দূর হ'ল, এতক্ষণের পর আমি বুঝিতে পাল্লুম যে বাবা এই কারণেই আমাকে এখানে রেখে গেছেন, আমার সর্ব্বনাশের জন্যেই এখানে রেখে গেছেন। হায়! আমার সকল আশা বিফল হ'ল, আমি যে আশঙ্কায় জলে ঝাঁপ দিলুম, আবার সেই বিপদেই পড়তে হল? হা ধীরেন! আমি তোমার কাছে যাবার জন্যে এত চেষ্টা কল্লুম কিন্তু কিছুতেই যেতে পাল্লুম না, তুমি ও আমায় নিয়ে যেতে পাল্লে না? তোমার আদরিণীকে তোমার সঙ্গের সাথি ক'ত্তে পাল্লে না? মধুমতীর চক্ষে জল আসিল, সে অভাবনীয় চিন্তায় নিমগ্ন হইল।

সমস্ত নিস্তব্ধ আর কাহার মুখে কথা নাই। কেবল দেয়াল-স্থিত একটী বিলাতি ঘড়ির অভ্যন্তর হইতে ঠুক্ ঠাক্ শব্দ হই-তেছে আর শন্ শন্ শব্দে পবন—বেগ উন্মুক্ত বাতায়ন পথ অতি-ক্রম করিয়া গৃহস্থিত দোদুল্য বেলোয়ারি ঝাড় দোলাইয়া ঠুং ঠাং শব্দ করিতেছে। মধুমতী প্রতি শব্দেই চমকিয়া উঠিতেছে এবং এক এক বার গৃহের চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতেছে। মধু-মতীর কর্ণে এ বার একটী নূতন শব্দ প্রবেশ করিল। এ শব্দটী মনুষ্যের পদশব্দ, এ শব্দটী পুরুষের এবং বাহির হইতে আসি-তেছে। মধুমতী পুরুষের পদ শব্দ অনুধাবন করিয়া উঠিয়া বসিল এবং সঙ্কোচচিত্তে অঙ্গের বসন টানিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল,—কে আস্চে ?

বৃদ্ধা উত্তর করিল,—"এলেই দেখ্তে পাবে, তা কেই জিজ্ঞাসা ক'রো—সে কে ?" এই বলিয়া প্রাচীনা উঠিয়া দাঁড়াইল, মধুমতী উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় ভবনাথ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। মধুমতী ভবনাথ কে দেখিবা মাত্রই বৃদ্ধার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। ভবনাথ আর অগ্রসর হইল না, সে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মধুমতী এখন কেমন আছে ?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল,—"এখন বেশ আছে, আর কোন অসুখ নেই, এখন ও গায়ে জোর পেয়েছে।"

ভবনাথ এবার মধুমতীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মধুমতী ! তুমিকি আমায় চিন্‌তে পাচ্চোনা ?"

মধুমতী অর্দ্ধস্ফুট স্বরে উত্তর করিল,—"না, আপনি কে আমি চিন্‌তে পাচ্চি না।"

মধুমতীর এই সুধা বিনিসৃত স্বর লহরী ভবনাথের কর্ণে

সুধাবর্ষণ করিল। ভবনাথ এই প্রথম মধুমতীর সঙ্গে কথা কহিল, তার প্রাণ নাচিয়া উঠিল। মধুমতীর রূপলাবণ্যে ভবনাথ বহুদিন পূর্ব্বে বিমুগ্ধ হইয়াছে, বহুদিন হইতে মধুমতীকে হৃদয়ে ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আজ তার আশার অর্দ্ধেক ফল, আজ তার চিত্তহারিণী তার সঙ্গে কথা কহিয়াছে। আজ তার অপার আনন্দ,—আজ তার মন মাতঙ্গ মধুমতী আলিঙ্গনে উন্মত্ত,—আজ সে কোমল কমলবিশিষ্টা মধুমতী হৃদিসরসংস্থিতা প্রেম-সলিলাবগাহনে উন্মত্ত।

ভবনাথ আপনা আপনি একটু প্রকৃতিস্থ হইল। সে ভাবিল, একেবারে উন্মত্ত হওয়া কিছু নয়, যদিও মধুমতী এক্ষণে আমার মুষ্টির ভিতর, যদিও মধুমতী আমার আয়ত্তাধীন, তত্রাচ এরই মধ্যে কোন ভাব প্রকাশের প্রয়োজন নাই, কারণ মধুমতীচিত্ত এক্ষণে চঞ্চল। ছলে কৌশলে মধুমতীকে আত্মবশে না আনিতে পারিলে সরলার সরল প্রেম লাভ করিতে পারিব না। বল প্রকাশে কোন ফল হইবে না, বলে বিষময় ফল লাভ হইবে, তাতে প্রণয় হবে না, পিশাচ প্রণয়ে কোন সুখ পাব না। এই রূপে ভবনাথ নিমেষের মধ্যে মনস্থির করিয়া মধুমতীকে কহিল,-"মধুমতি! তুমি আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না সত্য, কিন্তু আর দুদিন পরেই আমায় চিন্‌তে পার্ব্বে, আমি তোমার আপনার লোক, এখানে তোমার কোন ভয় নাই, তুমি এখানে নির্ব্বিঘ্নে থাক। সুখে থাক্‌বে বলেই চন্দ্রবাবু তোমায় এখানে রেখে গেছেন।"

মধুমতী। আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বো, আপনি আমায় তার উত্তর দেবেন কি?

ভবনাথ। বেশত, কি কথা জিজ্ঞাসা কর।

মধুমতী। আমায় জল থেকে কে তুল্লে ?

ভবনাথ। মধুমতী ! তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি কি এখন বুঝ্‌তে পারনি যে জল থেকে তোমায় কে তুল্লে ? যিনি রক্ষকর্ত্তা, তিনিই তোমায় রক্ষা করেছেন, তিনিই তোমার পাপ ইচ্ছায় বিরুদ্ধে কাজ ক'রেছেন। তুমি ভুলেও কখন আত্মনাশের ইচ্ছা ক'রোনা।

উভয়ে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইত্যবসরে বৃদ্ধা কক্ষান্তরে গমন করিল, কিন্তু মধুমতী সেই এক ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। সে ভবনাথের কোন কথার ভাব বুঝিতে পারিল না, সে তার প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাইল না, মনে মনে নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতেছে আর ভাবিতেছে যে, এ যুবকটী কে ? এর কি মিষ্টি কথা, এর কথা শুনে বোধ হয় যে এর প্রাণে কোন খল কপটতা নেই। এ দিকে ভবনাথও একদৃষ্টে মধুমতীর মনমোহিনী মূর্ত্তিটী অবলোকন করিতেছে। ক্ষণকালের পর ভবনাথ মধুমতীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার খাবার ত'য়ের হয়েছে কি জান ?"

মধুমতী এতক্ষণ অবনত মস্তকে ছিল, ভবনাথের কথা শুনিয়া মস্তকোত্তলন করিয়া দেখিল, যে বৃদ্ধা নিকটে নেই। মধুমতী একটু কুঞ্চিত ভাবে উত্তর করিল,—"তাত আমি জানি না।"

ভবনাথ সরল ভাবে মধুমতীকে কহিল,—"ঠান্‌দিদি বুঝি ও ঘরে আছে, জিজ্ঞাসা করত আমার বড় খিদে পেয়েছে।"

মধুমতী ও ধীরে ধীরে পার্শ্বস্থিত কক্ষে প্রবেশ করিল। প্রাচীনা পার্শ্বস্থিত কক্ষ হইতে সমস্ত কথাই শুনিতে পাইয়াছিল, তত্রাচ মধমতীকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"ভবনাথ কি চ'লে গেছে?"

মধুমতী উত্তর করিল,—"হাঁ—তাঁর বড় খিদে পেয়েছে, কিছু খাবার আছে কিনা জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন।"

বৃদ্ধা "ভবনাথ" শব্দটী উচ্চারণ করিয়া আপনা আপনি একটু ভীত হইল, কারণ ভবনাথের নাম প্রকাশ করিতে বৃদ্ধাকে নিষেধ করা হইয়াছিল। মধুমতীও এতক্ষণের পর বুঝিতে পারিল যে,—আগন্তুক যুবকের নাম ভবনাথ। একে একে মধুমতীর সমস্ত কথা স্মরণ হইল, সে পূর্ব্বে বাড়িতে শুনিয়াছিল যে হুগলীর জমীদারের ছেলের নাম ভবনাথ। আর কোন সন্দেহ রহিল না, এই ভবনাথের সঙ্গে যে পূর্ব্বে বিবাহের কথা হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। যাহা হউক, মধুমতী এক্ষণে মহা বিপদে পড়িল। সে বিবেচনা করিল যে বোধ হয় আমি যখন জলে ঝাঁপ দিয়েছিলুম, তখন বাবা জাস্তে পেরেছিলেন, তিনি আমাকে জল থেকে তুলে একেবারে এখানে রেখে গেছেন, আমার মা কি আমার ঠাকুরমা তাঁরা বোধ হয় কিছুই জানেন না, তা হ'লে তাঁরা কখনই এখানে রেখে যেতে দিতেন না, তা হ'লে তাঁরা অবশ্যই আমার কাছে থাক্‌তেন। তবে উপায়, তবেত আমি বিপদে পড়েছি, যাই হোক আর আমি ভবনাথের কাছে যাবনা। মধুমতী আবার ভাবিল,—"আচ্ছা আমি আগে শুনেছিলুম যে, ভবনাথের স্বভাব ভাল নয়, কিন্তু ভবনাথের কথাবার্ত্তা শুন্‌লে ভাল বই মন্দ বলা যায়না।"

মধুমতী মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছে ইত্যবসরে বৃদ্ধা খাদ্য দ্রব্য আয়োজন করিয়া মধুমতীকে কহিল,—"তবে তুমি তাকে ডেকে নিয়ে এস।"

মধুমতী চুপ করিয়া রহিল, সে স্থির করিয়াছে যে আর তার নিকটে যাবেনা। মধুমতীকে স্থির থাকিতে দেখিয়া বৃদ্ধা হাঁসিতে হাঁসিতে কহিল,—"তার আর লজ্জা কি? আচ্ছা আমার সঙ্গে এই জলের গেলাস আর এই আসন খানা নিয়ে এস।"

মধুমতী এবার বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"শুধু দুধ আর সন্দেশ নিয়ে যাচ্চ, আর কিছু নিয়ে যাবেনা?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল,—"না—সেত আর কিছু খাবে না, তার যে বাপ মারা গেছে।"

মধুমতী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"সেকি? জমীদার বাবু কবে মারা গেছেন?"

বৃদ্ধা অবাক। সে মধুমতীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"ও যে হুগলীর জমীদারের ছেলে তা তুমি কি ক'রে জান্‌লে?"

মধুমতী। আমি সব জানি।

বৃদ্ধা। তবে বলেছিলে যে আমি চিনি না?

মধুমতী। আগে চিন্‌তে পারিনি।

বৃদ্ধা। এখন চিন্‌তে পেরেছ?

মধুমতী। হ্যাঁ—এরই সঙ্গে আমার বের কথা হ'য়েছিল।

বৃদ্ধা। তোমার বাপ যদি এর সঙ্গে বিবাহ দিতেন, তাহ'লে তুমি চিরকাল সুখে থাকতে, এই সব ঘর দরজা তোমারই হ'তো।

মধুমতীর চক্ষে জল আসিল, তার হৃদয়ে ধীরেন-মূর্ত্তি প্রতি-ফলিত হইল। সে ধন চায়না, অর্থ চায়না সে শুদ্ধ ধীরেনকে চায়, ধীরেন ব্যতিত আর কাকেও জানেনা, সে ধীরেনের চিরদাসী। হায়! সেই ধীরেন জন্মের মত ছেড়ে গেছে, ইহ-

জন্মে আর সে তার প্রাণের ধীরেনকে দেখ্‌তে পাবেনা। মধুমতী অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল। বৃদ্ধা মধুমতীর চক্ষে জল পড়িতে দেখিয়া বিবেচনা করিল যে, বোধ হয় বাপের উপর অভিমান করিয়া কাঁদিতেছে। সে মধুমতীকে কহিল,—"তার আর কান্না কেন বোন? যা কপালে আছে তাই হবে। চোখের জল মুছে আসন আর জলের গেলাসটা নিয়ে এস। বৃদ্ধার বার বার অনুরোধে মধুমতী আসন, আর জলের গেলাস লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। ভবনাথ পালঙ্কে বসিয়া মধুমতী বিষয় ভাবিতেছে, এমন সময়ে উভয়ে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। মধুমতী বৃদ্ধার কথানুযায়ী গৃহের একপার্শ্বে আসন খানি পাতিয়া ধীরে ধীরে জলের গেলাসটী রাখিল। বৃদ্ধা দুগ্ধ ও সন্দেশ রাখিয়া ভবনাথকে ডাকিল। ভবনাথ আসনে উপবিষ্ট হইয়া সন্দেশ খাইতে খাইতে দেখিল যে, মধুমতী ঘরের একটী কোনে দাঁড়াইয়া আছে। বালিকার মুখ পাণ্ডুবর্ণ, তার মুখে বিষাদের রেখা প্রতীয়মান হইতেছে, সে অন্যমনস্কা। ভবনাথ মধুমতীকে কহিল,—"মধুমতী! তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো?"

মধুমতী নিরুত্তর, সে এবার কোন কথা কহিল না। ভবনাথ পুনরায় কহিল,—"মধুমতী! তুমি কি ভাব্‌চ? তোমার ভাব্‌বার বিষয় কিছুই নাই, এখানে তোমার কোন ভয় নাই, আমার সঙ্গে কথা কহিতে তোমার ভয় কি?" মধুমতী অবনত মস্তকে রহিল। বৃদ্ধা মধুমতীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিল,—"কথার উত্তর দাওনা দিদি? তোমায় কি জিজ্ঞাসা কচ্চে বলনা।" এই বলিয়া বৃদ্ধা ধীরে ধীরে মধুমতীকে পালঙ্কের উপর উপবেশন করাইল। ভবনাথ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"মধুমতী তোমায়

আমার কথাটীর উত্তর দিতে হবে, তোমায় জোর ক'ত্তে পারিনা, ইচ্ছা হয়ত উত্তর দাও।"

মধুমতী ধীরে ধীরে কহিল,—"কি কথা ?"

ভবনাথ আবার কহিল,—"যথার্থ উত্তর দিবে ? না—আমার কাছে গোপন ক'র্ব্বে ?"

মধুমতী। কি কথা বলুন না ?

ভবনাথ। তুমি কাল রাত্তিরে জলে ডুবে ম'ত্তে গেছলে কেন ?

এ বিষম প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর মধুমতীর মুখ দিয়া বাহির হইল না, এ প্রশ্নের উত্তর মধুমতীর নয়ন দ্বার দিয়া দর দর ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভবনাথের এই কথা, শুনিয়া সে পালঙ্কস্থ উপাধানে বদন লুকাইয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে তার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। বৃদ্ধা এই অবসরে কক্ষান্তরে গমন করিল। মধুমতী কিছুই জানিতে পারিল না, সে আপনার দুঃখে আপনি মগ্ন- আপনার শোকে আপনি কাতর। ভবনাথের জলযোগ শেষ হইল, আর সেই খানে মুখ ধুইয়া উঠিয়া পড়িল। ভবনাথ কিঞ্চিত অগ্রসর হইয়া পুনরায় কহিল,—"কৈ মধুমতী চুপ ক'রে রইলে যে ?"

মধুমতীর শোকোচ্ছ্বাস দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইল। আহা ! শোকাকুলা অবলা মস্তক উত্তোলন করিয়া কাতর প্রাণে ভবনাথকে কহিল,—"মহাশয় ! সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বেন না।"

ভবনাথ স্থির ! সে মধুমতীর দিকে চাহিয়া রহিল, তার দুঃখে ভবনাথের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। ভবনাথ ছলে

বলে অনেক সতীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু এত কাতর হ'তে কখনও কাকে দেখে নাই, কাহার চক্ষে কখন এত জল বাহির হ'তে দেখে নাই। মধুমতীর বিশাল লোচন হইতে দর দর ধারায় বারিধারা বক্ষ প্লাবিত করিতেছে, তার নয়ন দুটী রক্ত-বর্ণ হইয়াছে, মুখখানি যেন শরতের শিশির সিক্ত শতদলের ন্যায় নয়ন জলে ঢল ঢল করিতেছে। ভবনাথ আর স্থির থাকিতে পারিল না, সে মধুমতীর চক্ষে জল দেখিয়া অস্থির হইল. সে ধীরে ধীরে মধুমতীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বামহস্তে মধুমতীর গলবেষ্টন করিয়া দক্ষিণ হস্তে আপন বসনাঞ্চল দ্বারা মধুমতীর মুখ মুছাইতে মুছাইতে কহিল,—"মধুমতী কেঁদনা।"

ভবনাথ, মধুমতীকে স্পর্শ করিবামাত্র মধুমতী চকিতা হরিণীর ন্যায় এক লম্ফে পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া গৃহের বাহিরে আসিবার উপক্রম করিল। কিন্তু হায়! তার সে আশা বিফল হইল, তার পরিধেয় বসনই তাকে বিপদে ফেলিল. ভবনাথ মধুমতীর বসনাঞ্চল চাপিয়া বসিয়াছিল, এ কারণ মধু-মতী অৰ্দ্ধ উলঙ্গিনী হইয়া গৃহমধ্যে বসিয়া পড়িল, তার হৃদয়, থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, সে সলজ্জে নবোত্থিত কুচদ্বয়কে জানু ও হস্তদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া অবনত মস্তকে ভবনাথকে কহিল,—"আমার কাপড় ছেড়ে দিন।"

মধুমতীর অর্দ্ধ উলঙ্গিনী ভাব ভবনাথের মন হরণ করিয়াছে, মধুমতীর নব কুচদ্বয়ের সন্ধিস্থল হইতে অপূর্ব্ব তাড়িতাভা নির্গত হইয়া ভবনাথের নয়নদ্বয়কে পলকবিহীন করিয়াছে। মধুমতীর এই ক্ষীণ কথাটী ভবনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল কিনা তা ভব-নাথই জানে। কিন্তু ভবনাথ কোন কথা কহিল না, আর

বসনাঞ্চলও ছাড়িয়া দিল না। সে একদৃষ্টে মধুমতীর রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিতেছে, তার নয়নদ্বয় যেন তৃপ্তি পাইতেছে না বলিয়া মধুমতীর হৃদ্ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। মধুমতী মহা বিপদে পড়িল, সে দেখিল ভবনাথ কাপড় ছাড়িয়া দিল না, তার চক্ষে এখন আর জল নাই, সে এক্ষণে উপস্থিত বিপদে নিস্তার পাইবার উপায় দেখিতেছে, সে পুনরায় কাতর কণ্ঠে ভবনাথকে কহিল,—"আমার কাপড় ছেড়ে দিন।"

ভবনাথ উন্মত্ত, সে মধুমতীর প্রেমলাভে উন্মত্ত। মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভবনাথ এক্ষণে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, সে তার পূর্ব্ব সংকল্প ভুলিয়া গিয়াছে. সে এক্ষণে পিশাচভাব ধারণ করিয়াছে। মধুমতীর কাতরবাক্যে ভবনাথের হৃদয় গলিল না, সে হাসিতে হাসিতে মধুমতীকে কহিল,—"কেন, তুমিত ইচ্ছা ক'ল্লেই আমার হাত থেকে কাপড় ছাড়িয়ে নিতে পার।"

মধুমতী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"আপনি কেন আমার সহিত এমন ব্যবহার ক'চ্চেন? আমি আপনার কিছুই করিনি, আপনি কেন আমায় কাঁদাচ্চেন? আপনি না আমাকে কাঁদ্‌তে বারণ কচ্ছিলেন?" ভবনাথ মধুমতীর এই সমস্ত কথা শুনিয়া কহিল,—"আমি কাপড় ছেড়ে দিলে তুমি আর কাঁদ্‌বে না?

মধুমতী উত্তর করিল, –"না।"

এই বার ভবনাথ কাপড় ছাড়িয়া দিল। মধুমতী অঙ্গে বসনাচ্ছাদন করিয়া গৃহের বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু গৃহের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ। বৃদ্ধা অবসর বুঝিয়া বাহির হইতে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। হতভাগিনী মধুমতী একে একে সমস্ত দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই খুলিতে পারিল.

না। শেষ হতাশ প্রাণে ঘরের একটী কোনে দাঁড়াইয়া রহিল। মধুমতী ভবনাথের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া মনে মনে স্থির করিল যে,—"আমি ভবনাথের হাত হ'তে কিছুতেই নিস্তার পাব না। তবে উপায়, আমার চির সঞ্চিত ধন কি এত দিনের পর তস্কর হাতে তুলে দেব? না—প্রাণ থাকতে তা আমি পার্ব্বো না, বরঞ্চ কোন রকমে ভবনাথকে কথায় ভুলাইয়া ঘরের বাহির হ'তে হবে, ঘরের বাহিরে যেতে না পাল্লে আর আমার নিস্তার নাই। মধুমতী এইরূপ ভাবিতেছে. এমন সময় ভবনাথ মধুমতীকে কহিল,—"মধুমতী! কৈ বাইরে গেলে না?

মধুমতী। সমস্ত দরজা দেওয়া।

ভবনাথ। তবে আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? এখানে এসে ব'স।

মধুমতী। আমি আপনার কাছে বোস্‌বো না।

ভবনাথ। বেশত তুমি অন্য পালঙ্কে বস্‌তে পার?

মধুমতী। আপনি আর আমায় জ্বালাতন ক'র্ব্বেন না বলুন?

ভবনাথ। না—আমি তোমায় আর জ্বালাতন ক'র্ব্বোনা তুমি ব'স।

ভবনাথের কথা গুলি মধুমতীর হৃদয়ে স্থান পাইল না সত্য, মধুমতী ভবনাথের কথায় বিশ্বাস করিল না সত্য, তত্রাচ কিন্তু সে ধীরে ধীরে ভবনাথের সম্মুখস্থ পালঙ্কে উপবেশন করিল। মধুমতীর ক্ষুদ্র হৃদয় খানির এক দিকে ধীরেনের বিরহ শেল বিদ্ধ হইয়া যাতনা প্রদান করিতেছে, অপর দিকে অবলার হৃদসর্ব্বস্ব সতীত্ব রত্নটী রক্ষা করিবার জন্য মহাচিন্তা অধিকার করিয়া আছে, আবার মধ্যে মধ্যে পিতা মাতার বিষয়ও ভাবিতেছে। ভবনাথ

মধুমতীকে পালঙ্কের উপর উপবেশন করিতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল যে, বোধ হয় মধুমতী অচিরাৎ আমার বশীভূতা হবে। অতএব এই সময়ে মিষ্ট বাক্যে অর্থের প্রলোভন দ্যাখান উচিত। এই ভাবিয়া ভবনাথ মধুমতীকে কহিল,—"মধুমতি! সত্যই কি তুমি আমায় চিন্‌তে পারনি? তুমি কি কখন তোমাদের বাড়িতে আমায় দেখনি?"

মধুমতী। আমি আপনাকে চিন্‌তে পেরেছি, আপনার পিতা হুগলীর জমীদার।

ভবনাথ। আমার পিতার মৃত্যু হ'য়েছে শুনেছ?

মধুমতী। শুনেছি।

ভবনাথ। সমস্ত জমীদারি এখন আমার তা জান?

মধুমতী। জানি।

ভবনাথ। এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'র্ত্তে কি তোমার ইচ্ছা হয় না?

মধুমতী। ইচ্ছা হয় সত্য, কিন্তু আমায় দেবে কে?

ভবনাথ। আমি দেব, যদি আমায় বিবাহ কর, তা হ'লে আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য তোমায় প্রদান ক'র্ব্বো।

মধুমতী নিরুত্তরে রহিল। ভবনাথের এ কথাটী মধুমতীর হৃদয়ে যেন বৃশ্চিক দংশন করিল। ক্ষুদ্রপ্রাণা মধুমতী ছলনায় ভবনাথকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তার আর সে বাসনা নাই, তার সহিত আর কথা কহিতে ইচ্ছা হইল না। ভবনাথের স্বার্থপরতা বিষমিশ্রিত কথাগুলি মধুমতীর কোমল হৃদয়ে যন্ত্রণা প্রদায়ক হইয়া উঠিল, অবশেষে সে আপন অদৃষ্ট ভাবিয়া অধোবদনে রহিল। ভবনাথ মধুমতীকে নিরুত্তরে থাকিতে

দেখিয়া বিবেচনা করিল যে,—"বোধ হয় মধুমতী আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছে, বোধ হয় মধুমতী ঐশ্বর্য্য প্রলোভনে বিমুগ্ধ হইয়াছে, লজ্জায় অবলা কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। ভবনাথ এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময়ে খড়াক্ করিয়া ঘরের একটী দরজা খুলিয়া গেল। উভয়েই চাহিয়া দেখিল, বৃদ্ধা দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। ভবনাথ জিজ্ঞাসা করিল,—ঠান্‌দিদি দাঁড়িয়ে কেন গা?" বৃদ্ধা উত্তর করিল,—"মধুমতী কি কিছু খাবে না? অনেক রাত হ'য়ে পোড়েছে।"

বৃদ্ধার এই কথায় ভবনাথ মধুমতীকে কহিল,—"যাও মধুমতী কিছু খাও গে।"

মধুমতী নিস্কৃতি পাইল, সে ভাবিল এতক্ষণের পর বুঝি ঈশ্বর আমার সহায় হয়েছেন। মধুমতী ত্রস্তভাবে পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিল, কিন্তু ভবনাথ মধুমতীর অগ্রে গৃহের বাহির হইয়া সংগোপনে বৃদ্ধার কানে কানে কি দু একটী কথা বলিল, বৃদ্ধাও "আচ্ছা" বলিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভবনাথ আর অপেক্ষা করিল না, সে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। মধুমতীর সন্দেহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল, সে ভাবিল, ভবনাথ যাবার সময় বৃদ্ধাকে কি বলিয়া গেল? ভবনাথ কি আবার আস্‌বে? বৃদ্ধা কি আবার আমায় কৌশলে বিপদে ফেল্‌বে? না খাবারের সঙ্গে আমায় কিছু খাইয়ে দেবে? আশ্চর্য্য কিছুই নয়, এরা সব ক'ত্তে পারে,—এই সর্ব্বনাশী সব ক'ত্তে পারে। মধুমতী এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময়ে বৃদ্ধা নিকটে আসিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে কহিল,—"কি দিদি! এত কথা কবার ধুম যে খাওয়া দাওয়া সব ভুলে গেছ?"

বৃদ্ধার বাক্যে মধুমতীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু কি করিবে, প্রাণের জ্বালা প্রাণে চাপিয়া ধীরে ধীরে কহিল,— "এই সন্ধ্যার সময় খেয়েছি, আজ আর আমি কিছু খাব না।"

বৃদ্ধা কহিল,—"সে কি! খিদে না থাকে, একটু দুধ খাও।"

মধুমতী বৃদ্ধার হাত ধরিয়া কহিল,—"না আজ আর আমি একটু জল পর্য্যন্ত খাবনা, আমায় আজ আর কিছু ব'লোনা।"

মধুমতীর মনে সন্দেহ হইয়াছে বলিয়া কিছু খাইল না সত্য, কিন্তু তার আজ প্রকৃতই ক্ষুধা নাই, ক্ষুধা তৃষ্ণা তার দূরীভূত হইয়াছে। এখন সে তার স্ত্রীধর্ম্মটীকে অমূল্য রত্ন ভাবিয়াছে এবং এই অমূল্য রত্নটীকে বিধিমত প্রকারে রক্ষা করিবার উপায় দেখিতেছে।

পাঠক! অবশ্যই আপনারা এ কথা বলিতে পারেন যে, মধুমতীর গঠন প্রণালী দেখিয়া যেন তাকে একটী যুবতী বলা যাইতে পারে, কিন্তু তার বয়স ত সবে মাত্র দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে, অতএব এখন মধুমতী বালিকা মধ্যে গণ্য। এত অল্প বয়সে তার ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা কিরূপে হইল? এ কথাটী জিজ্ঞাস্যও বটে। কিন্তু আপনারা জানিবেন যে, মধুমতী ইদানীন্তন সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় নয়। আজ কালের স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ খানি পড়িয়াই আপনাকে শিক্ষিতা জ্ঞানে অহঙ্কার করিয়া থাকেন। হ য ব র ল মাথা মুণ্ড যা হোক একটু লিখিতে শিখিলেই, প্রাণেশ্বর, প্রাণবল্লভ ইত্যাদি শব্দে প্রণয় পত্র ছড়াইতে থাকেন। আহোরাত্র গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া-"হ্যাথন হাসি, প্রেম বিলাসী, হাঁসি খুসি ইত্যাদি" প্রেম মাখান, প্রাণ হারণ, রগড় ছোটান পুস্তকগুলির উপর মন নিবিষ্ট

করিয়া থাকেন। যাঁরা সম্ভবতঃ শিশুশিক্ষা খানি পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন, তাঁদের ত দেমাকের আর সীমা নাই। তাঁরাত রন্ধনশালার দরজা কোন্ দিকে তাও জানেন না। স্বামীর উপায় থাকুক আর নাই থাকুক, সম্ভবতঃ সপ্তাহে একখানি সংবাদ পত্র চাই, বঙ্কিমকে বঙ্কিম নয়নে দেখ্‌তেই হবে, রমেশকে বুকে না রাখ্‌লে নিদ্রাই হবে না। কিন্তু তাঁরা ভারতচন্দ্রকে চান না, চন্দ্র অনেক দূরে, কিন্তু তার হাসিটী বেশ। উপন্যাস ও নাটকে সাধারণের সংশিক্ষার বিষয় যথেষ্ট লেখা থাকে, কিন্তু ইদানিন্তন পাঠিকারা কেবল মাত্র কুরুচি ভাবটুকু সংগ্রহ করিয়া—অর্দ্ধাচ্ছাদিত বক্ষে হেয়ার ক্রস ও গোলাপী পাউডার হস্তে দর্পণ সাহায্যে আপনার রূপ দেখিতেই মত্ত থাকেন, সম্মুখ দিয়া ভাসুর গেলেন কি কুকুর গেল, তা ভ্রূক্ষেপেও দ্যাখেন না। সীঁথায় সিঁদুর দেন কি না দেন তা বোঝাও যায় না, বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে অতি সূক্ষ্ম একটী লোহিত রেখা দ্যাখা যায়, তাও সিঁদুরের কি গোলাপী পাউডারের তা তাঁরাই জানেন। প্রাচীনা গৃহিনীদের উপদেশত তাঁরা গ্রাহ্যই করেন না। শীল নোড়ার ঠক্‌ঠকানির চেয়ে হারমোনিয়মের চাবি টেপা ভাল, আগুন তাতে উননের মুখে কাঠ ঠ্যালার চেয়ে উলেউলে ফাঁস দিয়ে কাটি চালান ভাল, মাটির উপর বঁটী পেতে তেঁতুলের আটী কাটার চেয়ে সাটীনের বডি গায়ে চড়িয়ে চেয়ারে চাপা ভাল। তাঁরা স্বামীর মারফৎ পত্র পাঠাইয়া অপরের প্রাণ হরণ ক'ত্তে জানেন। সাবিত্রী ও দময়ন্তী গাছের ফল কি বনের পাখী, তাঁরা তা জানেন না, তাঁরা চেনেন শুধু তরুবালার পারুল দিদিকে। কিন্তু তা বলিয়া সকল স্ত্রীলোককে নিন্দা করা

যায় না। এমন স্ত্রীলোকও আছে যে, তাঁরা অল্প শিক্ষিতা হইয়াও তাঁদের অহঙ্কার নাই, ঐশ্বর্য্যগরিমা নাই, সংসারকার্য্যে অবহেলা নাই। লাজ লজ্জা ও দয়া ধর্ম্ম আছে, গুরুজনের প্রতি ভক্তি আছে, অক্ষুণ্ণ প্রাণে তাঁদের সেবা করিয়া থাকেন। দীনা বয়স্কাদের প্রতি যত্ন আছে, প্রতিদিন প্রাণ খুলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তত্ত্বাবধান লওয়া আছে এবং সংসার ধর্ম্ম কি প্রকারে করিতে হয় তাহাও বয়স্কাদিগের শেখাইয়া থাকেন। আহা! এসংসারে তাঁরাই নারীজাতি পরিগণিতা, এ সংসারে যে পুরুষ এরূপ ভাগ্যবতী নারী লাভ করিয়াছেন, তিনিই সুখী, তাঁরই সংসারে কমলা অবিচলিত ভাবে অধিষ্ঠান করেন, নচেৎ সংসার নয় শ্মশান।

যাহা হউক, মধুমতী বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা, তার বিমাতা তারাসুন্দরী দেবীও শিক্ষিতা। তাঁরিই যত্নে মধুমতী লজ্জা সরম শিক্ষা করিয়াছে, তিনি পতিব্রতা মধুমতীও তাঁরই গুণের অনুকরণ করিয়াছে। তারাসুন্দরী দেবী সময়ে সময়ে গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া অবসরমত রামায়ণ অথবা মহাভারত পাঠ করিতেন এবং মধুমতী ও অন্যান্য বালিকাদের গল্পছলে সমস্ত বুঝাইয়া দিতেন। বিশেষতঃ সীতাদেবী অশোককাননে কি প্রকারে দিনাতিপাত করিতেন, দময়ন্তী সতী নলের আশায় সভাবধ্যে কাতরোক্তিতে কি কথা বলিয়াছিলেন ও রাণী গান্ধারী কি কারণ আহোরাত্র আপনার চক্ষুদুটী বসনে ঢাকিয়া রাখিতেন, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। এতদ্ভিন্ন মধুমতী ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিত, একারণ চন্দ্রবাবুর মাতাঠাকুরাণী উপদেশ পূর্ণ গল্প শোনাইয়া মধুমতীর উন্নতি সাধন

করিতেন। মধুমতী এই বালিকা বয়সে যে সমস্ত ব্রত ও পূজা করিত, তাহা মধুমতীর বিমাতা কিম্বা চন্দ্রবাবুর মাতা ঠাকুরাণী সেই সকল ব্রতের কারণ, ফল ও প্রকরণ সমস্ত বুঝাইয়া দিতেন। ফল কথা, মধুমতীর বিমাতা ও পিতামহীর নিকট হইতে এক প্রকার সমস্তই শিক্ষা করিয়াছে। ধর্ম্মকর্ম্মে মধুমতীর আগ্রহ দেখিয়া সময়ে সময়ে চন্দ্রবাবু বলিতেন যে কোন দেবকন্যা শাপ-ভ্রষ্টা হইয়া আমার বাড়িতে এসেছেন। একদিন মধুমতি তার বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "বৌদিদি! কাল দাদা তোমায় মেরেছিল কেন?" বৌদিদি উত্তর করিয়াছিল,—"আমারই দোষে।" চন্দ্রবাবুর বাটীর পার্শ্বস্থ একটী কুলবধুকে বৌদিদি বলিয়া ডাকিত। মধুমতী বৌদিদিকে বড় ভালবাসিত, এ কারণ একটু দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিল,—"তা যাহোক দাদার ভাল হয়নি।" মধুমতীর এই কথাটীতে বৌদিমি একটু দুঃখিত হইয়া বলিয়াছিল যে, "পতির দোষ দোষ বলিয়া ধরিতে নাই, পতিই সতীর গুরু, অহর্নিশি পতিপদ চিন্তাই সতীর ধর্ম্ম ও প্রাণপণে পতির সন্তোষ সাধনই হ'ল সতীর একমাত্র কর্ম্ম" এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটী কথা বলিয়াছিল। যদিও সে কথাটী সামান্য, কিন্তু সেই সামান্য কথাটী সধারণ স্ত্রীলো-কের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না, সে কথাটী আদিম ঋষি-বাক্য। বৌদিদি মধুমতীকে বলিয়াছিল যে "মধুমতি! যে স্ত্রীলোক স্বামী অঙ্কে শয়ন করিয়া অন্য পুরুষের সম্ভোগ কামনা করে, সে অসতী মধ্যে পরিগণিতা, আর যে অসতী শত পুরুষের সম্ভোগ তরঙ্গে ভাসমান থাকিয়া অন্তর মধ্যে পতিপদ চিন্তা করে, সে নারী সতী শিরোমনি বলিয়া সাধারণের আদরণীয়া

হয়।" বৌদিদি মধুমতীকে বলিয়াছিল যে এ কথাটী আমি ঠাক্রুণের মুখে শুনিয়া ছিলাম। অতএব মধুমতী যে এত অল্প বয়সে এতদূর শিক্ষা লাভ করিবে, তায় আর আশ্চর্য্য কি?

বৃদ্ধা বার বার অনুরোধ করিয়া ও কিছু খাওয়াইতে পরিল না, শেষ দ্বাররুদ্ধ করিয়া উভয়ে উভয় পালঙ্কে শয়ন করিল। বৃদ্ধা যে কি উদ্দেশে কপট নিদ্রায় অভিভূত হইল, তা বৃদ্ধাই জানে, মধুমতীর কিন্তু নিদ্রা হয় নাই। মধুমতীর নিদ্রার উদ্রেক হইলে ও সে নিদ্রা যাইবেনা, তার কারণ অধিক আর কি লিখিব, পাছে পুনরায় ভবনাথ গৃহে প্রবেশ করে, বৃদ্ধা পাছে ভবনাথকে দরজা খুলিয়া দেয়।

এদিকে ভবনাথ নিম্নতলের সাধারণ প্রমোদগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্যাখে যেন এক একটী নাগা সন্ন্যাসী পড়িয়া আছে। ভবনাথ প্রত্যেকেরই গা ঠেলিয়া ডাকিল, কিন্তু কেহই উঠিল না, স্মুদ্ধ অটলবিহারী মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিল,—"বেল্লিকম কর কেন বাবা?"

ভবনাথ। কিহে তোমার যে এখন নেশা ছাড়ে নি।

অটল। তোমার চোদ্দপুরুষের নেশা ছাড়ুক।

অটল। কি জানি।

ভবনাথ। চোক চেয়েই দ্যাখ।

অটল। অম্নিই চলুগ না। তুমি কে বল দেখি বাবা?

ভবনাথ। আমি।

অটল। আমি টামি খাটবে না, পষ্ট ক'রে বল।

ভবনাথ। আমি ভবনাথ।

অটল। পথে এস, গতিক কি বল?

ভবনাথ। গতিক ভাল, এক রকম বসে এসেছে।

অটল। কাছে কে আছে?

ভবনাথ। ঠান্‌দিদি।

অটল। ঘাটের মড়া? পালায় না যেন?

ভবনাথ। না—ঠান্‌দিদিকে জেগে থাকৃতে ব'লে এসেছি।

অটল। তা বেশ হ'য়েছে। এখন হয় পাশে জমী নাও, না হয় খবরদারি করোগে।

অটলবিহারী নিস্তব্ধ হইল। ভবনাথ দুই তিনবার ডাকিল অটল আর কথা কহিল না, কেবল একবার বিকৃতস্বরে "অটল বাড়ি নেই" বলিয়া চুপ করিল। ভবনাথ দেখিল যে অটল নেশায় বিভোর হইয়া আছে। তবে আর কি হবে, রাত্রি অধিক হইয়াছে, এই খানেই শয়ন করি, আবার কাল সকাল-বেলাই বাড়ি যেতে হবে। এই বলিয়া ভবনাথ সেই খানেই শয়ন করিল। মধুমতীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অল্পক্ষণ মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইল।
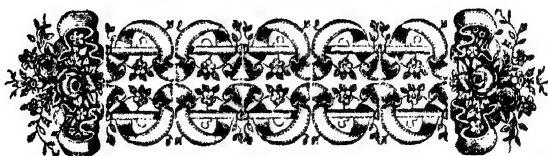
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কারাবাসিনী।

প্রভাত হইল, ক্রমে ক্রমে নয়টা বাজিতে যায়, এখন কাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। গৃহটী পরিষ্কার করিবার জন্য বাহিরে ভৃত্য দণ্ডায়মান। ভৃত্য দেখিতেছে বাবুরা গাঢ় নিদ্রাভিভূত, অবশেষে সে দু একটী কৃত্রিম শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ভবনাথের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ভবনাথ চাহিয়া দ্যাখে যে বেলা হইয়া গিয়াছে প্রায় নটা বাজে। সে উঠিয়া বসিল, বেহারা তামাক সাজিয়া আনিল। ভবনাথ তামাক খাইতে খাইতে অটলবিহারী ও অন্যান্য বন্ধুদিগকে ডাকিতে আরম্ভ করিল। সকলে উঠিয়া বসিল। ভবনাথ অটলকে জিজ্ঞাসা করিল,—"অটল! এখানে খাওয়া দাওয়া হবে, না অমনি বাড়ি যাওয়া যাবে?"

অটলবিহারী ভবনাথের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে। অটলবিহারী কহিল,—"তোমরা কেউ যাও আর নাই যাও, আমাকে কিন্তু এখনি যেতে হবে, আর তুমিও চল, তোমাকে ত আবার হবিষ্য ক'ত্তে হবে?"

ভবনাথ উত্তর করিল,—"হ্যাঁ তা ঠিক বটে, তবে চল সকলে যাওয়া যাক।" ভবনাথ একটী ভৃত্যকে ডাকিয়া গাড়ি আনিতে

বলিল। ভৃত্যকে গাড়ি আনিতে আর অন্যত্র গমন করিতে হইল না, কেননা বাবুর নিজস্ব গাড়ি আছে। অনতিবিলম্বে গাড়ি বারেণ্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই ত্রস্ত ভাবে হাত মুখ ধুইয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল। কিন্তু ভবনাথের আর বার হয় না, ভবনাথ একটী ভৃত্যকে ডাকিয়া কি বলিতেছে আর তামাক খাইতেছে। অটলবিহারী ভবনাথের মনোভাব বহু পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে ভবনাথ একাকী উদ্যানে থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছে, সে সাধে বাদ সাধিতে ইচ্ছা করিল না।

অটল ভবনাথকে কহিল,—"কি ভবনাথ! যাবে না থাক্‌বে? আমরাত আর থাক্‌তে পারি না।"

ভবনাথ হাঁসিতে হাঁসিতে কহিল,—"বেশ ত ভাই! এতই যদি ব্যস্ত হ'য়েছ তোমরা কেন যাওনা, আমি অন্য গাড়িতে যাব এখন।"

অটলবিহারী কহিল,—"তা বেশ আর খাতির রাখ্‌তে পারি না" এই বলিয়া অটল কচুয়ানকে গাড়ি চালাইতে কহিল। কচুয়ান অটলের কথা শুনিয়া ভবনাথের দিকে চাহিয়া রহিল, ভবনাথও ইঙ্গিতে গাড়ি চালাইবার অনুমতি প্রদান করিল। ঘোড়া দুটী একবার এদিক ওদিক করিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল দেখিতে দেখিতে গাড়ি উদ্যান অতিক্রম করিয়া হুগলীর সদর রাস্তায় পড়িল।

ভবনাথের আজ আর বাড়ি যাইবার ইচ্ছা নাই, তার ইচ্ছা সর্ব্বদা মধুমতীর সঙ্গে কথা কয়, সর্ব্বদা মধুমতীর সহিত প্রেমালাপে মত্ত থাকে। ভবনাথ পুনরায় বেহারাকে তামাক আনিতে বলিয়া ঘাটে আসিয়া বসিল, বেহারাও অনতিবিলম্বে তামাক

সাজিয়া ভবনাথের হস্তে প্রদান করিল। ভবনাথ তামাক খাইতে খাইতে বেহারাকে বলিল,—"দ্যাখ বামুনকে ব'লগে যা যে আজ আমি এইখানেই হবিষ্য ক'র্ব্বো।" বেহারা প্রস্থান করিল। ভবনাথ তামাক খাইতে খাইতে দেখিল যে বৃদ্ধাও মধুমতী ঘাটের দিকে আসিতেছে। মধুমতী ভবনাথকে দেখিয়া আর অগ্রসর হইল না। ভবনাথ বুঝিতে পারিয়াছে যে ইঁহারা স্নান করিতে আসিতেছে, অতএব আমার আর ঘাটে বসিয়া থাকা উচিত নয়। এই ভাবিয়া ভবনাথ ঘাট হইতে উঠিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ভবনাথকে ঘাট হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া বৃদ্ধা ও মধুমতী পরস্পর কথা কহিতে কহিতে জলে অবতরণ করিল। বৃদ্ধা স্নান করিতে লাগিল, মধুমতী আজ আর স্নান করিবে না,সে জলে অবগাহন করিয়া পরিধেয় ত বসনখানি কাচিতে আরম্ভ করিল। মধুমতী ঘাটটীকে নির্জ্জন ভাবিয়াছে, সে দেখিল ঘাটে কিম্বা পুষ্করিণীর নিকটবর্ত্তী লোকজন নাই, সে নিঃশঙ্কমনে বক্ষের বসন পুষ্করিণী বক্ষে বিস্তার করিল। পুষ্করিণীর নির্ম্মল জলে বিমল কমল দলে পরিপূর্ণ, মধুপগণ মধুপানে প্রমত্ত থাকিয়া ঘাটে নব নলিনীর আবির্ভাব দেখিল। আজ মধুমতী হ'তে ভ্রমরকুল মধ্যে মধ্যে ভ্রমে পড়িতেছে। খঞ্জন পাখী তিরস্থ হইয়া মধুমতীর নেত্রের প্রতি চাহিয়া আছে। ভবনাথ গৃহের খড় খড়ি দিয়া মধুমতীকে জলবালা জ্ঞানে আপনা আপনি মোহিত হইল। মধুমতী ত্রস্তভাবে অঙ্গে বসনাচ্ছাদন করিয়া উঠিয়া পড়িল। আজ আর্দ্র বসনখানি দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া মধুমতীকে বিপাকে ফেলিয়াছে, সে ঘাট হইতে উঠিয়া একে একে বসন টানিয়া সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিল,

কিন্তু সে বৃথা. ভবনাথ সুস্পষ্টরূপে সমস্ত অঙ্গ নিরীক্ষণ করিতেছে উরু নিতম্ব ও বক্ষের সুন্দর দৃশ্য ভবনাথের নয়নদ্বয়কে নিশ্চল ভাব ধারণ করাইয়াছে। বৃদ্ধা স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে মধুমতীকে সঙ্গে করিয়া প্রস্থান করিল। ভবনাথ এতক্ষণ হুঁকা হস্তে অনিমিষলোচনে মধুমতীরূপ সন্দর্শনে নিমগ্ন ছিল, এক্ষণে তার চিত্ত-হারিণী নয়নান্তরাল হ'তেই একবার গুড় গুড় শব্দে ধূমাকর্ষণ করিয়া দেখিল যে, তামাকের আর অস্তিত্ব নাই। সে পুনরায় বেহারাকে তামাক আনিতে বলিবে, এমন সময় পাচক ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিল যে,—"মহাশয় তবে আপনি স্নান করুন, হবিষ্যের আয়োজন করা হ'য়েছে।" ভবনাথও দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার যত শীঘ্র সম্পন্ন হয় তার উপায় দেখিতে লাগিল।

অন্ন প্রস্তুত, বৃদ্ধাও মধুমতী দণ্ডায়মান। বৃদ্ধা মধুমতীকে আহার করিতে অনুরোধ করিতেছে. মধুমতীও বৃদ্ধার বাক্যের প্রতিযোগ করিয়া বলিতেছে যে, আজ আমার অসুখ ক'রেছে, আজ আমি ভাত খাব না।

বৃদ্ধা। তোমার কি অসুখ ক'রেছে?

মধুমতী। কি জানি, মাথাটা বড় ভারি হ'য়েছে।

বৃদ্ধা। তবে কি খাবে?

মধুমতী। আজ আর কিছু খাব না।

বৃদ্ধা। সেকি হয়, কাল রাত্তিরে কিছু খাওনি, আর আজও কিছু খাবে না?

মধুমতী। যদি খিদে হয় ত রাত্তিরে খাব এখন।

বৃদ্ধা। এবেলা দুটী ভাত খাও, ও বেলা না হয় কিছু খেও না।

মধুমতীর হৃদয়ে এখন সেই সন্দেহ জাগরূক, পাছে খাদ্যের সঙ্গে কোন মাদকদ্রব্য মিশান থাকে। সে এক্ষণে কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। যাহা হউক বৃদ্ধা বার বার অনুরোধ করিলে পর সে স্থির করিল, যদি কোন মাদকদ্রব্য মিশান থাকে, তা হ'লে আমারই খাবার জিনিসে মিশান থাক্‌বে, বৃদ্ধার ভোজন দ্রব্যে সে সন্দেহ নাই, অতএব এক্ষণে বৃদ্ধার ভোজন পাত্রে আমার আহার করা উচিত। মধুমতী মনে মনে এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া প্রচুর অন্নপূর্ণ প্রস্তর পাত্রটী লক্ষ্য করিয়া বসিয়া পড়িল। বৃদ্ধা মধুমতীকে ভোজন করিতে উপবিষ্ট দেখিয়া কহিল,—"ও দিদি! তুমি ওটাতে ব'স্‌লে, আমি যে থালাতে ভাত খাই না।"

মধুমতী কৃত্রিম চমকিয়া কহিল,—"তবে কি হবে? আমি যে ভাতে হাত দিয়ে ফেলেছি?" বৃদ্ধা অগত্যা আর কি করিবে, এখানে স্বতন্ত্র প্রস্তর পাত্র নাই, কাল সকালে কেবল বৃদ্ধারই নিমিত্ত এই পাথরখানি আনান হইয়াছিল। আর উপায় নাই, বৃদ্ধাকে কাংস্যপাত্রেই ভোজন করিতে হইল। মধ্যে মধ্যে পাচক ব্রাহ্মণটী দু একবার এই গৃহে আসিয়াছিল, তাই রক্ষা, নচেৎ বৃদ্ধার আজ আহার ভালরূপ হইত না, কারণ কাংস্যপাত্রে অন্ন ব্যঞ্জন অল্প পরিমাণেই ছিল।

ভোজন কার্য্য শেষ হইল, উভয়ে আচমনান্তে তাম্বুল চর্ব্বন করিতে করিতে মধ্যগৃহের পালঙ্কে আসিয়া উপবেশন করিল। একটী ভৃত্য আসিয়া আহার স্থানটী পরিষ্কার করিতেছে, বৃদ্ধা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাগা বাবুর খাওয়া হ'য়েছে?"

ভৃত্য উত্তর করিল,—"একটু দেরি আছে।"

মধুমতী বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এটাত দেখ্‌ছি বাগান বাড়ি, বাবু বাড়ি গেলেন না ?"

বৃদ্ধা হাঁসিতে হাঁসিতে উত্তর করিল,—"তোমারই জন্যে।"

মধুমতী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আমরই জন্যে ?"

প্রাচীনা ঈষদহাস্যে উত্তর করিল,—"তা বৈকি ? সে তোমায় দেখে অবধি পাগল, এর ওপর তুমি হেঁসে কথা কইলেত সে তোমার গোলাম হ'য়ে থাক্‌বে দেখচি ?"

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া মধুমতীর লজ্জা আসিল, ভয়, চিন্তা, দুঃখ এককালে সমস্ত উপস্থিত হইল। সে অবনত বদনে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিল,—"আমার জন্যে তিনি পাগল ? ভাল তিনি কি আমায় পূর্ব্বে কখন দেখেছিলেন ?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল,—"না দেখ্‌লে আর এত কাণ্ড এত কারখানা ? যার যা ভগবান মিলিয়ে রেখেছে, মানুষে টানা হেঁচড়া ক'রে কি ক'র্ব্বে ? এইত তোমার বাপ আর একজনার সঙ্গে তোমার বে দিচ্ছিল, কৈ তা হ'লনা ? এইত তুমি জলে ডুবে ম'ত্তে গেছলে, কৈ ম'ত্তে পাল্লে না ?" বৃদ্ধার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই মধুমতী কহিল,—"আচ্ছা আমায় জলথেকে কে তুল্লে বল দেখি ? সে সময়েত পুকুর ধারে কেউ ছিলনা।"

সূর্য্য কিরণ গবাক্ষ ভেদ করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, বৃদ্ধা আলুলায়িত কেশে রৌদ্রে বসিয়া চুল শুখাইতে শুখাইতে আদ্যকাহিনী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধার মনে ধারণা এই যে মধুমতী ভবনাথকে মনমধ্যে স্থান দিয়াছে, ভবনাথকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। কারণ মধুমতী কল্য রজনী

হইতে বৃদ্ধার সহিত যে সমস্ত কথা কহিয়াছে, তাহাতে সহজেই মধুমতীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিবার কথা। বৃদ্ধা একে একে সমস্ত কথা প্রকাশ করিল, কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথের বিষয় কিছুই প্রকাশ করিল না, কারণ বৃদ্ধা ধীরেনের বিষয় বিশেষ অবগত ছিল না। মধুমতী বৃদ্ধার মুখে সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়া স্থির করিল যে, ভবনাথ আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছে, ভবনাথই আমার সুখপথের কণ্টক, বোধ হয় ভবনাথই ধীরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কারণ এইরূপে মধুমতী অবনত মস্তকে অনেক বিষয় ভাবিতে লাগিল। যাহা হোক, সে কিরূপে এই পাপপুরীর বাহিরে যাইবে, কিরূপে নরপিশাচসদৃশ ভবনাথের নিকট হইতে পরিত্রান পাইবে, কিরূপেই বা সে এক্ষণে আত্মরক্ষা করিবে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি কি আর কখন বাপ মাকে দেখ্‌তে পাবনা ?"

বৃদ্ধা প্রবোধ বচনে কহিল,—"সেকি ! বাপ মাকে দেখ্‌তে পাবে না কেন ? ভবনাথ ব'লেছে "যে মধুমতী আমাকে বে ক'র্ত্তে স্বীকার হ'লেই তার বাপ মাকে খরচ দিয়ে এখানে আনাব।" আহা ! তারাও তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদে সারা হ'চ্চে, তারা কি জানে যে তুমি এখানে আছ ? সন্তানের জ্বালা যে কত জ্বালা দিদি ! তা আমি খুব জানি, আমি রাক্ষসী, আমার সাত ছেলে, একে একে সাত ছেলেরই মাথা খেয়ে ব'সে আছি।" বৃদ্ধার চক্ষে জল আসিল। মধুমতীও রোদন করিতেছে বাপ মার জন্যে, ঠাকুরমার জন্যে, ছোট ভাইটীর জন্যে, এখন তার প্রাণ অস্থির হইয়াছে। এখন আর মধুমতীর সে ভাব নাই, পুর্ব্বের সে সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া একা ধীরেন-

শোকেই অস্থির হইয়াছিল, তখন সে ভাবে নাই যে তার জন্যে তার পিতামাতার চক্ষে জল পড়িবে, তার জন্যে তার পিতা-মাতার হৃদ্‌পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া যাইবে, তার বৃদ্ধা পিতামহীর জীবন শেষ হইবে। এখন তার প্রাণে কত কথা উঠিতেছে, এখন সে ভাবিতেছে, যে, হয়ত আমার শোকে আমার মা আমারই মত জলে ঝাঁপ দিয়েছেন, আমার জন্যে ঠাকুরমা হয়ত কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'য়েছেন, আমার তরে বাবা হয়ত অন্নজল ত্যাগ ক'রেছেন। খোকা কি ক'চ্চে? খোকা হয়ত দালানে পড়ে পড়ে কাঁদ্‌চে, সে কার কোলে যাবে তাকে কে কোলে তুলে নেবে? সে যে আর কার কোলে যায় না, সে যে আমার কোলে থাক্‌তে ভালবাসে, আমি না খাওয়ালে তার যে খাওয়া হয়না, সে হয়ত দুধ খেতে পায় নাই। মধুমতীর হৃদয় অস্থির হইয়াছে, তার ইচ্ছা হইতেছে যে সে এখনি ছুটিয়া বাড়িতে যায়, শিশু-টীকে কোলে তুলে নেয়, সকলকে বলে যে তোমরা কেঁদনা আমি এসেছি। কিন্তু হায় মধুমতীর এখন আর সে ক্ষমতা নাই! সে এক্ষণে পরাধীনা, সে এক্ষণে পিঞ্জরাবদ্ধা বনবিহঙ্গিনী। মধুমতীর হৃদয় শতধা হইতে লাগিল, সে এক একটী বিষয় ভাবি-তেছে, আর তার নয়নদ্বার দিয়া প্রবল তরঙ্গ ছুটিতেছে। বৃদ্ধা আপনার চোখের জল মুছিয়া মধুমতীর প্রতি চাহিয়া দেখিল যে সে কাঁদ্‌চে। বৃদ্ধা কহিল,—"তার আর কান্না কি দিদি? বাপ মার জন্যে যদি অস্থির হ'য়ে থাক, তা হ'লে আজই আমি ভব-নাথকে ব'লে তোমার বাপেরকাছে খবর পাঠিয়ে দিচ্চি। ভবনাথ কিছুতে ভয় করে না, সে টাকার আণ্ডিলের ওপর ব'সে আছে, সে যা ক'র্ব্বে তাই সাজ্‌বে। মার বাছা মার কাছে যাবে তাতে

আপত্য কি?—আর তার জন্তে কান্না কেন?"

মধুমতী সজল নয়নে বৃদ্ধাকে কহিল,—"যাতে আমি বাড়িতে যেতে পাই, তুমি একটা তার উপায় কর, বাবুকে একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল।"

বৃদ্ধা উত্তর করিল—"আমি তায় কি ব'লবো দিদি! ভবনাথত তোমার হাতে, তুমি তাকে ব'লে ক'য়ে বাড়ি যাবার উপায় দ্যাখনা?"

মধুমতী পুনরায় কহিল,—"বাবুকে কি ব'লবো?"

হাঁসিতে হাঁসিতে বৃদ্ধা উত্তর করিল,—"কি ব'লবে তা আমি কি জানি? আমি আর তোমায় কি শেখাব? আর কি দিদি সেকাল আছে, এখন সব ভুলে গেছি। তখন আঁচল চাপা দিয়ে চাঁদ ধরেছি, এক ফোঁটা চোখের জলে হাজার হাজার পুরুষের বুক দমিয়ে দিইছি।" বৃদ্ধা এইরূপ অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া আপনার কত গুণই প্রকাশ করিতে লাগিল।

কথায় কথায় বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত। গত রজনীতে ভবনাথের নিদ্রা হয় নাই, সে আহার করিয়া একটু শয়ন করিয়াছিল। এক্ষণে তার নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে দেখিল যে আর বেলা নাই, মধুমতীর সঙ্গে একবার দেখা করিয়াই বাড়ি যেতে হবে। ভবনাথ মুখ প্রক্ষালন করিয়া যে গৃহে মধুমতী ও বৃদ্ধা বসিয়াছিল ধীরে ধীরে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু আজ আর মধুমতী ভবনাথকে দেখিয়া উঠিল না, সে একটু কুঞ্চিতভাবে বসিয়া রহিল। ভবনাথ বৃদ্ধাকে কহিল,—"ঠান্‌দিদি! একটু খাবার জল নিয়ে এস।"

বৃদ্ধা জল আনিতে অপর কক্ষে গমন করিল। ভবনাথ

অপর পালঙ্কে উপবেশন করিয়া মধুমতীকে কহিল,—"মধুমতি! তুমি ব'ল্‌তে পার, —এ সংসারে সুখী কে?"

মধুমতী উত্তর করিল,—"কি জানি।"

ভবনাথ হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল,—"আমি বল্‌তে পারি। তুমি যার প্রতি সদয়, সেই সুখী, তারই জন্ম সার্থক।"

মধুমতী অধোবদনে রহিল, তার মুখচন্দ্রিমা যেন একখানি নিবিড় মেঘের আশ্রয় গ্রহণ করিল। বৃদ্ধা এক গেলাস জল আনিয়া ভবনাথের নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিল। ভবনাথের প্রকৃত তৃষ্ণা পায় নাই, সে অনিচ্ছাসত্বে একটু পান করিয়া গেলাসটী রাখিয়া দিল, মধুমতীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভবনাথ বিবেচনা করিল যে, বোধ হয় মধুমতী আমার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে, নচেৎ উঠিয়া যাইতেছে না কেন? মধুমতী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ভবনাথকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি কি কখন বাড়ি যেতে পাবনা? আমি কি চিরকাল এই খানে থাকৃব?"

ভবনাথ। কেন? বাড়ি যেতে পাবেনা কেন?

মধুমতী। কবে যাব?

ভবনাথ। আমি তোমায় কি ক'রে নিয়ে এসেছি জান?

মধুমতী। সব জানি।

ভবনাথ। তবে বল দেখি কি ক'রে তোমায় বাড়িতে পাঠিয়ে দিই?

মধুমতী। কেন? আপনি যে কাজ ক'রেছেন, তাতে আপনার যশ বই অপযশ নেই, তাতে তাঁরা চিরকাল আপনার বাধ্য হ'য়ে থাকবেন।

ভবনাথ। আচ্ছা বাড়িতে না গিয়ে যদি এইখান থেকেই

তুমি তোমার বাপ মাকে দেখতে পাও?

মধুমতী। বেশত। আজই তাঁদের আনান, তাঁরা হয়ত আমার জন্তে কত কাঁদ্‌চেন।

ভবনাথ। মধুমতি। আমি সবই বুঝি, কিন্তু আমার একটী আপত্য আছে।

মধুমতী। কি আপত্য?

ভবনাথ। তুমি আমায় বিবাহ ক'র্ব্বে বল? কি! চুপ ক'রে রৈলে যে?

আবার সেই কথা? যে কথায় মধুমতী প্রাণে ব্যথা পায়, ভবনাথ আবার সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিল। মধুমতী নিরব। ভবনাথ নিরবে থাকিতে দেখিয়া কহিল,—"মধুমতি এদিকে এসে বস, কাছে বসে দুটো হেঁসে কথা কও।"

মধুমতী ভাবিল, আর না—আর ব'সে থাকা উচিত নয়. কাল বিলম্ব ক'ল্লেই আমাকে বিপদে পড়তে হবে। মধুমতী ভবনাথের চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া উঠিয়া পড়িল। ভবনাথ ভাবিল মধুমতী বুঝি আমারই কাছে আস্‌চে. তা নয় সে দেখিল যে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছে। ভবনাথ অপেক্ষা না করিয়া মধুমতীর হস্ত ধারণ করিল। মধুমতী প্রাণপনে হাতটী ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই পারিল না, ভবনাথের নিকট হইতে পরিত্রাণের উপায় কিছুই দেখিতে পাইল না। অবলার বল নয়ন জল, অবলার সহায় নয়ন জল, অবলার একমাত্র সম্বল নয়ন জল। সেই নয়ন জলে মধুমতীর হৃদয় ভাসিতে লাগিল, শেষ নিরাশ প্রাণে সজল নয়নে ভবনাথের পদপ্রান্তে পড়িয়া কাতরস্বরে বার বার আত্মভিক্ষা প্রার্থনা করিল। কিন্তু ভব-

নাথের হৃদয় যে পাষাণ হ'তেও পাষাণ, তার মরুপ্রাণে ক্ষীণ-প্রাণা অবলার নয়নাশ্রু কিরূপে স্থান পাইবে? সে যে একটী প্রকৃত নরপিশাচ, তার হৃদয়ে দয়া ধর্ম্মের লেশ মাত্র নাই, তার হৃদয়ে স্নেহ মমতার চিহ্নও নাই, সে মধুমতীর কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া একেবারে পালঙ্কের উপর লইয়া আসিল এবং আপনিও তৎপার্শ্বে উপবেশন করিল। মধুমতী নিরুপায়, তার হৃদয় থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, ভয়ে মুখখানি বিবর্ণ ভাব ধারণ করিয়াছে, বিশাল নয়ন দুটী স্থির হইয়া আছে, আতঙ্কে মধুমতী অচেতন হইয়াছে। মধুমতী নির্দ্দয় কিরাত-লক্ষ্য হতপ্রাণা বন-কুরঙ্গিনীসদৃশা আলুলায়িত কেশে অর্দ্ধ বিবসনা হইয়া শিথীল শরীরে ভবনাথের পার্শ্বে পড়িয়া আছে। হায়রে! এ বিপদে মধুমতীকে রক্ষা করে এমন কেহই নাই। জগদীশ্বর তুমিই রক্ষা কর্ত্তা, এ বিপদে তুমিই মধুমতীকে রক্ষা কর, নচেৎ আর উপায় নাই, তুমি সর্ব্বদ্রষ্টা, তোমার দৃষ্টি সকল স্থানেই, একবার দ্যাখ নিরপরাধা বালিকার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তুমিই সহায় সম্পত্তি, তুমিই মধুমতীর লজ্জা নিবারণ কর।

কি আশ্চর্য্য! মধুমতী ত এখন পরিত্রাণ পায় নাই, মধুমতী যে এখন বাজাহতা কপোতীসমা অঙ্গ ঢালিয়া পড়িয়া আছে! দয়াময়! তুমিও কি মধুমতীকে রক্ষা করিতে পারিলে না? বীচিপূর্ণ অম্বুধিতলে প্রবেশ করা অপেক্ষা কি এই ভবনাথের পাপ পুরীতে প্রবেশ করিতে ভয় হইতেছে? তুমি সর্ব্বভুক হুতাসনের মধ্যে অবির্ভাব হইয়া নবজলধরের উদ্ভব করিতে পার, আর এই মাংসপিণ্ড ভবনাথের হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটু দয়ার সঞ্চার করিতে পারিলে না? তুমি

কালান্তক কাল কালকূটকে সুধারূপে পরিণত করিতে পার, আর এই ভবনাথের পাপ ইচ্ছার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিলে না? এখন তোমার সেই মহাদণ্ড বজ্র কোথায়? গিরিশৃঙ্গ অপেক্ষা কি ভবনাথের মস্তক কঠিন? কি জানি, তুমি যে কি বাসনায় মধুমতীর কোমল হৃদয়ে যাতনা প্রদান করিতেছ, তা তুমিই জান। ভবনাথ! তুমিই একবার মধুমতীর মুখের দিকে চেয়ে দ্যাখ দেখি, মুখের আর সে ভাব নাই, চক্ষের আর সে জ্যোতি নাই, চক্ষু পলক বিহীন, চক্ষু নিমীলিত, মধুমতীর যে জ্ঞান নাই, চৈতন্য নাই. তুমি দেখেও দেখতে পাচ্চনা? তুমি অনিমীষ লোচনে মধুমতীর প্রতি তবে কি দেখিতেছ? তুমি কি দেখতে পাচ্চনা যে তুমি যার প্রেমে মাতুয়ারা, যাঁর প্রেমের আশায় এই জঘন্য কার্য্যে ব্যাপৃত আছ, ক্ষণকাল পরেই যে সে তোমায় ছেড়ে যাবে, তুমি কি এতই উন্মত্ত হ'য়েছ যে তোমার আশার রতন স্বপ্নের মতন চ'লে যাচ্চে, তা তুমি দেখেও দেখতে পাচ্চনা? তোমাকে ধিক্, তোমার অনুষ্ঠানকে ধিক্, তোমার সঙ্কল্পকে ধিক্!

ভবনাথ একদৃষ্টে মধুমতীর প্রতি চাহিয়া আছে, মধুমতী নিরবে পড়িয়া আছে। উন্মাদ ভবনাথ মধুমতীর চিবুক ধারণ করিয়া কহিল,—"মধুমতি! আমার কাছে থাকতে কি তোমার ভয় হয়?"

মধুমতীর সাড়া শব্দ নাই। পিশাচ মধুমতীকে আপন অঙ্গে উপবেশন করাইতে গিয়া দেখিল যে, মধুমতীর সর্ব্বাঙ্গ শিথিল ও ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে এবং নিশ্বাস ধীরপ্রবাহে বহিতেছে। ভবনাথ এতক্ষণের পর বুঝিতে পারিল যে মধুমতীর চৈতন্য

নাই। সে ব্যাকুল ভাবে বৃদ্ধাকে ডাকিল, বৃদ্ধা আসিয়া মধুমতীর চোখে মুখে জল সিঞ্চন করিয়া ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে লাগিল। মধুমতীরও ক্রমে ক্রমে চৈতন্যোদয় হইল। সে চক্ষু চাহিয়া দেখিল যে, সে এখনও সেই পাপপুরীতেই রহিয়াছে—সেই পিশাচ পিশাচিনী তার সম্মুখে রহিয়াছে। মধুমতী একটু প্রকৃতিস্থা হইয়া ধীরে ধীরে উপবেশন করিয়া অঙ্গে বসনাচ্ছাদন করিল ও পরে পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সরল প্রাণে সরল ভাবই আসে, কপট প্রাণে কপট ভাবই আসে। ভবনাথ এতক্ষণ ভাবিয়াছিল যে, মধুমতীর যথার্থই চৈতন্য ছিলনা, আতঙ্কে অবলা অজ্ঞান হইয়াছিল। কিন্তু এখন ভবনাথের সে ভাব নাই; এখন সে ভাবিতেছে যে, মধুমতী ছলনা করিয়া এরূপ ভাব ধারণ করিয়াছিল, আমার হাত হ'তে পরিত্রাণ পাবার ইচ্ছায় এই কপট ভাব ধারণ করিয়াছিল। যাহা হউক, মধুমতীকে গৃহের বাহিরে যাইতে দেওয়া হবেনা। ভবনাথ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কহিল,—"মধুমতি কোথা যাচ্চ?" এবং বৃদ্ধাকে দ্বার রুদ্ধ করিতে ইঙ্গিত করিল। বৃদ্ধা কৌশলে মধুমতীকে গৃহমধ্যে রাখিয়া আপনি বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিল। মধুমতীর আর বুঝিতে বাকি নাই, সে বহুকাল হইতে জানিতে পারিয়াছে উভয়ে তার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছে। মধুমতীর এখন আর চিন্তা নাই, সে চিন্তার অন্তস্পর্শ করিয়াও উপায় স্থির করিতে পারে নাই, তার চক্ষে এখন আর জল নাই, সে স্থির করিয়াছে যে, অনর্থক রোদনে এখন আর কোন ফল হইবে না। তার এখন আর ভয় নাই, এখন আর সে কুণ্ঠিত ভাব নাই, সে এখন

দৃঢ়ভাব ধারণ করিয়াছে, সে এখন বুক বাঁধিয়াছে। মধুমতীর তীর্য্যকলোচন হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, নাসাপথ দিয়া ঘন ঘন উষ্ণ শ্বাস বহিতেছে, সে ব্যাধাক্রান্তা কেশরী-কামিনীর ন্যায় এক দৃষ্টে ভবনাথের দিকে চাহিয়া আছে, চক্ষের প্রত্যেক শিরাগুলি রক্তিমাভাব ধারণ করিয়াছে। মধুমতীর সেই এক ভাব, আর এই এক ভাব। বিবাহ রাত্রে আত্মবিনাশ হেতু গভীর রজনীতে পুষ্করিণীর ঘাটে একভাব ধারণ করিয়াছিল, আর এই সন্ধ্যাকালে পাপপুরীতে আত্মরক্ষা হেতু এক ভাব ধারণ করিয়াছে। এ ভাবের পরিণাম যে কি, তা মধুমতীই জানে। পাঠিকাদের মধ্যে যদি কেহ এরূপ বিশ্বসংহারিণী মূর্ত্তি কখন ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার সেই মূর্ত্তির সহিত মধুমতীর এই মূর্ত্তির সামঞ্জস্য করিয়া লউন।

ভবনাথ মধুমতীকে স্থির ভাবে থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মধুমতি! আর দাঁড়িয়ে কি হবে? এদিকে এসে বস।"

মধুমতী উত্তর করিল,—"আমি বোস্‌ব না, তুমি আমার সঙ্গে আর কথা ক'ওনা।"

ভবনাথ একটু ক্রোধ কম্পিতস্বরে কহিল,—"আমি কে তা জান?"

মধুমতী নির্ভয় চিত্তে কহিল,—"অনেক দিন জানি, তুমি আমায় কি ক'ত্তে পার?" "কি ক'ত্তে পারি দেখবে" এই বলিয়া ভবনাথ মধুমতীকে পুনরায় ধরিবার উদ্যোগ করিল। মধুমতী একবার এদিক ওদিক করিয়া জলের গেলাসটী দেখিতে পাইল, সে আর অপেক্ষা না করিয়া জলের গেলাসটী তুলিয়া লইল। ভবনাথ মধুমতীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল, কিন্তু তত্রাচ সে

ধরিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইল। মধুমতী ভবনাথকে নিকটস্থ হইতে দেখিয়া সজোরে গেলাসটী ভবনাথের প্রতি নিক্ষেপ করিল। মধুমতীর লক্ষ্য বিফল হইল, গেলাসটী ভবনাথকে না লাগিয়া পার্শ্বস্থ দর্পণখানিতে আঘাত লাগিল, দর্পণখানি ঝন্ ঝন্ শব্দে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধা বাহির হইতে সমস্ত শুনিতেছিল, সে এক্ষণে এই মহাশব্দ শ্রবণ মাত্রেই দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ভবনাথ স্থির ভাবে দণ্ডায়মান, সে মধুমতীর এই ভাবের বিপর্য্যয় দেখিয়া বৃদ্ধাকে কহিল,—"ঠান্‌দিদি! মধুমতীকে এমন একটা ঘরের ভিতরে রাখা হোক যে, সে ঘরে যেন কোন জিনিস পত্তর না থাকে, আর আজ থেকে ওকে যেন খেতে দেওয়া না হয়, দেখি ও আমার বশে আসে কি না।" ক্রোধ কম্পিতস্বরে বৃদ্ধাকে এই কথা বলিয়া একটী ভৃত্যকে ডাকিল। আজ্ঞা মাত্র ভৃত্য উপস্থিত। ভবনাথ ভৃত্যটীকে সঙ্গে লইয়া পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে একে একে সমস্ত দ্রব্য বাহির করিল, পরে পাষণ্ড মধুমতীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চাবিটী আপনার নিকটেই রাখিল। ইহাতে মধুমতীর কোন দুঃখ নাই, ইহাতে মধুমতীর মঙ্গল বই অমঙ্গল নাই। ভবনাথের বশীভূত হওয়া অপেক্ষা অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করা ভাল। হতভাগিনী আপন অদৃষ্ট ভাবিয়া স্থিরভাবে কক্ষতলে বসিয়া রহিল। ভবনাথ বৃদ্ধা ও অন্যান্য ভৃত্যাদিগকে ডাকিয়া সম্ভবত গুটিকতক কথা বলিয়া বাড়ি যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে, সমস্ত গৃহে আলো জ্বালা হইল, কিন্তু মধুমতী যে কক্ষে সে কক্ষটী অন্ধকারই রহিল। ক্রমে ক্রমে রজনীদেবী

গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, পেচক পেচকীর কর্কশ স্বরে, পার্শ্বস্থ বৃক্ষ হইতে শুষ্কপত্র প্রপাতের খস্ খস্ শব্দে ও বৃক্ষতলে শৃগাল কুক্কুরের বিকট চিৎকারে মধুমতীর ভীতির উৎপাদন করিতে লাগিল। কিন্তু মধুমতীর কোন দিকে লক্ষ্য নাই, সে সেই এক ভাবেই বসিয়া আছে, সে সেই অধোবদনেই বসিয়া আছে। ক্রমে ক্রমে রাত্রি অবসান হইল, মধুমতী সেই এক ভাবেই বসিয়া আছে। বেলা হইল আজ আবার দারুণ গ্রীষ্ম, মধুমতীর গাত্রে রৌদ্র লাগিতেছে, সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম ঝরিতেছে, তাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, বৃদ্ধা জানালার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল যে, মধুমতী অধোবদনে বসিয়া আছে, ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চোখে জল পড়িতেছে। বৃদ্ধা মধুমতীকে কহিল, "কি দিদি! কি স্থির ক'ল্লে?" মধুমতী একবার মুখে তুলিয়া দেখিল যে, সেই ডাকিনী। সে আর কথা কহিল না, একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অধোবদনে রহিল। বৃদ্ধা পুনরায় কহিল,—"এখানে ত আর ভবনাথ নেই, আমি জানেলা দিয়ে কিছু খাবার দিচ্চি খাবে কি?" মধুমতী নিরুত্তরে রহিল। বৃদ্ধা আপনার স্বার্থের পোষকতা করিয়া মধুমতীকে নানাপ্রকার বুঝাইল, কিন্তু সে বৃদ্ধার কোন কথায় কর্ণপাত করিল না, কোন কথাই তার ভাল লাগিল না, সে বৃদ্ধার কথাতে অসন্তোষ বই সন্তোষ হইল না এবং এই জঘন্য কথার কোন উত্তরও প্রদান করিল না। বৃদ্ধা ক্ষণকাল বুঝাইয়া দেখিল যে, মধুমতী কোন রূপেই বুঝিল না, তখন সে এই কথা বলিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল যে,"দেখছি তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।" বৃদ্ধা চলিয়া গেল, মধুমতী অধোবদনেই রহিল।

বৃদ্ধা নিম্নতলে আসিয়া দ্যাখে যে ভবনাথ আসিয়াছে। ভবনাথ বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইয়া কহিল,—"কি ঠানদিদি! মধুমতী কি বলে?"

ঠান দিদি উত্তর করিল,—"সে আবার কি ব'ল্‌বে ভাই, তার সেই একই ভাব।"

ভবনাথ বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি করা যায় বল দেখি?"

বৃদ্ধা হাঁসিতে হাঁসিতে কহিল,—"তুমিও যেমন খেপেছ ভাই, ওর চেয়ে ঢের রূপসী আছে?"

ভবনাথ বৃদ্ধার কথায় বাধা দিয়া কহিল,—"ঢের আছে জানি, তবে কি জান, আমার যে বশে আস্‌বে না, এটা বড় দুঃখের কথা।"

বৃদ্ধা অমনি হাত নাড়িতে নাড়িতে কহিল,—"বশে আস্‌বে না কেন? যে কল পেতেছ ওতে কি আর কিছু দেখ্‌তে হবে? ভাতের মার বড়মার, না খেতে পেয়ে যখন চিঁ চিঁ ক'র্ব্বে, তখন তোমার পায়ের তলায় গড়িয়ে পোড়বে।"

ভবনাথ কহিল,—"হ্যাঁ তা বই কি, হাতে মারার চেয়ে ভাতে মারাই ভাল।"

বৃদ্ধা ভবনাথকে কহিল,—"তুমি একবার চল না।"

ভবনাথ অস্বীকৃত হইয়া বলিল,—"না আমি আর এখন যাব না, আমার রাগ বড় খারাপ, শেষ কি রাগে তাকে মেরে ফেল্‌ব? তুমি যাহয় করগে, আমি এক্ষণি বাড়ি যাব, কেবল এইটুকু শোনবার জন্যেই এসেছিলুম। আর দ্যাখ ঠানদিদি! একেবারে না খেতে দেওয়াটা কিছু না, একবেলা একবেলা

ছুটী দিও।" এই বলিয়া ভবনাথ গৃহের বাহিরে আসিল। বাহিরে গাড়ি প্রস্তুত। পূর্ব্বেই ভবনাথ কচুয়ানকে ঘোড়া খুলিতে নিষেধ করিয়াছিল। মধুমতী আজ ভবনাথের বশীভূত হ'লেও ভবনাথ থাকিতে পারিত না, কারণ আজ সে স্বতন্ত্র উদ্যানে আমোদে মাতিয়াছে। ভবনাথ আর অপেক্ষা করিল না, গাড়িতে উঠিয়া বসিল, কচুয়ান ইঙ্গিতমাত্রে গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

সময় কার বশবর্ত্তী নয়, সময় কার তোষণে ভোলেনা, সময় কার ভ্রূকুটীতে ভয় করে না, সে আপনার গরবে আপনি মত্ত, আপনার কাজে আপনি রত। ক্রমে দিবা অবসান হইল, সন্ধ্যা আসিল, মধুমতীর গৃহটী আবার অন্ধকার হইল। গত রজনী হইতে মধুমতী এখনও পর্য্যন্ত জলস্পর্শ ও করে নাই। সে এক্ষণে কক্ষতলে শয়ন করিয়া আছে, কিন্তু তার চক্ষে নিদ্রা নাই। বোধ হয় নয়নপল্লব বহন করাও মধুমতীর পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে, তাই সে আজ অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে পড়িয়া আছে। বৃদ্ধা একটী জ্বলন্ত প্রদীপ হস্তে জানালার নিকট আসিয়া মধুমতীকে কহিল, "মধুমতি! কিছু খাবে?" মধুমতী নিরুত্তরে রহিল। বৃদ্ধা পুনরায় কহিল,—"এমনত কোথাও দেখিনি, না খেয়ে না খেয়ে মারা যাবে? কেন ভবনাথ বাঘ না ভাল্লুক, যে তাকে দেখে ভয় হয়? এই সে এসেছিল। ব'লে গেল যতদিন না বশে আসবে, ততদিন তাকে খেতে দেওয়া হবেনা, তাতে সে মরে যায় তাও ভাল।"

মধুমতী এইবার ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল,—"মরণ হ'লেত আমি বাঁচি।" হায়রে! একথা শ্রবণ করিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। মধুমতীর এই কথাটী শ্রবণ করিলে বোধ হয় মধুমতীর

কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, সে অনেক কষ্টে এই কথাটী মুখের বাহির করিয়াছে, আরও দু একটী কথা বলিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু সে আর কথা কহিতে পারিল না, তাঁর কথা কহিতে কষ্টবোধ হইল। বৃদ্ধা মধুমতীকে অনেক ক'রে বুঝাইল, কিন্তু মধুমতী কিছুতেই বুঝিল না, সে স্থির করিয়াছে যে এ বাড়িতে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভাল। বৃদ্ধা প্রদীপটী জানালায় রাখিয়া কহিল,—"তবে এই প্রদীপটা একটু আড়ালে রাখগে, নৈলে নিবে যাবে।" বৃদ্ধা এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল। মধুমতী প্রদীপটীর প্রতি চাহিয়া রহিল, প্রদীপটীকে গৃহের মধ্যে আনিবার ইচ্ছা হইল। সে ধীরে ধীরে উপবেশন করিল সত্য, কিন্তু সে দাঁড়াইতে পারিল না, অনাহারে তার মাথা ঘুরিতেছে, তার বোধ হইল যেন গৃহশুদ্ধ ঘুরিতেছে, সে আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না, অবশেষে চক্ষু মুদিত করিয়া রহিল।

ক্ষণকাল পরে মধুমতী একটু স্থির হইয়া দেখিল, যে সমস্ত ঘর অন্ধকার, বাতাসে প্রদীপটী নিবিয়া গিয়াছে, কেবল পোড়া সলিতার মুখে একটু আগুনের কণা দ্যাখা যাইতেছে, মধুমতী সেইটীই লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া রহিল, অল্পক্ষণ মধ্যে সে টুকুও শেষ হইল। অবশেষে সে জানালা দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। তার প্রাণে কত ভাবই উঠিতেছে, কত দুঃখই হইতেছে, কত কথাই মনে আসিতেছে। এই অন্ধকার গৃহে মধুমতী একাকিনী, অনাহারে জীবন্মৃতা, শত্রুশাসনে প্রপীড়িতা, পার্শ্বে এমন লোক নাই যে তাকে দুটো দুঃখের কথা বলে, পার্শ্বে এমন লোক নাই যে তার দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করে, দুঃখে দুঃখিত হয়, হতাশ প্রাণে আশ্বাস প্রদান করে। মধুমতী ধীরে ধীরে জানা-

লার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। জানালাটী গৃহের পূর্ব্বদিকে। আজ আবার কৃষ্ণাষ্টমী, দ্বিপ্রহরের প্রারম্ভেই চন্দ্রদেব সহাস্য বদনে পূর্ব্বগগণে উদয় হইতেছেন। দাঁড়াইয়া থাকিতে মধুমতীর কষ্টবোধ হওয়াতে জানালার উপর উপবেশন করিল। ক্রমে ক্রমে চন্দ্ররশ্মি বৃক্ষচূড়া অতিক্রম করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, গৃহটী আলোয় আলোকিত হইল। মধুমতীর অমল বদনে বিমল জ্যোৎস্না নিপতিত হওয়াতে মধুমতীর মুখ খানিকে দ্বিতীয়া চন্দ্রিমা সদৃশ জ্ঞান হইতে লাগিল। তার চক্ষে জল পড়িতেছে, আর মধ্যে মধ্যে এক একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। আলু-লায়িত কেশগুলি পবন ভরে থেকে থেকে মধুমতীর মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে, মধুমতীও অনিচ্ছায় চুল গুলিকে সরাইয়া দিতেছে। আত্মবিনাশ হেতু সে মনে মনে অনেক প্রকার ভাবিতেছে, কিন্তু গৃহমধ্যে এমন কোন দ্রব্য নাই যাতে সহজেই প্রাণ বাহির হয়। পূর্ব্বেও মধুমতী অনেকবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আহোরাত্র বৃদ্ধা নিকটে থাকাতে সে সে সুযোগ পায় নাই। বৃদ্ধা অতি সতর্ক ভাবে দিবানিশি মধুমতীর নিকটে থাকিত, ভবনাথও বৃদ্ধাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে বলিয়াছিল। কারণ ভবনাথ মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, যে ব্যক্তি একবার আপনার প্রাণ বিনাশের ইচ্ছা করিয়াছিল, সে যে পুনরায় সে ইচ্ছা না করিবে তার আর আশ্চর্য্য কি?

যাহা হউক, মধুমতী অনন্যোপায় হইয়া আপনার অদৃষ্টের বিষয় ভাবিতে লাগিল। একদৃষ্টে একদিকে চাহিয়া থাকিতে কষ্টবোধ হইল। অনাহারে মাথার ঠিক নাই, মুখখানি শুখিয়ে গেছে, শরীর অবশ হ'য়ে আসছে, তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। মধু-

মতী ধীরে ধীরে দেয়ালে পিঠ দিয়া জানালা ধরিয়া বসিয়া রহিল। জানালার দিকে মুখ ফিরাইবা মাত্র মধুমতীর শরীর শিহরিয়া উঠিল, থর থর করিয়া তার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, সে দেখিল জানালার সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় যমদূত সদৃশ এক ভীমপুরুষ দণ্ডায়মান। তার পরিধানে কৌপিন বস্ত্র, হস্তে একগাছি ক্ষুদ্র যষ্টি। পুরুষটী মধুমতীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মধুমতীও সভয় চিত্তে তার প্রতি চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে মধুমতীর আশঙ্কা দূর হইল, তার প্রাণে উদ্ধারের আশা আসিল, বিশুষ্ক মুখখানি আবার প্রফুল্ল হইল। মধুমতী সকাতরে তাহাকে কহিল,—"আমায় নিয়ে যাবার জন্তে কি রমানাথ কাকা তোমায় পাঠিয়েছে? তুমি না রমানাথ কাকার লোক?"

আগন্তুক অবাক! আগন্তুক মধুমতীকে চিনিতে পারিল না সত্য, মধুমতীর কথার ভাব বুঝিতে পারিল না সত্য, কিন্তু সে ভাবিল যে স্ত্রীলোকটী আমাদের সর্দ্দারের নাম জান্‌লে কি ক'রে? তবে কি এ আমাদের সর্দ্দারের কেউ হয়? হ'লেও হ'তে পারে, যাই হোক আমাকে জিজ্ঞাসা ক'ত্তে হ'ল। আগন্তুক মধুমতীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে তুমি?"

মধুমতী উত্তর করিল,—"তুমি কি আমায় চেননা? তা চেন আর নাই চেন, আমি তোমায় চিন্‌তে পেরিছি, তুমি আমায় কাকার কাছে নিয়ে চল, কাকা দেখ্‌লেই আমায় চিন্‌তে পার্ব্বে এখন।" আগন্তুক উত্তর করিল,—"আমি তাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে নিয়ে যেতে পারি না।"

মধুমতী কহিল,—"তবে কাকাকে বলগে যে তুমি যাকে

কোলে ক'রে মানুষ ক'রেছ, আজ সে বিপদে পড়েছে, আজ তার প্রাণ যাবার উপক্রম হ'য়েছে। মধুমতীর কথা শুনিয়া আগন্তুকের বিস্ময় জন্মিল, তার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, আর সে স্থির থাকিতে পারিল না, এক লম্ফে নিম্নে পতিত হইল। মধুমতী দাঁড়াইয়া দেখিবার উপক্রম করিল, কিন্তু আর তাকে দেখিতে পাইল না, কেবল দেখিল যে আরও দুটীলোক পার্শ্বস্থ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল।

পাঠক। এই আগন্তুটী দস্যু, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত রমানাথ সর্দ্দারের লোক। রমানাথ সর্দ্দারের দলস্থ একজন রমানাথকে বলিয়াছিল যে, বোধ হয় হুগলীর জমীদারের কোন ধনশালী আত্মীয় বাগান বাড়িতে বাস করিতেছে, কারণ আজ দুই তিন দিবস হইল বাগানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রহরী নিযুক্ত। রমানাথ সর্দ্দারের মনে এই ধারনা হইয়াছিল যে, বোধ হয় ভবনাথের অসদ্ব্যবহারে জমীদারদের কোন লোক পৃথক আলয় গ্রহণ করিয়াছে, অথবা ভবনাথ কোন রূপ জমীদারীর জাল কাগজ পত্র প্রস্তুত করাইতেছে, তাই সম্ভব, কেননা ভবনাথের স্বভাব অতি মন্দ, কাহার সর্ব্বনাশের জন্য সে সমস্ত কাগজ জাল করিতে পারে। যাই হোক তোমরা আগে বাগানে গিয়ে দেখবে যে সেখানে কোন আত্মীয় বসবাস করিতেছে, কিম্বা সেখানে দপ্তরখানা হ'য়েছে; যদি দ্যাখ যে সেখানে দপ্তরখানা হ'য়েছে, তাহ'লে সমস্ত কাগজ পত্তর আমার কাছে নিয়ে আসবে, আর তা না হ'লে অমনি অমনি ফিরিয়া আসিবে, কেননা এখন আমাদের টাকার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে দস্যুরা সর্দ্দারের কথামত এখানে

আসিয়াছিল। একজন বারাণ্ডায় উঠিয়া প্রথমে মধুমতীকে দেখিতে পায়, পরে মধুমতীর মধুমিশ্রিত কথা গুলিতে দস্যু হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তাই সে অন্যান্য দস্যুদিগকে বাগানের একটী নিভৃত স্থানে রাখিয়া আপনি এই অভিনব বিশেষ জ্ঞাপনার্থ সর্দ্দারের নিকট গমন করিল। দস্যুটীকে দেখিয়া মধুমতীর প্রথমে ভয় হইয়াছিল, পরে নির্ভয়চিত্তে সে যে এত কহিয়াছিল তার কারণ এই যে, দস্যুটীকে মধুমতী চিনিত। দস্যুও মধুমতীকে চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তার মনে এই সন্দেহ যে, মধুমতীর মৃত্যু হইয়াছে, সে আবার এখানে কি করিয়া আসিবে? রমানাথ পূর্ব্বে চন্দ্রবাবুর বাড়িতে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, এবং দস্যুটীও মধ্যে মধ্যে রমানাথের নিকট যাওয়া আসা করিত। রমানাথ মধুমতীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, তিলেকের জন্যে বুকথেকে নামাইত না, মধুমতীও রমানাথের নিকট থাকিতে ভালবাসিত এবং কাকা বলিয়া ডাকিত, রমানাথকে কাকা ভিন্ন আর কিছুই জানিত না। রমানাথ দস্যু বৃত্তিতে দশটাকা উপার্জ্জন করিলে পর রমানাথ স্বেচ্ছায় সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনার গ্রামে তেজারতি কর্ম্ম করে। ইহাতে লোকে জানিত যে রমানাথ সরকারী করিয়া চন্দ্রবাবুর নিকট হইতে যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছে, নচেৎ এত শীঘ্র এরূপ ধনশালী হইল কি প্রকারে? যাহা হউক, রমানাথ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও মধ্যে মধ্যে মধুমতীকে দেখিতে আসিত এবং কখন কখন আপন বাটীতে লইয়া যাইত। মধুমতী সেখানেও দস্যুটীকে দেখিতে পাইত। তাই মধুমতী ভাবিয়াছিল যে, বোধ হয় আমার উদ্ধারের জন্যে রমানাথ কাকা এই লোক-

টীকে পাঠিয়েছে, তাই সে দস্যুর সহিত নির্ভয়ে এত কথা কহিয়াছিল।

রাত্রি দুইটা বাজিল, এখনও মধুমতী জানালায় মুখ দিয়া বসিয়া আছে, তার প্রাণে কখন বা আশার উদ্রেক হইতেছে, আবার কখন বা নিরাশ তরঙ্গে ভাসিতেছে। একবার ভাবিতেছে যে লোকটা এখানে কি উদ্দেশে এসে'ছিল? এর সঙ্গেই বা এত লোক এসেছিল কেন? এরাত আমার উদ্ধারের জন্যে আসেনি, তাহ'লে আমায় নিয়ে গেলনা কেন? আবার ভাবিতেছে বোধ হয় রমানাথ কাকা আমার সন্ধানের জন্য যার তার বাড়িতে এই রকম লোক পাঠাচ্চে, তাই এরা এত রাত্তিরে এখানে এসেছিল। যাই হোক, এবার বোধ হয়, এসেই আমায় নিয়ে যাবে, আমার ভুল হ'য়েছে, লোকটাকে আমার পরিচয় দিলেই হ'ত। মধুমতী একমনে এই সমস্ত চিন্তা করিতেছে, এমন সময় দেখিল যে সম্মুখে সেই লোকটী দণ্ডায়মান এবং তার পশ্চাতে আরও তিন চারিটী লোক আছে। দস্যু জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কি তোমার কাকার কাছে যেতে ইচ্ছা কর?"

মধুমতী আগ্রহের সহিত উত্তর করিল,—"এক্ষুনি আমায় নিয়ে চল।"

দস্যু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"এ বাড়িতে আর কে আছে?"

মধুমতী উত্তর করিল,—"চাকোর দরওয়ান রাঁধুনী বামুন আর একটা বুড়ি মাগী।" দস্যুর এতক্ষণের পর স্থির বিশ্বাস হইল যে, এই স্ত্রীলোকটীর জন্যই বাগানে এত লোকজন রাখা হ'য়েছে তাই বাগানে অন্য লোকজন আসতে দেয়না। দস্যু

মধুমতীকে বাহিরে আসিতে বলিল। মধুমতী কহিল,—আমায় ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছে, আমি কি ক'রে বাইরে যাব? সকলের একমত হইল, সকলেই বলিল,—"তবে আর অপেক্ষা করা কেন?" জানালার লৌহদণ্ড ভাঙ্গিয়া মধুমতীকে বাহির করিল। মধুমতীর গাত্রস্পর্শ করিতে সকলের লজ্জা বোধ হইতেছে, কিন্তু তা বলিয়া কি করিবে। অবশেষে একজন একহস্তে মধুমতীকে বেষ্টন করিয়া অপরহস্তে লাঠির উপর ভর দিয়া লাফাইয়া পড়িল, দেখিতে দেখিতে তাহারা উদ্যান অতিক্রম করিয়া গমন করিল।

জানালা ভাঙ্গিবার সময় একটী ভয়ানক শব্দ হইয়াছিল, সেই শব্দে সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, কিন্তু তারা আসিতে না আসিতে এদিকে সমস্ত কাজ শেষ হ'য়ে গেল। বৃদ্ধা ত্রস্তভাবে আসিয়া দেখিল, যে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, আমারই মাথায় বাজ পড়েছে। বৃদ্ধা চিৎকার করিয়া সকলকে ডাকিল, সকলে আসিয়া দ্যাখে যে জানালা ভাঙ্গা মধুমতী নাই। প্রহরীরা সকলেই এক একটী মশাল জ্বালিয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিতে লাগিল। বৃদ্ধা প্রহরীদিগের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"তোদের মতন বেইমান লোক আর নেই, তোরা পাহারা থাক্‌তে কার ক্ষমতা জানালা ভেঙ্গে নিয়ে যায়? নিশ্চয় তোরা এর সব জানিস্।"

প্রহরীরা সভয়ে বলিল,—"মাঠাকরুণ এই তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমরা এর কিছুই জানি না, দোষের মধ্যে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।"

বৃদ্ধা কহিল,—"তা বেশ, বাবুকে বলিস্ যে তোরা ঘুমিয়ে পড়িছিলি। আমি কি ক'র্ব্বো, আমি এই ঠায় দুরাত জেগে,

আমার কি আর ঘুম পায়না? আমার কি আর মানুষের শরীর নয়?”

প্রহরীদের মুখে আর কথা নাই, সকলেই ভয়ে অস্থির। সকলেই বলিতেছে “এইবার আমরা মারা গেছি। বাবুর যে রকম রাগ, শুনেই আগেত আমাদের মেরে ফেলবে।” প্রহরীরা তন্ন তন্ন করিয়া বাগানের এক একটী বৃক্ষে উঠিয়া দেখিল, তবু তার সন্ধান পাইল না। আর উপায় নাই, উপায় স্থির করিবারও সময় পাইল না। এদিকে গুড় গুড় শব্দে গাড়ি আসিয়া উপস্থিত। ভবনাথ অপর্য্যাপ্ত সুরা পানে উন্মত্ত, সে অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও বারবিলাসিনীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া মধুমতী দর্শন লালসায় উপস্থিত। ভৃত্যগণ ভবনাথকে কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না, সকলেই গাড়ির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। ভবনাথ অতিকষ্টে টলিতে টলিতে গাড়ি থেকে নামিয়া একটী ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল,—“ঠান্‌দিদি কোথায়?”

বৃদ্ধা নিকটেই ছিল, সম্মুখে আসিয়া বলিল,—“কেন?” ভবনাথ নেশায় বিভোর, সে বৃদ্ধার কথায় উত্তর না দিয়া, পুনরায় বলিল,—“ঠানদিদি কোথায়?” প্রহরী ও অন্যান্য ভৃত্যগণ সকলেই স্থির করিল যে, আজ বাবু সুরাপানে উন্মত্ত, আজ বাবুকে যা বোঝান যাবে, বাবুও তাই বুঝবে সত্য, কিন্তু কি বলা যাবে? সকলেই এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময়ে একজন বৃদ্ধাকে ডাকিয়া বলিল,—“মাঠাকরুণ! তুমি একটা কাজ করগে, বাবুকে আর একটু মদ খাইয়ে দাওনাগা, তাহলে আর কিছুই দেখ্‌তে হবেনা, বাবু নেশায় পড়ে থাকবে এখন, তার

পর অটল বাবুকে আনিয়ে যাহয় একটা স্থির করা যাবে, অটল বাবু না হ'লে এর উপায় ঠিক ক'ত্তে পার্ব্বে না।"

সকলেই এইমত স্থির করিল, বৃন্দাও স্বীকৃত হইল। বৃন্দা ভবনাথের হাত ধরিয়া চলিল,—"মধুমতীর কাছে যাবে?"

ভবনাথ উত্তর করিল,—"হঁ্যা আমায় নিয়ে চল।" ভবনাথের সর্ব্বাঙ্গ টল মল করিতেছে, পদ বিক্ষেপের ক্ষমতা নাই। সকলে ধরাধরি করিয়া নিম্নতলস্থ একটী কক্ষে শয়ন করাইল। ভবনাথ কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, চক্ষু মুদিয়াই আছে, একবার বিকট চিৎকারে কহিল,—"কৈ মধুমতী এসেছে?" বৃন্দার অসাধ্য কিছুই নাই, সে এক্ষণে নিজেই মধুমতী হইয়া পার্শ্বে বসিয়া আছে। বৃন্দার সকল বিষয় জানা শোনা না থাক্‌লে সে আর এই মাতালের নিকট আসিতে সাহস করিত না, কাছে বসিতে সাহস করিত না, মাতালের গায়ে হাত দিতে সাহস করিত না।

ভবনাথের বেহারা মধ্যে মধ্যে বোতল বোতল মদ চুরি করিত তাই রক্ষা, তাই আজ সে একটী বোতল বাহির করিয়া গেলাসে মদ ঢালিতে আরম্ভ করিল ভবনাথ পুনরায় কহিল,—"কৈ মধুমতী এলনা?" পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৃন্দাই মধুমতী। বৃন্দা ভবনাথের গলা ধরিয়া একটু সকরুস্বরে কহিল,—"এই যে আমি, একটু মদ খাবে?"

ভবনাথ 'বাহোবা' বলিয়া হাত বাড়াইল, বেহারা মদ ঢালিয়া প্রস্তুত; বৃন্দা মদের গেলাসটী লইয়া একে বারে ভবনাথের মুখে ঢালিয়া দিল। ভবনাথ কখন এতটামদ একেবারে খায় নাই, আজ তার জ্ঞান নাই, আজ সে এক নিশ্বাসে সমস্তটা

খাইয়া ফেলিল। এদিকে ভৃত্যগণ বৃদ্ধাকে কহিল,—"দ্যাখ বাবু যদি না খেতে চায়, তাহ'লে তুমি জোর ক'রে আরও তিন চার গেলাস খাইয়ে দাও, আমরা বাইরে ব'সে আছি। এই বলিয়া সকলে বাহিরে আসিয়া অটলবিহারীকে আনাইবার উপায় দেখিতে লাগিল। বৃদ্ধাও মধ্যে মধ্যে ভবনাথের মুখে মদ ঢালিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ বৃদ্ধাকে একটু সাবধানে থাকিতে হইয়াছিল, কারণ ভবনাথ বৃদ্ধাকে আপনার প্রেম সোহাগী মধুমতী ভাবিয়া গ্রন্থিবিহীন বাক্যে অঙ্গ সঞ্চালন করিতেছিল। যাই হোক, সঙ্কোচচিত্তে আর বৃদ্ধাকে অধিক-ক্ষণ থাকিতে হইল না, ভবনাথ ক্রমে আপনা আপনি স্থির হইয়া আসিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দস্যুবাটী।

রাত্রি প্রায় তিন ঘটিকা, জ্যোৎস্না চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ছোট বড় তারকামালায় পরিশোভিত হইয়া নীলগগণের মধ্যে তলে সুবিমল শশধর বিরাজ করিতেছে। ধীরেন্দ্রনাথ ছাদে বসিয়া এক ভাবে আকাশের প্রতি চাহিয়া আছে। তার মনে কত ভাবই আসিতে লাগিল, কত কথাই উঠিতে লাগিল, কত আশাই হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে একখানি মেঘ আসিয়া চন্দ্রটীকে ঢাকিয়া ফেলিল, ধীরেন্দ্রনাথের প্রাণও অস্থির হইল। ক্ষণপরে পবনভরে মেঘখানি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভাসিয়া গেল, আবার চন্দ্রের হাঁসি প্রকাশ পাইল, আবার ধীরেন্দ্রনাথও উৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু এবার ধীরেনের চক্ষে জল আসিয়াছে। সে ভাবিতেছে, আহা! আমার হৃদয়শশীকে যে কাল মেঘে ঢাকিয়াছে, সে মেঘের ত ক্ষয় নাই, সে মেঘত এ মেঘের মত সরিয়া যাবে না, সে শশীত এ শশীর মত আর আমার হৃদয় গগণে শোভা পাবে না। হায়! সে হাঁসিমুখ খানিত আর দেখতে পাব না, এ জনমে আর তাকে পাব না। নয়ন জলে ধীরেনের বক্ষ প্লাবিত হইতে লাগিল, নিঃশব্দে অধোবদনে রোদন

করিতে লাগিল। একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আবার ভাবিতে লাগিল, যে, আহা! জলমগ্নের যে কি যন্ত্রণা তা আমি জানি, আমার প্রাণেশ্বরী'এর চেয়েও যন্ত্রণা ভোগ ক'রে প্রাণ পরিত্যাগ ক'রেছে। উঃ—সে সময়ে তার কত কষ্ট হ'য়েছিল। কঠিন প্রাণ কি সহজে যায়, যদি সহজে যেত তা হ'লে কি আমি বেঁচে থাকি? আমি পাষাণ, তাই এখনও বেঁচে আছি, আমার হৃদয় কঠিন, তাই এখনও বিদীর্ণ হ'চ্চেনা। দেখি, আর দিন কতক দেখি, যদি মধুমতীর জীবিত সংবাদ নাপাই, তাহ'লে আত্ম-হত্যা হ'ব। ইচ্ছা হয় যে একবার আমি নিজে গিয়ে অনুসন্ধান করি, কিন্তু এ যে বাড়িতে এসেছি, এ বাড়ি থেকে যে এ জীবনে বাইরে যেতে পাব, তার আর আশা নাই। বীরেন্দ্রনাথ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অধোবদনে রহিল।

এদিকে রমানাথ সর্দ্দার বহির্ব্বাটিতে বসিয়া নানাবিষয় চিন্তা করিতেছে, এমন সময় দস্যুগণ মধুমতীকে আনিয়া উপস্থিত হইল। মধুমতীকে দেখিতে পাইয়া রমানাথের আর আনন্দের সীমা রহিল না। "ওমা মধুমতি তুই?" এই বলিয়া রমানাথ মধুমতীকে কোলে তুলিয়া লইল।

মধুমতীও "কাকা আমি বেঁচে আছি" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল।

দস্যুগণ অবাক, তাহারা বুঝিতে পারিল যে, এরিই নাম মধুমতী, এই চন্দ্রবাবুর কন্যা, আমাদের সর্দ্দার এরই জন্যে আজ কদিন ধরিয়া ব্যাকুল। রমানাথ একটী দস্যুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"আমার মাকে কি তুমি তখন চিন্‌তে পারনি?"

দস্যু উত্তর করিল,—"আমি তখন চিন্‌তে পারিনি, কিন্তু

এখন বেশ চিন্‌তে পাচ্চি, আমি যে একে কতদিন কোলে ক'রে বেড়িয়েছি।"

মধুমতী কহিল,—"কেন, আমিত তখনি তোমায় চিন্‌তে পেরেছিলুম।" পশ্চাৎ রমানাথকে কহিল,—"কাকা! আমাদের বাড়ির খবর জান?"

রমানাথের চক্ষে জল পড়িতেছিল, রমানাথ সজল নয়নে উত্তর করিল,—"মা! সবই জানি, সকলে বেঁচে আছে এই মাত্র।"

মধুমতী আরও একটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু সেটী জিজ্ঞাসা করিতে আর পারিল না। সে কথাটী আর কিছুই নয়, সে কথাটী ধীরেনের বিষয়। রমানাথও কুশল সমাচারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরেনের মৃত্যুর বিষয় বলিবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু সেটী বলিতে আর সাহস করিল না, কারণ সে ভাবিয়াছে যে ধীরেনের মৃত্যু সংবাদ মধুমতীর পক্ষে বজ্রাঘাত বলিয়া বোধ হইবে। যাহা হউক, রমানাথ আর কোন কথা না কহিয়া মধুমতীর অবস্থা বিষয়ের সমস্ত জিজ্ঞাসা করিল। মধুমতীও আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিল এবং শেষ এই কথাটী বলিল যে,—"কাকা কাল রাত থেকে আমার খাওয়া হয়নি, আমার বড় খিদে পেয়েছে।"

ভবনাথ মধুমতীকে জল হইতে উত্তোলন করিয়াছিল শুনিয়া রমানাথের যে আনন্দটুকু হইয়াছিল, এখন আর সে আনন্দ নাই। শেষ কথাগুলি শ্রবণ করিয়া রমানাথের আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল, ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ক্রোধ বিকম্পিত স্বরে দস্যুদিগকে কহিল,—"আজ আর নয়, কাল রাত্রিতে ব্যাটার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেল্‌বি।" রমানাথের চক্ষু রক্ত

বর্ণ হইল, ক্রোধে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। ভবনাথের ঈদৃশ ব্যবহার শ্রবণ করিয়া দস্যুদিগেরও শিরায় শিরায় উষ্ণ শোণিত বহিতে লাগিল। জনৈক দস্যু ক্রোধান্ধ হইয়া কহিল, "কি! ব্যাটার এত বড় আস্পর্দ্ধা! ব্যাটাকে আজই মেরে ফেল্‌ব।"

রমানাথ হস্ত ধারণ করিয়া বলিল,—"আজ নয়, কাল হুগলীর জমীদারের বাড়ি লুঠ হবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটার মাথাটা ভেঙ্গে ফেলো।" এই বলিয়া রমানাথ অপর একজনকে কহিল, শ্যামঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করগে, কিছু খাবার আছে কি না? যদি না থাকে ত এখনি ভাত রান্না হোক। দস্যু বাড়ির ভিতর গিয়া "শ্যামঠাকুর! শ্যামঠাকুর" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। পাঠক! এইবার পূর্ব্ব বিষয় স্মরণ করুন। ধীরেন্দ্রনাথ দস্যু বাটীতে শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় নামে পরিচিত। "শ্যামঠাকুর শ্যামঠাকুর" বলিয়া ডাকিতে ধীরেন্দ্রনাথ ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ডাক্‌চ কেন?"

দস্যু। কিছু খাবার আছে?

ধীরেন। না—ভাত আছে।

দস্যু। জল দেওয়া ভাত ত?

ধীরেন। না—না, এই রাত্রি দশটার সময় যে ভাত রেঁধে-ছিলুম সেই ভাত আছে।

দস্যু। দুধ আছে?

ধীরেন। আমার খাবার দুধ আছে।

দস্যু। তুমি এখন খাওনি?

ধীরেন। না এইবার খাব মনে ক'চ্চি।

দস্যু। তবে একটু দাঁড়াও, আমি আসি।

দস্যু বহির্ব্বাটীতে গমন করিল। ধীরেনও একটী প্রদীপ জ্বালিয়া রন্ধনশালার দিকে গমন করিতেছে, এমন সময় একটী দস্যু আসিয়া চুপি চুপি ধীরেন্‌কে কহিল,—"ঠাকুর! তোমার মধুমতী এসেছে।"

ধীরেন বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"মধুমতী?"

দস্যু আবার কহিল,—"হ্যাঁ—হ্যাঁ—যার জন্যে দিন রাত কাঁদ, সেই মধুমতী, চন্দ্রবাবুর মেয়ে, মরেনি বেঁচে আছে।"

ধীরেন্দ্রনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল,—"এখানে এল কি করে?"

দস্যু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "ভগমান এনেছে, তুমি এখানে এসেছ কি ক'রে? আমাদের সর্দ্দার যে মধুমতীর কাকা হয়।"

ধীরেন্দ্রনাথ দস্যুর কোন কথার ভাব বুঝিতে পারিল না। সর্দ্দার হ'ল একজন পঞ্জাবী, সে মধুমতীর কাকা হবে কি ক'রে? ধীরেন্দ্রনাথ এইরূপ ভাবিতেছে এমন সময় পূর্ব্ব দস্যুটী আসিয়া কহিল,—"ঠাকুর শিগ্‌গির ক'রে ভাত বাড়।"

ধীরেন একবার নয়ন ফিরাইয়া দেখিল যে দস্যু একা আসিয়াছে, কৈ সঙ্গে ত কেউ নেই? যাই হোক আমার কাজ আমি করি, এই বলিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল। দস্যু স্থানটী পরিষ্কার করিয়া একখনি আসন পাতিল, এদিকে ধীরেনও এক খানি থালা করিয়া ভাত আনিল, কিন্তু যে খাবে সে কৈ? ধীরেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া রহিল। একন সময়ে আর একটী দস্যু আসিয়া কহিল, ঠাকুর ভাত বার বাড়িতে নিয়ে এস।" এবং

অপর দস্যুকে কহিল,—"তুই আসন খানা নিয়ে আয়।" তাহাই হইল, ধীরেন ভাত লইয়া দস্যুদিগের সঙ্গে সঙ্গে বহির্ব্বাটীতে গমন করিল। ধীরেন্দ্রনাথ সেই একদিন বহির্ব্বাটীতে গমন করিয়াছিল, আর এই একদিন যাইতেছে, নতুবা এর মধ্যে আর কোন দিন যাইতে পায় নাই।

দালানে আসন পাতা হইল, ধীরেনও আস্তে আস্তে ভাতের থালাটী রাখিয়া ত্রস্তভাবে এক গেলাস জল আনিয়া রাখিল। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ সে স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইল, কারণ দস্যু-দিগের নিকটে থাকিলে পাছে দস্যুপতি কোন কথা বলে। ধীরেন্দ্রনাথ অন্তরাল হইতে শুনিতে পাইল যে, কে যেন গৃহমধ্য হইতে এই কথা বলিল যে,—"যাও মধুমতী ভাত খাওগে।" ধীরেন্দ্রনাথ স্থির, তার সন্দেহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল, তবে কি সত্য সত্যই মধুমতী এখানে এসেছে? যাই হোক আমাকে দেখতে হ'ল। মধুমতী গৃহের বাহির হইয়া ধীরে ধীরে আসনে উপবেশন করিল। গৃহ মধ্য হইতে পুনরায় কে যেন এই কথাটী বলিল,— "মধুমতী! এ তোমার কাকার বাড়ি খেতে লজ্জা ক'রোনা।" মধুমতী আহার করিতেছে, ধীরেন আড়াল থেকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে এখন সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই সেই মধুমতী, এই আমার প্রাণেশ্বরী। ধীরেনের চক্ষে দুঃখ ও আনন্দ বিমিশ্র নয়নাশ্রু দরদর ধারায় নিপতিত হইতে লাগিল। তার ইচ্ছা হইল, একবার সে মধুমতীর কাছে যায়, মধুমতীর সঙ্গে সুখ দুঃখের দুটো কথা কয়, আত্ম কুশল মধুমতীকে জ্ঞাপন করে, কিন্তু হায়! তার সে আশা বৃথা, সে জানে যে গৃহ মধ্যে সর্দ্দার আছে, সর্দ্দার তার প্রতি পাছে রুষ্ট হয়, রুষ্ট হ'য়ে পাছে এতদপেক্ষা কষ্টে

ফেলে। কিন্তু প্রাণ যে তার বিচলিত হইয়াছে, সে যে আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছে না, তার হৃদয় যে আপনা হ'তেই অগ্রসর হইতেছে। ধীরেন্দ্রনাথ মধুমতীর নিকট গমন করিবার ইচ্ছা করিয়াছে, এমন সময় একটী দস্যু গৃহ হইতে বাহির হইয়া বলিল,—"ঠাকুর! তোমার দুধ এখন খাওনিত? সেই দুধ এনে দাও।" হায় রে! ধীরেন কি এবাক্যের অন্যথা করিতে পারে? অপর কাহার জন্য হইলে ধীরেন দুগ্ধের অর্দ্ধাংশ মাত্র আনিত, কিন্তু এ যে অন্য কেহ নয়, এ যে তার হৃদিগগণের ধ্রুবতারা, এ যে তার হৃদসর্ব্বস্ব প্রাণপ্রতিমা। ধীরেন ত্রস্তভাবে একবাটী দুধ আনিয়া ধীরে ধীরে মধুমতীর সম্মুখে রাখিল এবং জিজ্ঞাসা করিল যে,—"আর ভাত এনে দেব কি?"

মধুমতী 'না' বলিয়া মস্তক উত্তোলন করিল।

পাঠক! একি! মধুমতী যে এক দৃষ্টেই চাহিয়া আছে, মধুমতীর নয়ন যে পলক বিহীন হইয়াছে। ধীরেন্দ্রনাথ আর দাঁড়াইতে পারিল না। মধুমতীর ভাবের বিপর্য্যয় দেখিয়া ও পাছে আত্মভাব প্রকাশ হয় ভাবিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িল। ধীরেনের যে পদে পদে চিন্তা, তাকে যে এবাড়িতে অনেক সাবধানে থাকিতে হইতেছে, সে যে এ বাড়িতে আত্ম পরিচয় গোপন করিয়াছে। সে সর্ব্বদাই এই ভাবিতেছে, যে, যদি সর্দ্দার আমায় যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হয়, তাহ'লে আমার জীবনদাতাদের সর্ব্বনাশ হবে, তাহ'লে যাহারা আমায় রক্ষা করিয়াছে, যাহারা আমায় মৃত্যুমুখ থেকে ফিরাইয়া এনেছে, তারা যে চিরকালের জন্য সর্দ্দারের নিকট অবিশ্বাসী হবে, আমার জন্য তারা যে সর্দ্দারের কোপানলে প'ড়বে। আর আমার

সর্ব্বনাশ হবে, আমিও বিশ্বাসঘাতক মহাপাপে নিপতিত হব। মধুমতীর দারুণ সন্দেহ, সে এ আবার কাকে দেখ্‌তে পেলে? এযে তার প্রাণের ধীরেন, সে জানিত ধীরেনের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু, কৈ, তাত নয়?

মধুমতী আহার করিয়া পুনরায় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দস্যুপতি মধুমতীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মধুমতি! এখন তুমি এখান ঘুমুতে ইচ্ছা কর? না এই রাত্রে বাড়ি যেতে ইচ্ছা কর?"

মধুমতীর উভয় শঙ্কট। একদিকে পিতা মাতার তরে প্রাণ অস্থির, অপর দিকে এই ব্রাহ্মণ যুবকটীকে পুনরায় দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে। তার এক্ষণে এই ইচ্ছাই বলবতী হইল, সে সর্দ্দারকে কহিল,—"কাকা! এখন আমার কোন ভয় নেই. এ আমি কাকার বাড়িতে এসেছি। আর রাতও বেশি নেই, তখন কাল সকাল বেলা যাব।"

সর্দ্দার একজন দস্যুকে স্বতন্ত্র শয্যার আয়োজন করিতে বলিল। আজ্ঞা মাত্র সেই গৃহে শয্যা প্রস্তুত করা হইল। মধুমতী অনিচ্ছায় সেই শয্যায় শয়ন করিল এবং দস্যুপতি ও অন্যান্য দস্যুরা কেহ গৃহে কেহ দালানে স্ব স্ব ইচ্ছামত স্থানে শুইয়া রহিল।

অচিরাৎ সকলেই নিদ্রাভিভূত হইল. কিন্তু মধুমতীর আর নিদ্রা নাই। এখন আর তার অন্য চিন্তা নাই, সে কেবল সেই ব্রাহ্মণ যুবকটীর বিষয় ভাবিতেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই সেই ধীরেন্দ্রনাথ, সেই আকার প্রকার, সেই গঠন, সেই কণ্ঠস্বর, কিন্তু সে এ বাড়িতে এল কি করে? আর কাকাও তার কোন

কথাই ব'ল্লেনা। তবে কি কাকা তার মৃত্যুর বিষয় কিছু জানে না? জানে বৈকি, সে রাত্রিরে কাকা যে আমাদের বাড়িতে ছিল। তবে কি হ'ল—তবে কি এ ধীরেন নয়? তা হ'লে কাকা আমায় নিশ্চয়ই বোল্‌ত। যাই হোক কাল একবার কাকাকে জিজ্ঞাসা ক'র্ব্বো। মধুমতী এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে উঠিয়া বসিল। শয়ন করিয়া থাকিতে তার কষ্ট বোধ হইতেছে, ব্রাহ্মণ যুবকটীকে পুনরায় সন্দর্শন করিয়া সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত তার প্রাণ অস্থির হইয়াছে। মধুমতী ধীরে ধীরে একবার গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল এখন জ্যোৎস্না আছে সত্য, কিন্তু বাড়িটীর স্থানে স্থানে ভয়ানক অন্ধকার। বিশেষ সেই যুবকটী এখন কোথায় আছে, কোন গৃহে শয়ন করিয়া আছে তার কোন সন্ধান নাই। আরও একটা কথা এই যে, আমি যে তার কাছে যাব আর সে যদি ধীরেন না হয়। মধুমতী এই প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া আবার শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। নয়নাগমে নিদ্রা দেবীও অধিষ্ঠান হইলেন, কিন্তু সে নিদ্রা কতক্ষণ? জাগরণে বরঞ্চ ছিল ভাল, নিদ্রা আসাতে তার প্রাণ অস্থির হইয়াছে, প্রিয় সমাগম সুখস্বপ্নে তার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, সে একবার ব্রাহ্মণ যুবকটীকে দেখিবার নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়াছে। মধুমতী পুনরায় আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। এবার সে দেখিল ভোর হইয়াছে, আর অন্ধকার নাই, এখন সমস্ত স্পষ্ট রূপে দেখা যাইতেছে। মধুমতী ধীরে ধীরে প্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল, ছাদে যাইবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কোথা দিয়া যাইতে হয় তা জানে না, কেবল চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

এদিকে ধীরেন্দ্রনাথের ও প্রাণ অস্থির হইয়াছে। সে তার

প্রিয়তমাকে দেখিতে পাইয়াছে, কিন্তু কি করিবে, দেখা করিবার উপায় নাই, কথা কহিবার ক্ষমতা নাই, এখন সে পরাধীন। আজ আর ধীরেনের আহার হয় নাই, নিদ্রাও হয় নাই। সে স্থিরভাবে এক স্থানে বসিয়া আছে আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিতেছে, যে,—"হে ঈশ্বর! তোমার কৃপায় আমি মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছি, তোমারই কৃপায় পুনরায় মধুমতীকে দেখ্‌তে পেলেম, তোমারই কৃপায় আমার মধুমতী বেঁচে আছে।" এইরূপে ধীরেন কখন স্থির ভাবে বসিয়া ভাবিতেছে, কখন বা মধুমতীকে দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া এদিক ওদিক করিতেছে। ধীরেন্দ্রনাথ এইরূপে অস্থির হইয়া ছাদের উপর উঠিল, ছাদে উঠিয়া একেবারে বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গনের দিকে নিরীক্ষণ করিল। ধীরেনের আর নয়ন ফিরিল না। পূর্ব্বের মত পূর্ব্ব গগণের রক্তিমছটা আর তার নয়নাকৃষ্ট করিতে পারিল না, আজ সে শশধরের মলিনাধর দেখিয়াও দেখিতে ইচ্ছা করিল না, আজ তার নয়নদ্বয় অপূর্ব্বছবি সন্দর্শন করিয়া পলক বিহীন হইয়া আছে। ধীরেন্দ্রনাথ দেখিল যে মধুমতী প্রাঙ্গনস্থ একটী গোলাপ গাছের দিকে চাহিয়া আছে, উঁচু ডালে ফুল ফুটেছে তাই সে পাড়িতে পারিতেছে না, তাই সে একদৃষ্টে ফুলটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে। ফুলটীও যেন মধুমতীর কর কমলস্পর্শ করিবার জন্য ঈশৎ নিম্নমুখী হইয়া সোহাগ ভরে দুএক ফোঁটা আনন্দ নীর নিক্ষেপ করিতেছে। ধীরেনের প্রাণে হাসি আসিল, মধুমতীর মুখখানি দেখিবার নিমিত্ত অস্থির হইল, আবার ভয়ও হইতেছে, যদি দস্যুপতি দেখিতে পায়। অবশেষে যুবক ছাদ হইতে একটী কঙ্কর লইয়া মধুমতীর গায়ে নিক্ষেপ করিল, মধু-

মতীও ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিল, আর নয়ন ফিরিল না। যুবক ঈঙ্গিতে বাড়ির ভিতর আসিতে কহিল। মধুমতীর আর সন্দেহ নাই, নিঃসন্দেহ চিত্তে ভিতর বাড়িতে আসিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু, প্রবেশ পথের সন্ধান জানেনা, কেবল ইতস্তত ধাবিত হইতে লাগিল।

যুবক বাড়ির ভিতর আসিতে ইঙ্গিত করিয়াই আপনি নিচে আসিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না, অবশেষে আপনিই বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় স্বয়ং মধুমতীই সম্মুখে উপস্থিত হইল। উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়াছে। আর কাহার মুখে কথা নাই, দুজনেই নিরবে রোদন করিতেছে, দুজনই দুজনার চোখের জলে ভাসিতেছে। নবীন নীরদ যেন সুদিন পাইয়া তার চিরসঞ্চিত বারিভাণ্ডারটীর সহস্র দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে, সহস্র ধারায় যেন ধারাবর্ষণ করিতেছে।

পাঠক! এটী যুবক যুবতীর আনন্দাশ্রু? না উভয়ের নিমিত্ত উভয়ের অতীত যন্ত্রণা বিষয় স্মরণ হইয়াছে বলিয়া? অথবা উভয়ে অভিমান ভরে রোদন করিতেছে? আপনারা যাই বলেন বলুন, আমিত বলি, যুবক যুবতীর নয়ন নীরে তিনটী কারণই বর্ত্তমান আছে। যাহা হউক উভয়ে ক্ষণকাল নিরবে থাকিয়া, ধীরেন্দ্রনাথ মধুমতীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মধুমতি কেমন আছ?"

মধুমতি। আমি বেঁচে আছি। তুমি কেমন আছ?

ধীরেন। দেখ্‌তেই পাচ্চ কেমন আছি, কোথায় এসে র'য়েছি।

মধুমতী। তুমি এখানে কেন?

ধীরেন। সে অনেক কথা। ভাল তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এত রাত্রিতে এ বাড়িতে তুমি কোথা থেকে এলে?

মধুমতী। আমি যে কোথায় ছিলুম, আর এখানে কি ক'রে এলুম, তা তোমার জেনে কাজ নেই। তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি আগেকার মত আমায় ভালবাস?

ধীরেন। কেন মধুমতি! তুমি আমায় এ কথা জিজ্ঞাসা ক'ল্লে কেন? তুমি কি আমার কোন অন্য ভাব দেখেছ? মধুমতি! মৃত্যু হ'লে বোল্‌তে পারি না কি হয়, কিন্তু বেঁচে থাক্‌তে তোমায় আমি ভুল্‌তে পার্ব্বো না।

মধুমতী। তবে আমার বিষয় তোমায় শুনে কাজ নেই, শুন্‌লে তোমার মনে কষ্ট হবে।

এই বলিয়া মধুমতী ধীরেনের বুকের উপর মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। ধীরেনের প্রাণও কাঁদিয়া উঠিল। ধীরেন পুনঃ পুনঃ মধুমতীর দুঃখকাহিনী শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করাতে মধুমতী একে একে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া ভবনাথের অত্যাচারের বিষয় জানাইল। ধীরেন্দ্রনাথ ক্ষোভে রোষে বিজড়িত হইয়া সজল নয়নে মধুমতীর হাত ধরিয়া বলিল,— "মধুমতি! আমি বেঁচে নাই আমি মরে আছি, আমার দ্বারা কোন কাজ হবে না। সেই নরপিশাচ, যে সরলার সরল প্রাণে আঘাত দিয়েছে, তার আমি কিছুই ক'ত্তে পার্ব্বো না। মধুমতি! তুমি এ হতভাগ্যকে না ভালবেসে যদি আর কাকেও ভাল-বাস্‌তে, তা হ'লে বোধ হয় তোমায় এ যন্ত্রণা ভোগ ক'ত্তে হ'ত না।" এই বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথ আপনার অদৃষ্ট বিষয় চিন্তা করিয়া রোদন করিতে লাগিল। মধুমতী ধীরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা

করিল,—"তুমি এখানে এমন অবস্থায় কেন? বাড়ির সব কে কেমন আছে?"

ধীরেন্দ্রনাথ ও একে একে সমস্ত বর্ণনা করিয়া মধুমতীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মধুমতি! এ বাড়িতে তোমার কাকা কে? তাঁকে ব'লে আমায় উদ্ধার ক'ত্তে পার্ব্বে না?"

মধুমতী অবাক, তার মুখে আর কথা নাই। সে ভাবিতেছে, একি! ধীরেন এ বাড়িতে বন্দী! আমার প্রাণেশ্বর এ বাড়িতে বন্দী! বাড়ির বাহিরে যাবার ক্ষমতা নাই! একটু পরে আমার সঙ্গে আর কথা কইতে পাবে না! মধুমতী ধীরেনের হাত ধরিয়া কহিল,—"তুমি ভেবনা, আজ আমি কাকার সঙ্গে বাড়ি যাব, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে, কার ক্ষমতা তোমায় এখানে রাখে, এ আমার কাকার বাড়ি কাকাকে ব'লে তোমায় নিয়ে যাব।"

উভয়ে এইরূপ কথা কহিতেছে এমন সময়ে একটী দস্যু বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। ধীরেন দস্যুকে দেখিতে পাইয়া কহিল,—"ভাই এই আমার মধুমতী, তোমাদের দয়ায় পুনরায় মধুমতীকে দেখ্‌তে পেলুম।"

দস্যু। কেন কাল রাত্রিতেইত বলেছিলুম যে, তুমি যার জন্যে কাঁদ, তাকে আমরা নিয়ে এসেছি। তুমি ঠাকুর বিশ্বাস ক'র্ব্বেনা তা আমরা কি ক'র্ব্বো? সে যাক, মধুমতি! তোমার কাকা তোমায় ডাক্‌চে।

মধুমতী। তা যাচ্চি। কিন্তু এখানে আবার সর্দ্দার কে?

দস্যু। কেন, তোমার কাকা আমাদের সর্দ্দার।

মধুমতী। সর্দ্দার আমার কাকা? তবে তোমার ভয় কি?

কাকাকে ব'লে তোমায় নিয়ে যাব। কাকা আমায় ভালবাসে, আমার কথা কাকা ঠেল্‌তে পার্ব্বেনা।

দস্যু। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি যদি তোমার কাকাকে ব'লে পার, নৈলে আমাদের বল্‌বার কোন ক্ষমতা নেই।

মধুমতী। এসনা এখনই কাকাকে বলিগে।

ধীরেন্দ্রনাথ গমন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। অগত্যা দস্যুও মধুমতী সর্দ্দারের নিকট উপস্থিত হইল। সর্দ্দার মধুমতীকে দেখিতে পাইয়া কহিল,—"চল মা বাড়ি যাবে চল্।"

মধুমতী "হ্যাঁ—যাচ্চি" বলিয়া ধীরেন্দ্রনাথের বিষয় বলিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু বলিতে পারিল না, তার যেন লজ্জা আসিল, সে কি বলিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। শেষ বলিল,— "কাকা! তোমার বাড়িতে যে বামুনটী র'য়েছে ওকে কি তুমি চেননা?"

দস্যুপতি উত্তর করিল,—"কেন মা! ও কে?"

মধুমতী কি বলিয়া পরিচয় দিবে স্থির করিতে না করিতে পার্শ্বস্থ দস্যুটী বলিল,—"ও বামুনটী মনিরামপুরের উপেন মুখুয্যের ছেলে, ওই সেদিন গঙ্গায় ডুবে গেছলো।"

দস্যুপতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল,—"ও কি তবে ধীরেন?"

মধুমতী অবনত মস্তকে উত্তর করিল,—"হ্যাঁ।"

দস্যুপতি তৎক্ষণাৎ ধীরেনকে বাহিরে আনিতে কহিল এবং অবিলম্বে ধীরেনও আসিয়া উপস্থিত হইল। পরিচয় গোপনের নিমিত্ত ধীরেন ও অন্যান্য দস্যুদিগকে দুএকটা ভৎর্সনা করিয়া কহিল,—"তোমাদের প্রবঞ্চনায় আমাকেও কদিন ছদ্মবেশে থাক্‌তে হ'ল। যাহাহউক ধীরেন তুমি আমাদের আচার ব্যব-

হার সমস্ত জানতে পেরেছে, তাই বলি, তুমি এ কথা কাকেও প্রকাশ করনা। চল এখন বাড়ি যাওয়া যাক।"

ধীরেনের আনন্দ আর ধরেনা, সে বিশ্বাসের নিমিত্ত অনেক কথা কহিল এবং জীবন রক্ষার জন্য পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। দস্যুপতি একে একে ধীরেনের বিষয় অবগত হইয়া গৃহ গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হারা-ধন।

আজ পাঁচদিন হইল মধুমতীর কোন সন্ধান নাই। দারুণ সন্দেহ, মধুমতী জীবিত আছে কি তার মৃত্যু হইয়াছে সে বিষয় এখন কেহ স্থির করিতে পারে নাই। তার মৃত্যুই হোক আর সে বেঁচেই থাকুক, কিন্তু চন্দ্রবাবুর বাড়ির সকলেই মৃতপ্রায়। এক প্রকার সকলেই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে। প্রতিবাসীও অন্যান্য আত্মীয়গণ মধুমতীর অনুসন্ধানে বিব্রত। চন্দ্রবাবু বহির্ব্বাটীতে বসিয়া অধোবদনে নেত্রনীর নিক্ষেপ করিতেছেন। জনৈক প্রতিবাসী চন্দ্রবাবুর পুত্রটীকে লইয়া পার্শ্বে বসিয়া আছে, আর মধ্যে মধ্যে প্রবোধ বাক্যে চন্দ্রবাবুর দগ্ধ হৃদয়ে আশাবারি সিঞ্চন করিতেছে। শিশুটী পিতার ক্রোড়ে যাইবার ইচ্ছা করিতেছে, কখন হাঁসিতেছে কখন কাঁদিতেছে কিন্তু চন্দ্রবাবুর সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। অন্দরে একবার "মধুমতীরে তোর মনে এই ছিল" ইত্যাদি খেদসূচক শব্দে জনমাত্রেরই হৃদয় বিগলিত করিতেছে। বেলা এগারটা বাজিয়াছে, এখন কাহার স্নান পর্য্যন্ত হয় নাই, ইচ্ছাত নাই। জনৈক আত্মীয়া রন্ধনাদি সমাপন করিয়া স্নানের নিমিত্ত সকলকেই অনুরোধ করিতেছে, কিন্তু কেহই তার কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না,

কেবল 'হা মধুমতী' ব্যতিত আর অন্য কথা মুখে নাই। অন্বেষণ-কারীদের মধ্যে এক একজন ফিরিতেছে, আর বাড়ির ভিতর ক্রন্দনের রোল উঠিতেছে।

ইত্যবসরে গুড় গুড় শব্দে একখানি গাড়ি আসিয়া থামিল। চন্দ্রবাবু একবার মস্তক উত্তোলন করিয়া বাহিরের দিকে লক্ষ্য করিলেন। গাড়ির দরজা খোলা ছিল, চন্দ্রবাবু গাড়ির মধ্যে মধুমতীকে দেখিবা মাত্রই সানন্দে দৌড়িয়া যেমন ঘরের বাহিরে আসিবেন, অমনি তাঁর মস্তকে দরজার আঘাত লাগিল, কিন্তু সে গুরু আঘাতেও তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি দৌড়িয়া গিয়া মধুমতীকে আলিঙ্গন করিলেন, আবার দেখিলেন যে ধীরেন্দ্রনাথও উপস্থিত। চন্দ্রবাবুর মুখে আর কথা নাই, কেবল দুনয়নে দর দর ধারায় জল পড়িতে লাগিল। এদিকে চন্দ্রবাবুর ভৃত্যটী অন্দরে সুখ সংবাদ প্রদান করিয়াছে। "কৈ মা। কোথা তুই?" ইত্যাদি শব্দে সকলে ছুটিয়া আসিলেন। বাহিরে প্রতিবাসী-দিগের জনতা; তারাসুন্দরী দেবীর আজ আর লজ্জা নাই, তিনি আলুলায়িত বেশে মধুমতীকে ভুজলতায় আবদ্ধ করিয়াই দেখেন যে ধীরেন্দ্রনাথও উপস্থিত। আনন্দের আর সীমা নাই, হাস্য-মুখে আহ্লাদের চিহ্ন দেখা যাইতেছে, আবার দুটী চক্ষুও জলে ভাসিতেছে। মধুমতী ছুটিয়া শিশুটীকে কোলে তুলিয়া লইল। শিশুরও আনন্দের আর সীমা নাই, সে আজ কদিন ধরিয়া মধুমতীকে দেখিতে পায় নাই। আজ সে হাসিতে হাসিতে এক একবার মধুমতীর বুকের উপর মুখখানি রাখিতেছে, কখন বা মুখের দিকে চাহিতেছে, আবার পিতা মাতার দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিতেছে।

যাহা হউক, এক্ষণে সকলেই ইহাদের বিবরণ শুনিবার নিমিত্ত ব্যস্ত। ধীরেন্দ্রনাথ দস্যুবাটীর বিষয়টী গোপন করিয়া একে একে সমস্ত প্রকাশ করিল। কিন্তু মধুমতী কোন কথাই প্রকাশ করিল না। তার লজ্জা আসিয়াছে, বিশেষতঃ রমানাথ সর্দ্দার পূর্ব্বেই তাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছে। মধুমতী কাহার কোন কথায় উত্তর না দিয়া বাড়ির ভিতর পলায়ন করিল।

রমানাথ মধুমতীর সমস্ত ব্যাপার গোপন করিয়া কহিল যে,-"মধুমতী মৃত্যু কামনায় জলে ঝাঁপ দিয়াছিল সত্য, কিন্তু সেখানে অল্পজল থাকা নিমিত্ত মধুমতীর আর মৃত্যু হয় নাই, বরঞ্চ প্রাণের মায়ায় উলঙ্গাবস্থায়ই তীরে উঠিয়াছিল এবং সেই ভাবেই বাড়ির ভিতর আসিয়া স্বতন্ত্র বস্ত্র পরিধান করে। সে সময়ে ধীরেনের মৃত্যু সংবাদে সকলেই শোকাকুল, বাড়ির মধ্যে মহা কোলাহল, এ কারণ কেহই তাহাকে দেখিতে পায় নাই। সেও সেই অবসরে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া একাকিনী হুগলীর রাস্তা দিয়া চলিয়া যায়। এইরূপে দুদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। তৃতীয় দিবসে ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে চন্দননগরের একটী ব্রাহ্মণের বাড়িতে যায়, সেখানে আহারাদি করে, কিন্তু পরিচয় দেয় নাই, বরঞ্চ সেখান থেকে চলে যাবার উপক্রম করে, তাহারা মধুমতীকে সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা ভাবিয়া কিছুতেই ছাড়ে নাই। পরে কাল কথায় তাহারা পরিচয় প্রাপ্ত হয়। সেই গ্রামে আমার একটী বন্ধু আছে, সে আমার বাগানে যাইয়া আমাকে সংবাদ দেয়। আমি যখন মধুমতীকে দেখতে পেলুম, তখন রাত্রি নটা। সেই রাত্রেই নিয়ে আস্‌বার ইচ্ছা ক'রেছিলুম, কিন্তু

আস্‌বার কোন সুবিধা পেলুম না, শেষ আজ সকালে রওনা হলুম।" এরূপ কথা বলিবার রমানাথের অনেক উদ্দেশ্য ছিল, প্রধান উদ্দেশ্য ভবনাথের জীবন সংহার। যাহাহউক, রমানাথের কথায় সকলেই বিশ্বাস করিলেন। একে একে জনতা কমিল। শেষে রমানাথ বিরলে চন্দ্রবাবুকে মধুমতীর স্বরূপ বৃত্তান্ত কহিল। রমানাথের মুখে ভবনাথের অত্যাচারের বিষয় শুনিয়া চন্দ্রবাবুর আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। রমানাথ চন্দ্রবাবুকে কহিল,—"আপনি স্থির হোন, আমি আজ রাত্রিতেই ভবনাথকে শিক্ষা দিব।"

ধীরেন্দ্রনাথের বাড়ি যাইবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু চন্দ্রবাবু তাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। চন্দ্রবাবু বলিলেন,—"ধীরেন আর আমি তোমায় এ বাড়ি থেকে যেতে দেবনা, তোমার বাপ মাকে আমি এক্ষণি আনাচ্চি।" অগত্যা চন্দ্রবাবুর অনুরোধে ধীরেনকে থাকিতে হইল। রমানাথ ক্ষণকাল চন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মণিরামপুর গমন করিল।

মণিরামপুরেও এই অবস্থা, সকলেই শোকাকুল। উপেনবাবুর হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ধীরেনের সঙ্গে আর আর যাহারা জলমগ্ন হইয়াছিল, তাহাদের কাহারও বা মৃত দেহ পাওয়া গেছে, কাহাকেও বা জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেছে, কেবল ধীরেনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। সকলেরই বিশ্বাস, ধীরেনের মৃত্যু হইয়াছে। তবে তার মৃত দেহ?—হয়ত কোন জলজন্তু কিম্বা শৃগাল কুকুরে ভক্ষণ করিয়াছে। উপেনবাবুর সন্তানের মধ্যে একটী, তা থেকেও তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। বাড়ির ভিতর হৃদয়বিদারক শোকধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইয়া

যাইতেছে। বাহিরে উপেনবাবু চিৎকার করিয়া কাঁদিতে পারিতেছেন না সত্য, কিন্তু, তিনি যে কি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন. তা তাঁর নয়নজল আর দীর্ঘনিশ্বাসেই প্রমাণ হইতেছে।

রমানাথ সরকার উপস্থিত। উপেনবাবু অধোবদনে। উপেনবাবুর অবস্থা দেখিয়া রমানাথের চক্ষে জল আসিল, রমানাথ দেখিল, উপেনবাবু এক ভাবেই রহিয়াছেন. আর অপেক্ষা না করিয়া রমানাথ কহিল,—"মহাশয়। আপনার পুত্রের সংবাদ পাওয়া গেছে।"

উপেনবাবু মস্তকোত্তোলন করিয়া কহিলেন,—"এঁ্যা—কে তুমি? ধীরেন আমার বেঁচে আছে?"

রমানাথ কহিল,—"আজ্ঞে, আপনার পুত্র চন্দ্রবাবুর বাড়িতে আছে, আপনারা চলুন।"

উপেনবাবু উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া বাড়ির ভিতর সংবাদ দিলেন, আবার বাহিরে আসিলেন। কিন্তু এবার আর তিনি স্থির নন, ভদ্রেশ্বরে গমন করিবার নিমিত্ত তিনি দৌড়িবার উপক্রম করিতেছেন। রমানাথ উপেবাবুর ভাব গতিক দেখিয়া হস্ত ধারণ করিল। উপেনবাবু দাঁড়াইলেন তাঁর মুখে কথা নাই, তিনি কেবল রমানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমানাথ কহিল,—"আপনি এত উতলা হ'চ্চেন কেন? একটু অপেক্ষা করুন, এক সঙ্গেই যাওয়া যাচ্চে।"

উপেনবাবু একটু স্থির হইয়া বলিলেন,—"আমি ততক্ষণ নৌক ভাড়া করিগে।"

রমানাথ কহিল,—"আমি সে সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে এসেছি।"

এদিকে উপেন বাবুর স্ত্রী ও মাঠাকুরুণ নিদারুণ শোকা-

গ্নির ধূমমাত্র অবলম্বন করিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, ধীরেন বুঝি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহারা উন্মাদিনীর ন্যায় আসিয়া বলিলেন,—"ধীরেন কৈ?"

রমানাথ কহিল,—"ধীরেন ভদ্রেশ্বরে, আপনারা যাবার জন্য প্রস্তুত হন।"

সকলেই এক বাক্যে কহিলেন,—"এঁ্যা ধীরেন ভদ্রেশ্বরে? ধীরেন এখানে আসিনি?"

ধীরেনের মাতা অধৈর্য্য হইয়া কহিলেন,—"আমি যে আর দাঁড়াতে পাচ্চিনা গা, আমার ধীরেন যেখানে আমার সেই খানে নিয়ে চলনা গা।"

রমানাথ উপেনবাবুকে কহিল,—"মহাশয় তবে আপনারা চলুন।"

এই সময়ে উপেনবাবুর আত্মীয়গণ সেইখানে উপস্থিত, উপেনবাবু তাহাদিগকে গৃহ রক্ষার ভার দিয়া কহিলেন,—"ঘরের সব দরজা খোলা রইল, তোমরা দেখ, আমরা চ'ল্লুম।" উপেনবাবু একখানি উত্তরীয় পর্য্যন্ত লইলেন না, উন্মাদের ন্যায় ঘাট অভিমুখে চলিলেন। উপেনবাবুর আত্মীয়দিগের মধ্যে অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রেশ্বরে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন।

নিকটেই গঙ্গারঘাট, নৌকা প্রস্তুত, সকলে আসিয়াই নৌকায় উঠিলেন। সকলের ইচ্ছা যে নৌকা নিমিষের মধ্যে ভদ্রেশ্বরের ঘাটে উপস্থিত হয়, কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা স্বভাবের অধীন। গঙ্গায় ভাটা পড়িয়াছে, নৌকা উজান চলিল। উপেনবাবু ইত্যাদি সকলেই এইবার ধীরেনের ঘটনাবলী ও মধুমতীর বৃত্তান্ত রমানাথের মুখে শুনিতে আরম্ভ করিলেন। রমানাথও

বিশেষ রূপে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। এদিকে মাঝিরা বহু পরিশ্রমে ভদ্রেশ্বরের ঘাটে নৌকা লাগাইয়া কহিল,—"ঘাটে এসেছি, নাবুন না গো।"

চন্দ্রবাবুর বাটী ঘাটের সন্নিকটে, অবিলম্বে সকলে চন্দ্রবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধীরেন্ পিতা মাতাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তাঁরাও চক্ষের জলে ভাসি[illegible]। তার.সুন্দরী দেবী উপেনবাবুর স্ত্রীকে বলিলেন,—[illegible] আমরা হারান ধন পেয়েছি।"

আনন্দের আর পরিসীমা নাই [illegible]ন্দ্রবাবু উ[illegible] বাবুকে বলিলেন,—"উপেন বাবু! বোধ হয় জগদীশ্বর অ[illegible]র প্রতি সানুকূল, তাই আমরা আবার ধীরেন আর মধুম[illegible] দেখতে পেলুম. তাই আমরা আবার ওদের কোলে ক'রে ঠাণ্ডা [illegible]ম। তাই বলি, আর কেন? অপেক্ষার আর প্রয়োজন নেই, কা[illegible] আমি আমার মধুমতীকে ধীরেনের হাতে সমর্পণ কর্ব্বো, কি বলেন?"

উপেনবাবু কহিলেন,—"আমার কোন আপত্তই নাই, আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন।" উভয়ের ইচ্ছা এক হইল।

দিবা অবসান দেখিয়া রমানাথ ভাবিল, আর এখানে থাকিব না, একবার স্বদলে হুগলীর জমীদারের বাড়িতে যাওয়া যাক, ভবনাথকে পিশাচবৃত্তির প্রতিফল দিয়ে আসা যাক্। এই ভাবিয়া রমনাথ উপেনবাবুর নিকট বিদায় লইবার ইচ্ছা করিতেছে, এমন সময় দস্যুদিগের মধ্যে একজন আসিয়া কহিল,—"ভবনাথের মৃত্যু হইয়াছে।"

রমানাথ দস্যুকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ভবনাথের কি ব্যায়রাম হয়েছিল?"

পাঠক! ভবনাথের মৃত্যু যে কি কারণে হইয়াছে, তাহা আর অধিক বলিতে হইবে না। বৃদ্ধা ভবনাথকে গত রাত্রে বার বার সুরাপান করাইয়া ভাবিয়াছিল যে, ভবনাথ সুরাপানে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছে, কিন্তু তা নয়; অতিরিক্ত সুরাপানে ভবনাথ জীবন হারাইয়াছে। বৃদ্ধা ভবনাথকে স্থির ভাবে থাকিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে গৃহের বাহিরে আসে এবং অন্যান্য ভৃত্যদিগকে বলে, যে বাবু একবার নেশায় বিভোর হ'য়ে আছে, এই বেলা তোমরা অটলবিহারীকে আনাইয়া একটা উপায় স্থির কর। ভৃত্যগণ তখনই অটলের নিকটে লোক পাঠাইয়াছে। অনতিবিলম্বে [illegible] লোকটী ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তার সঙ্গে অটলবিহারী আসে নাই। সে আসিয়া বলিল,—"অটলবাবু নেশায় [illegible] তাঁকে বল্লুম, তা তিনি আমার কোন কথায় উত্তর না দিয়ে বল্লেন, এত রাত্রে তুই কে এসেছিস্? জানিস্ আমি স্বয়ং শিব, পাণ্ডব শিবির রক্ষা ক'চ্চি? তোর কথায় কি আমি এখান থেকে উঠি?" তাই আমি দেখে শুনেই অবাক, শেষ চ'লে এলুম। ভৃত্যগণ ভাবিতে লাগিল, তাইত তবে কি হবে? যাই হোক, তাকে নিয়ে আস্‌তেই হবে। এই বলিয়া পুনরায় অন্য দু একটী ভৃত্য অটলকে আনিতে যায় এবং অনেক কষ্টে সেই উন্মত্ত অবস্থাতেই তাকে নিয়ে আসে। ভৃত্যেরা অটলের মাথায় জল ঢালিতে ঢালিতে অটলের নেশা ছুটিয়া যায়। ভৃত্যেরা তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বলে এবং অটলও তাহাদের আশ্বাস দিয়া ভবনাথের নিকটে যায়। অটলবিহারী ভবনাথকে তুলিবার

নিমিত্ত তু একটী ধাক্কা দেয় এবং দেখে যে ভবনাথ অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রাভিভূত, ইহজীবনে আর চেতনা হইবে না। অটলবিহারীর যা একটু নেশার ঘোর ছিল, তা এইখানেই পরিষ্কার। পরে সকলেই জানিতে পারিল যে ভবনাথের মৃত্যু হইয়াছে। ভবনাথ আপনার কর্ম্ম দোষে এই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এরূপ প্রকৃতির লোক জীবিত থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল। এই দ্বিপদ পশুরা কেবল পৃথিবীর ভার স্বরূপ, আর জন সাধারণের যন্ত্রণাদায়ক। পরে অপঘাত মৃত্যু হেতু পুলিসের যে সমস্ত হাঙ্গামা ঘটে, তাহাই ঘটিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবনাথের পাপ সহচর ও সহচরীরাও পুলিস কর্ত্তৃক পাপের ভোগ ভুগিতে লাগিল। যাহা হউক, উপস্থিত দস্যুটী ভবনাথের সন্ধান লইতে গিয়া এই সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়াছিল, তাই সে সানন্দে এই সংবাদ রমানাথকে প্রদান করিল। এ সংবাদে রমানাথের অতিশয় আনন্দ হইল, কিন্তু চন্দ্রবাবু একটু দুঃখিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে, এত দিনের পর হুগলীর জমীদারের নাম ডুবিল, এত দিনের পর কমলাকান্তের বংশ নির্ব্বংশ হইল। উপেনবাবু এ সমস্ত কথার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তার কারণ উপেনবাবু মধুমতীর স্বরূপ ঘটনাটী জানেন না।
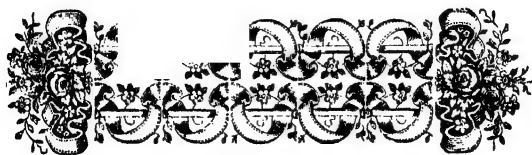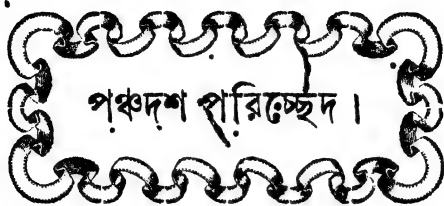
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আশা পুরিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে। চন্দ্রবাবুর বাটীতে আবার বিবাহের ঘটা, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় এ বিবাহে আর সমারোহ ব্যাপার ঘটিল না। প্রতিবাসীমণ্ডলীতেই বাড়ি পরিপূর্ণ। আজ বিবাহের যোগ নাই, শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন, তাই রক্ষা। শুভলগ্ন থাকুক আর নাই থাকুক, রাত্রিকালে বিবাহ কার্য্যে বাধা নাই। চন্দ্রবাবু এই পথই অবলম্বন করিয়াছেন। বাড়ি আসা অবধি ধীরেন্দ্রনাথ ও মধুমতী উভয়ের কোন কথা বার্ত্তা হয় নাই। উভয়েরই লজ্জা আসিয়াছে। মধুমতী আর বিরলে কথা কহিবার ইচ্ছায় ইতস্ততঃ করিতেছে না, ধীরেনও মধুমতীকে আর কোন বিষয় বুঝাইবার জন্য উৎসুক হইতেছে না। তাদের প্রাণের মধ্যে একটী বিমল ভাব আসিয়াছে, সেই ভাবেই তারা মত্ত। উভয়ে এক বাড়ির মধ্যে থাকার জন্য মধ্যে মধ্যে উভয়ের নয়নে নয়নে সম্মিলন হলেই একটু হাসিয়া ফেলে, কিন্তু সে হাসি অল্পক্ষণই বাহিরে প্রকাশ পায়। ধীরেন্দ্রনাথ বহুকাল হ'তেই হাঁসি চাপিয়া রাখিতে শিখিয়াছে, মধুমতীও আজ কাল হাঁসির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

কুলকামিনীরা মধুমতীকে লইয়া নানা প্রকার রহস্য করিতেছে। যার যা মনে আসিতেছে, সে তাই বলিতেছে, কিন্তু মধুমতী কাহার কোন কথার উত্তর দিতেছে না। মধুমতীকে আবার বিবাহের সাজে সাজান হইল, কিন্তু এবার তারা স্বধু মধুমতীকে সাজাইয়া পরিত্রাণ পাইল না। চন্দ্রবাবুর মাতাঠাকুরাণী আসিয়া বলিলেন,—"ও দিদি!" তোমরা কি স্বধু আমার মধুমতীকে সাজাবে? আর বরকে সাজাবে না? এস এস, তোমরা না হ'লে আর এখানে লোক কে?"

এই বার যুবতীদের মহাবিপদ, তারা কি ক'রে ধীরেনকে সাজাবে? এইবার পরস্পর গা টেপা টিপি চলিল। কেহ বলিতেছে, "নবৌ যা না ভাই।"

নবৌ অমনি বলিল,—"কেন তুমি সাজাওগে না? আমি বরঞ্চ তোমার পেছনে থাক্‌ব এখন।"

অপর একজন কহিল,—"হ্যাঁগা যাদের বাড়িতে বর এখন রয়েছে, তারা কি সাজিয়ে দিতে পারে না?"

চন্দ্রবাবুর মাতাঠাকুরাণী বলিলেন,—"বিনোদের মা কি এখানে আছে? সে থাক্‌লে কি আর ভাবতে হ'ত? বিনোদের বৌ ছেলে মানুষ, সে বলে আমি কপালে চন্দনের ফোঁটা দেবো, আর সে যে আমার মুখপানে চেয়ে থাক্‌বে, তা আমার দ্বারা হবে না।"

প্রশ্নকারিণী অমনি বলিল,—"তা আমরা না হয় পেছনে থেকে বরের চোখ টিপে ধ'রে থাকব এখন।" এই কথা শুনিয়া যুবতীদের হাসি আর থামিল না, চন্দ্রবাবুর মাতাঠাকুরাণীও হাসিয়া ফেলিলেন।

অবশেষে একজন কহিল,—"আমরাও যাচ্চি চল, আর শরতের মাকে বলোগে, সে বেশ সাজিয়ে দেবে এখন।" তাহাই স্থির হইল। চন্দ্রবাবুর মাতাঠাকুরাণী "এই ভাল" বলিয়া চলিয়া গেলেন, যুবতীদের মধ্যেও দু একজন সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। পাঠক! ধীরেন আজ বৈকাল হইতে এ বাড়িতে আর নাই। চন্দ্রবাবুর বাটীর পার্শ্বস্থ বিনোদ চক্রবর্ত্তীর বাটীতে ধীরেনকে রাখা হইয়াছে, ধীরেন তাদেরই বাড়ি থেকে বিবাহ করিতে আসিবে।

এদিকে বাড়ির ভিতর বিবাহের আয়োজন হইতেছে। পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া 'কি নাই, কি চাই' তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যালোচনা করিতেছেন। চন্দ্রবাবু আসিয়া বলিলেন,—"বরকে কি এ বাড়িতে আনাব?"

পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন,—"বেশত, একেবারে বাড়ির ভিতর নিয়ে এস।"

চন্দ্রবাবু ধীরেনকে আনাইবার জন্ত একটী লোককে পাঠাইয়া দিলেন। অবিলম্বে বর বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। অন্দরে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল।

চন্দ্রবাবু উপেন বাবুকে কহিলেন,—"উপেন বাবু! তবে আর অপেক্ষা কেন? আমাকে অনুমতি দিন?"

উপেন বাবু চন্দ্রবাবুর হাত ধরিয়া বলিলেন,—"চন্দ্রবাবু! আপনি সমস্ত কাজে আমার অপেক্ষা ক'চ্চেন কেন?"

একজন প্রতিবাসী বলিলেন,—"চন্দ্রবাবু আমাদের বিবেচক লোক, আপনার সঙ্গে হাজার প্রণয় থাকুক না কেন, তবু উনি অবিবেচনার কাজ কর্ব্বেন না?"

যাইহোক, নাপিত বর লইয়া বাড়ির ভিতর গমন করিল। বিবাহ স্থলের একদিকে গ্রামের বালক বালিকাদিগের জনতা, অপর দিকে প্রৌঢ়া, নবোঢ়া, যুবতী ইত্যাদি কামিনীগণ সকলেই স্থির দৃষ্টে সম্প্রদান কার্য্য সন্দর্শন করিতেছে। চন্দ্রকুমার বাবু মধুমতী ও ধীরেনের হস্ত একত্রিত করিয়া কন্যা সম্প্রদান কার্য্য সমাপ্ত করিলেন। এতদ্দিনের পর তিনি তাঁর প্রাণের মধুমতীকে অপরের হস্তে সমর্পন করিলেন। চন্দ্রবাবুর চক্ষে জল আসিল। তাঁর চোখে জল আসিবার অনেক কারণ। স্থধু যে মধুমতীকে অপরের হস্তে সমর্পণ করিলেন বলিয়া কাঁদিলেন, তা নয়, আজ তাঁর প্রাণের মধ্যে একটী অপূর্ব্ব ছবির ছায়া পড়িয়াছে, আজ তিনি তাঁর প্রথমা স্ত্রীর বিষয় ভাবিতেছেন। অবশ্যই দুঃখ হইতে পারে। আহা! এ আনন্দের দিনে যদি যথার্থই মধুমতীর মাতা ঠাকুরাণী উপস্থিত থাকিতেন, তা হ'লে আজ তাঁর কত আনন্দ, আজ তিনি স্বচক্ষে দেখিতেন, যে, তাঁর স্নেহলতিকাটী সহকারের আশ্রয় গ্রহণ করিল। চন্দ্রবাবু চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে স্ত্রী আচার ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য শেষ হইল।

* * * *

বহির্ব্বাটীতে ভোজনের বিরাট ব্যাপার। অন্দরে বাসরের অমিয় উচ্ছাস। বাসর আসনে বর ক'নে বসিয়া আছে, আর চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া কুলকামিনীরা কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া রহস্যের তরঙ্গ ছুটাইতেছে।

ধীরেন্দ্রনাথ নীরব, কাহারও কোন কথার উত্তর দান করিল না, বরং অধিকতর লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

একটী নবীনা সহাস্যে কহিল,—"বর যে কথা কয় না ভাই! বোবা নাকি লো?"

অপরা কহিল,—"কথা কইয়ে নৈনা?"

তৃতীয়া কহিল,—"বর যে আমাদের চেনা, কে বলে বোবা রে?"

প্রথমা হাসিতে হাসিতে কহিল,—"এই আমি। বোবা নইলে একটী কথারও উত্তর দেয় না কেন?"

তৃতীয়া ধীরেন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"শুন্‌ছো ভাই! ছুঁড়িরে কত ঠাট্টা কচ্ছে?"

ধীরেন্দ্রনাথ একটু হাসিল, কোন কথা কহিল না, দেখিয়া পুনরায় তৃতীয়া কহিল,—"একটী গান কর না ভাই!"

অপরা কহিল,—"কথাই কওয়াতে পাল্লি না, তায় আবার গান।"

তৃতীয়া কহিল,—"তোরা চারিদিক থেকে তাড়া কল্লে হবে কেন? সবুর কর না, আমি সব কচ্ছি।" পরে ধীরেন্দ্রনাথকে কহিল,—"একটী গান কর না ভাই?"

ধীরেন্দ্রনাথ এইবার কথা কহিল, বলিল,—"আমি গান জানিনা, আপনারা গান করুন।"

তৃতীয়া কহিয়া উঠিল,—"ভাই তোমার মিথ্যা কথা, গান জানে না, এমন একটী লোক দেখাও দেখি?"

ধীরেন্দ্র। এই আমি একটী।

শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। ধীরেন্দ্রনাথ কহিল, "লেখা পড়ায় সময় কাটাইয়াছি, গান শিখ্‌তে সময় পাই নাই।" আবার সকলে হাসির তরঙ্গ ছুটাইয়া দিল।

তৃতীয়া তখন প্রথমাকে কহিল,—"তুই একটা গান করতো ভাই, তার পর বরকে গাওয়াব।"

প্রথমা। বেচে বেচে লোক ঠিক কল্লে ভাল। গাইলে কিছু পাব কি?

দ্বিতীয়া। পাবে বৈকি?

প্রথমা। ফুরনটা হয়ে যাক না কেন?

দ্বিতীয়া। আমারটীকে তোমায় দেব।

প্রথমা। অভ্যাস ভাল লো!

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল। প্রথমা দ্বিতীয়ার ননন্দা।

তৃতীয়া কহিল,—"নে এইবার গানা ভাই! ফুরনতো হয়ে গেল।"

প্রথমা। তুইতো ঐ দলের, সমান ব্যবসায়ী কিনা?

তৃতীয়া। একটা গান কর ভাই। জানিস্ তাই এত খোসামুদী। আমি জান্‌লে এতক্ষণ কত গাইতুম।

প্রথমা। না জেনেই পাগল করে রেখেছ, জান্‌লে না জানি কি কত্তে।

তৃতীয়া। জান্‌লে কি আর তোমার কাছে যাতায়াত কত্তে দিই।

প্রথমা। মুখে আগুণ তোমার।

তৃতীয়া। আচ্ছা ভাই! আমার মুখে হাজার বার আগুণ লাগুক, তুই ভাই একটা গান কর।

পুনঃ পুনঃ সকলের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া প্রথমা তখন বীণানিন্দিত স্বরে পঞ্চমে তান তুলিয়া গান আরম্ভ করিল।

ইমন—মধ্য।

হেরে ও বয়ান, জুড়াই তাপিত প্রাণ,
এস হে বঁধু এস এস।
হৃদয় সিংহাসন শূন্য আছে হে রাজা হয়ে ব'স ব'স।
সেই ভাবে এ হৃদয়ে আবার এসে ব'স ব'স।
দারুণ বিচ্ছেদের নিদয় শাসন হে, আসি তারে নাশ২।
এবার জন্মের মতন এসে তারে নাশ।
প্রেমের কাছে ঋণ, আছে বহুদিন,
মিলন ধন, দিয়ে তোষ।
পুরাও হে প্রেমদাসীর মন অভিলাষ॥

গীত সমাপ্ত হইলে সকলে আবার অনুরোধ করিতে লাগিল। শুনিয়া প্রথমা কহিল,—"আমি আর গাইব না, বর একটীবারও গাইতে অনুরোধ কল্লে না, আমি উপযাচক হয়ে গাইতে যাব কেন?"

ধীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া উত্তর করিল,—"বড় সুন্দর গান, আপনি আর একটী গান করুন।"

তৃতীয়া কহিল,—"এইবার গানা ভাই বর অনুরোধ কচ্ছে।"

প্রথমা "আচ্ছা" বলিয়া পুনরায় আর একটী গান আরম্ভ করিল।

কালাংড়া—তিওট।

অনেক যতনে প্রাণ তোমারে পেয়েছি।
বিরহ অনলে আমি সদা জ্বলেছি॥

জনরব বিষধর, খাইয়াছি নিরন্তর,
মিলন অমিয় পানে, এবে বেঁচে আছি।

পুনরায় অনুরোধ আরম্ভ হইল। প্রথমা আবার গাহিল।

যোগিয়া গান্ধার—জলদতেতালা।

কেমনে রহিবে প্রাণ দেখিতে তোমারে।
চকোরী কি হয় সুখী না হেরে শশীরে॥
প্রাণ বিনে শূন্য দেহ থাকে কি প্রকারে।
শশী বিনে নিশি কোথা, বল শোভা করে॥

গীত সমাপ্ত হইলে তৃতীয়া কহিয়া উঠিল,—"আলবৎ বক্‌সিস পেতে পারিস্। এই শনিবারে সে বাড়ী এলে অবশ্যই দেবো। আচ্ছা সেই কীর্ত্তনটা হয়ে যাক, পছন্দ হ'লে আমার শ্রাদ্ধের সময় বায়নাটা করে ফেল্‌ব এখন।"

প্রথমা। তোর শ্রাদ্ধে অম্‌নি গাইব, কিছু নেব না।

তৃতীয়া। তোর দাদারই সুসোর। এখন কীর্ত্তনটা চলুক।

প্রথমা হাসিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিল।

কীর্ত্তনাঙ্গ।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বান্ধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

সখিরে, কি মোর করমে লেখি;
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
রবির কিরণ দেখি।
উচল বলিয়া, অচলে পড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমি চাহিতে দারিদ্র বেড়ল,
মাণিক হারানু হেলে।
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
বরজ পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে, কানুর পিরীতি,
মরণ অধিক ভেল।

গান কয়টী শুনিয়া সকলে সুখ্যাতি করিল, ক্রমে নানা প্রকার রসালাপে যামিনীও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

নিতম্বিনীদিগের মধ্যে একজন কহিল,—"ভাই আজ হ'তে মধুমতী আর আমাদের নয়, আজ হ'তে মধুমতী তোমার, মধুমতীকে একটু যত্ন ক'রো, আমাদের আদরের মধুমতীকে যেন অনাদর ক'রোনা।"

যুবতীর কথা শুনিয়া ধীরেন মনে মনে একটু হাসিল। সে ভাবিল, মধুমতীকে আমি আবার অযত্ন ক'র্বো?—আমার মধুমতীকে আমি আবার অযত্ন ক'র্বো?—আমার মধুমতীকে আমি আবার আদরে রাখবোনা? যাই হোক রাত্রি শেষ হইয়াছে, দেখিয়া যুবতীরা একে একে বাসরগৃহ পরিত্যাগ করিল। নব দম্পতীরাও পরিত্রাণ পাইল।

গৃহে আর কেহ নাই, কেবল ধীরেন ও মধুমতী। মধুমতী এখনও বস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া আছে। ধীরেনের প্রাণ অস্থির হইয়াছে, ধীরেন নিজহাতে মধুমতীর মুখের বসন খুলিয়া বলিল,—“মধুমতি! এত দিনের পর কি আমাদের বাসনা পূর্ণ হ'ল?”

মধুমতীর এক্ষণে বিষম লজ্জা, সে কথার কোন উত্তর না দিয়া একটু হাঁসিয়া ফেলিল, ধীরেনও মধুমতীর ভাব দেখিয়া হাঁসিয়া ফেলিল। ধীরেন পুনরায় মধুমতীকে কহিল,—“মধুমতি! আমার কথায় উত্তর দিচ্চনা যে?”

মধুমতী আর কিছু না বলিয়া আপনার গলার মালাছড়াটী লইয়া কহিল,—“দেখ তখন যে তোমার গলায় মালা দিয়েছিলুম, তাতে আমার আশা মেটেনি, এস এখন একবার তোমার গলায় মালা পরিয়ে দিই।” এই বলিয়া মধুমতী মালা ছড়াটী ধীরেনের গলায় পরাইয়া দিল, ধীরেনও আপনার গলার মালাছড়াটী মধুমতীর গলায় পরাইয়া দিল। একবার উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিল, উভয়েই হাঁসিয়া ফেলিল। আজ নব দম্পতীর সুখের আর সীমা নাই, আজ তাহাদের হৃদয়ে আনন্দের আর পরিশেষ নাই। ধীরেন মধুমতীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিল, “মধুমতি! আমি পূর্ব্বে ভেবেছিলুম, তুমি অপরের, তা নয়, তুমি আমারিই।

মধুমতী একটু হাসিয়া বলিল,—“এই কথাটী যেন চিরকাল তোমার মুখে শুন্‌তে পাই।”

ধীরেন প্রণয়পীযুষ বাক্যে কহিল,—“মধুমতি! তোমাকে কখন আমি ভুলতে পার্ব্বোনা।”

মধুমতী। বিশ্বাস কি? এইত ভুলেছিলে?

ধীরেন। কবে মধুমতি?

মধুমতী। গঙ্গায়।

ধীরেন। ভুলিনি মধুমতি! যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, ততক্ষণ তোমার বিষয় ভেবেছি।

এই বলিয়া উভয়ে উভয়ের দুঃখকাহিনী বর্ণন করিয়া ভালবাসার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। আজ আর উভয়ের নিদ্রা নাই, জাগরণেই নিশি শেষ হইয়া গেল।

প্রভাত হইল, আজ উপেন বাবু পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া মণিরামপুর গমন করিবে। উপেনবাবুর মহা আনন্দ, কিন্তু চন্দ্রবাবুর চক্ষে জল পড়িতেছে। যাইহোক, প্রথানুযায়ী সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হইল। উপেন বাবুও পুত্র পুত্রবধূ ইত্যাদিকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। চন্দ্রবাবুর প্রথমতঃ একটু কষ্ট বোধ হইয়াছিল, সে কষ্ট আর অধিক দিন রহিল না। চন্দ্রবাবু ধীরেনকে যে প্রকার স্নেহ করিতেন, সেই প্রকার আরও একটী যুবককে স্নেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ ক'রলেন। সে যুবকটী আর অপর কেহ নয়, সে যুবকটী আমাদের শিবরাম মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতষ্পুত্র প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। ইহার কারণ বলিবার বোধ হয় আর আবশ্যক নাই।

সম্পূর্ণ।